বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দর্শন

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

মাদল দেব বর্মন

রেজিস্ট্রেশন নং: ১০৬

সেশন: ২০১৪-১৫

বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ
পরিপ্রেক্ষিত পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দর্শন

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের

এম. ফিল. ডিগ্রীর পূরণের অন্যতম অংশ হিসেবে জমা হলো

গবেষক: মাদল দেব বর্মন
রেজিস্ট্রেশন নং: ১০৬
সেশন: ২০১৪-১৫

বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

‘রা’

উৎসর্গ

(গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা)

হে যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র!
চিরকালের সাথীয়া আমার!
তোমারই আশীষে সুসম্পন্ন তোমার এই পবিত্র গাঁথা
তোমারই চরণে অর্পণ করলাম...

Dhaka University Institutional Repository

শব্দকোষ

বিশ্বশান্তি- বিশ্বশান্তি বলতে এ গবেষণায় সমগ্র বিশ্বের শান্তিপূর্ণ অবস্থিতিকেই বোঝানো হয়েছে, যে পরিস্থিতিতে একজনের শান্তির জন্য অন্যজনের অশান্তি তৈরী হবে না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শান্তিতে থাকবে ও অন্যের শান্তিতে থাকা নিশ্চিত করবে, ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বই শান্তিময় হয়ে উঠবে। আর একমাত্র প্রকৃত ধর্মচর্চার ভিতর দিয়েই তা সম্ভব হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি- বিভিন্ন মতবাদ বা সম্প্রদায়সমুহের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ককেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হিসেবে ধরা হয়েছে, যদিও প্রধানতঃ ধর্মীয় মতবাদ বা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এ সম্প্রীতি অনুসন্ধানই এ গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে।

পুরুষোত্তম- শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা অনুসারে যিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উত্তম তিনিই পুরুষোত্তম। আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মতে, পুরুষোত্তম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূরণকারী প্রেরিত পুরুষ, যিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল প্রেরিতকেই পূরণ করে থাকেন। এ ধারাবাহিকতায় শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, মহামতি বুদ্ধ, প্রভু যীশু, হযরত মুহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে পুরুষোত্তম বোঝানো হয়েছে। আর শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের সর্বশেষ রূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর- এ গবেষণায় 'শ্রীশ্রীঠাকুর' বলতে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রূপকে বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব একটা পরিবার। এখন শুধুমাত্র নিজ পরিবারের সুখ-শান্তি চিন্তা করে শান্তি স্থাপন চিন্তা নিরর্থক। তাই বিশ্ব নামক এই পরিবারের সদস্য হিসেবে গোটা পৃথিবীর শান্তির জন্য আবশ্যিকভাবে শান্তি চিন্তা করা উচিত। নতুবা নিজের শান্তিই বিঘ্নিত হবে। পৃথিবীতে প্রত্যেকেই শান্তিকামী। প্রত্যেকটি জীবসত্তাই শান্তি চায়। প্রত্যেক মানুষতো বটেই একটি ছোট পিঁপড়া পযর্ন্ত শান্তিতে বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। এ যেন সত্তার ধর্ম। সত্তা থেকেই ব্যক্তি বা ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব । আর ব্যষ্টি থেকে সৃষ্টি হয় সমষ্টির। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং ব্যক্তির জন্যই পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ জাগতিক রূপ হল এই বিশ্ব, আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই তার অবস্থান থেকে শান্তির অন্বেষণ করছে। সুখে-শান্তিতে জীবন-বৃদ্ধিকে সার্থকতায় পর্য্যবসিত করাই প্রত্যেকের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমে শান্তি অনুসন্ধানে রত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিজের শান্তির জন্য অন্যের শান্তি নষ্ট করার কোন অধিকার কারো নেই। অন্যের শান্তিকে অক্ষুন্ন রেখে নিজে শান্তিতে বসবাস করাই প্রকৃত শান্তি। এই হলো বিশ্বশান্তির মূলকথা। বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষকে আপন মনে করে প্রত্যেকের শান্তির জন্য যে অভিন্ন সতত পথচলা তাই বিশ্বশান্তির পথ। অর্থাৎ প্রত্যেককে ভালোবাসার হৃদয়ে ধারণ করার মধ্যেই বিশ্বশান্তির গুরুত্ব নিহিত।

আর এই ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখতে, এর পরিপূর্ণ রূপায়ণে যুগে যুগে বিভ্রান্ত মানুষকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনতে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন প্রেরিত-পুরুষেরা। তাঁরা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের কেন্দ্র করেই পথহারা মানুষ শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছে বার বার। তাঁরা সবাইকে পরিপূরণ করতেই আসেন। প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষই তাঁদের পূর্ববর্তীদের স্বীকার করে একটা যুগানুপাতিক সমন্বয়ী পথ প্রবর্তন করেন। তাঁদের মৌলিক বিষয়সমূহ একই থাকে। কিন্তু তাঁরা বিগত হওয়ার পরই তাঁদের নামেই বিভিন্ন বিভক্তি গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়। আর এসব সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের সমন্বয়ী ধারাকে ভেঙ্গে একটা সঙ্কীর্ণ ধারা কিংবা উপধারার তৈরি করে। এভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যেকোন রকমের উন্নয়নের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি মুখ্য বিষয়। প্রত্যেকেই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও প্রতিনিয়ত সম্প্রদায়গত বিরোধের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেই থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাপুরুষেরা পৃথিবীর জন্য সর্বদা শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের মতবাদসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা বিকৃত করে আজকের ধর্মের ধারক-বাহক ও প্রচারকরা সৃষ্টি করেছে ধর্মীয় বিকৃতি। ধর্মের নামে ধর্মের গ্লানিতে ভরে গেছে। ছোট ছোট মতানৈক্যের গোঁড়ামির নিকট হার মানছে ধর্মের বৃহৎ উদ্দেশ্য-মানবকল্যাণ। যে যার মতবাদকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করা ও নিজ নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে ভয়ংকর অধর্ম করতেও পিছপা হচ্ছে না। নিজ মতবাদকে অন্যের উপর চাপানো যেন ধর্মীয় নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য মতবাদের বিভিন্ন মূল্যবোধসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিক মানবধর্মের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদই লোপ পেয়ে যেতে বসেছে। তাই পবিত্র যুদ্ধের নামে ক্রুসেড, খ্রীষ্টান-মুসলমান দ্বন্দ্ব, শিখ-মুসলমান দ্বন্দ্ব, শিখ-হিন্দু দ্বন্দ্ব, হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ইতিহাসের বুকে পূর্বেও ঘটেছে; এখনও ঘটে চলেছে। অথচ শান্তির বাণী, অহিংসার বাণী, সাম্যের বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে চলছে সবাই। অর্থাৎ ধর্মের মূলসূত্র ধরতে ব্যর্থ হয়েছে সবাই। তাই এক পিতাকে বহু পিতা এবং আপন সহোদরকে পর তৈরি করেছে।

এসব সমস্যা উত্তরণে বিভিন্ন প্রেরিত পুরুষ বা মহাপুরুষেরা বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন, সত্যের পক্ষে-ধর্মের পক্ষে সবাইকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে গেছেন বার বার। গড়ে তুলেছেন মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্র করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সে লক্ষ্যে সফলও হয়েছেন। প্রচলিত ধর্মভিত্তিক প্রত্যেক মতবাদই শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে, মানবকল্যাণের লক্ষ্যে, জগতের সকল মানুষের এমনকি প্রত্যেকটি সত্ত্বার অস্তি-বৃদ্ধি অটুট রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। আর প্রত্যেকটি মতবাদের প্রবর্তকের জীবন ও তাঁদের বাণীসমূহে আমরা তাই দেখতে পাই। তাই অযোধ্যার শ্রীরাম, দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ, কপিলাবস্তুর শ্রীবুদ্ধ, পারস্যের জরথুষ্ট, কৈলাসের তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ, ইসরায়েলের পয়গম্বর মসীহ, নাজারথের প্রভু যীশু, মক্কা-মদীনার মরুপুত্র হযরত মুহম্মদ, কর্তারপুরের গুরু নানক, নদীয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, পারস্যের নবী বাহাউল্লাহ কিংবা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যেকে কথারই সূত্র এক। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ জীবনকে জন্ম থেকে আমৃত্যু সমগ্র মানবজাতির জন্যই বিলিয়ে দিয়েছেন। আবার তাঁদের মাধ্যমে যেসব অমৃত-গাঁথা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে, সে ঐশী হোক বা তাঁদের নিজেদের ঐশীচেতনা-উদ্ভূতই হোক, সেসবও জনকল্যাণার্থে সর্বকালের সবার জন্যই প্রযোজ্য; যদিও সময় ও স্থান বিবেচনায় কিছু বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী প্রতিষ্ঠায় এসব বাণীসমূহ যে একই সুরে কথা বলেছে, তা অনস্বীকার্য। তাই বেদ-উপনিষদ-গীতা-ত্রিপিটক, তোরাহ-বাইবেল-কোরাণ-হাদিস, জেন্দ আবেস্তা বা গুরু গ্রন্থ সাহেব, কিংবা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সবই যেন একই কথা, একই গাঁথা। আর বিশ্বশান্তি স্থাপনে ও সমগ্র মানবজাতিকে এক সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, সম্প্রীতির পথে নিতে কি সদৃশ প্রয়াস এসব বাণীর!

Dhaka University Institutional Repository

এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আবির্ভূত তেমনই একজন প্রেরিতপুরুষ বা মহাপুরুষ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। উনবিংশ শতকে যাঁর জন্ম, আর বিংশ শতকে যাঁর বিকাশ। তাঁর অনুসারীদের নিকট তিনি এযুগের যুগপুরুষোত্তম ও শাস্ত্রে বর্ণিত কলিযুগের কল্কি-অবতার। যিনি 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' সংক্ষেপে 'শ্রীশ্রীঠাকুর' নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ 'সৎসঙ্গ'- তাঁরই দার্শনিক বোধের এক মূর্ত সংগঠন। সৎসঙ্গ চায় মানুষ। অর্থাৎ সৎসঙ্গের দর্শনে কোনও ভেদ নেই, বরং আছে পরস্পর স্বার্থানুরাগ। আমি নিজে সুখে থাকব এবং আমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুখে রাখব। এর মূল কথা হল- সুকেন্দ্রিক হও।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ধর্ম হল বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞান। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সত্ত্বা বাঁচতে চায় ও বৃদ্ধি পেতে চায়। তবে একজনের বাঁচা-বাড়া যেন অপরের বাঁচা-বাড়াকে ব্যাহত না করে। যে উপায়ে সকলের বাঁচা-বাড়া সমুন্নত থাকে সাত্ত্বতভাবে তাই ধর্ম। অর্থাৎ অন্যের বাঁচা-বাড়াকে ঠিক রেখে প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞানই ধর্ম। আর এই ধর্ম শাশ্বত। সে হিন্দুর জন্যই হোক, মুসলমানের জন্যই হোক, খৃষ্টানের জন্যই হোক কিংবা অন্য যে কারও জন্যই হোক না কেন। তাই কতগুলো মতবাদ নিয়ে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নামে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ধর্ম হিসেবে মানেন না। তার নিকট ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, আর প্রেরিত-পুরুষগণ সেই একেরই বার্তাবহনকারী। তাই তাঁদের বার্তাও অভিন্ন, যদিও সময় ও অবস্থান বিচারে সেসবের রকম কিছুটা পৃথক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই নিজের উন্নয়নের স্বার্থেই আমাদের সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষ ও তাদের প্রবর্তিত পথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শনের অন্যতম দুটি দিক হল পৃথিবীতে মানবকল্যাণার্থে আগত সকল মহাপুরুষ-নবী-রসূল-অবতার-প্রেরিত-পয়গম্বর সকলকে একই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা এবং সকল পূর্বতন প্রেরিত পুরুষদের মেনে চলা তৎসহ বর্তমান প্রেরিতকে অনুসরণ করা। আমাদের চেতনার জগতে মানবিক সাড়াপ্রবণতাকে সঠিকভাবে অনুরণিত করতে একসাথে চলার এই আহবান আমাদের অনস্বীকার্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন বিষয় যেমন-তাঁর ধর্মদর্শন, সমাজদর্শন, সাহিত্যদর্শন, শিক্ষাচিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞানচিন্তা, রাষ্ট্রদর্শন, ছড়া-সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষত তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে পারস্পরিক বাঁচা-বাড়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দর্শন নিয়ে চর্চা ও বহুল গবেষণার আজ একান্ত প্রয়োজন। এই চর্চাই বাংলাদেশের আবহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারাকে প্রোজ্জ্বল করতে পারে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে করতে পারে আরও দৃঢ়।

এ ধর্মদর্শন অনুসারে ধর্ম একটি ব্যাপক বিষয়, যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি সত্তার সাথে জড়িত। এর বাইরে কিছুই নেই। বিজ্ঞান এরই একটি শাখামাত্র। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি প্রচলিত ধর্মসমূহের

Dhaka University Institutional Repository

বহু বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্মে যে বিষয়সমূহ কালের পরিক্রমায় আজ বিকৃত রূপ লাভ করেছে, প্রকৃত ধর্মচর্চায় বাঁধা সৃষ্টি করেছে এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ তৈরী করেছে, তিনি সেসবেরও প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ধর্মান্তর একট অবান্তর বিষয়, যেখানে প্রত্যেকের ধর্মই এক। তাই প্রত্যেকেই যার যার মতে অবস্থান করে অন্যমতের চর্চা দ্বারা বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে একটা সমন্বয়ী যোগসূত্র তৈরী করতে পারে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বৈশ্বিক বিশৃঙ্খল অবস্থার নিরাকরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধানী দিক-নির্দেশনাসমূহ প্রচার ও চর্চা দ্বারা বর্তমান বিশ্বে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে সমাধান হিসেবে একেশ্বরবাদ ও প্রেরিতগণকে অভিন্ন ভাবা, বহুত্ববাদে শ্রদ্ধা রেখে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা, মহাপুরুষদের প্রণীত পথের বিকৃতি নিরোধ করা, পবিত্র গ্রন্থসমূহের বাণীর বিকৃতিসমূহ রোধ করা, প্রকৃত ধর্মবোধের চর্চা করা অর্থাৎ সবাইকে প্রকৃত ধার্মিক করে তোলা, ধর্মান্তরিতকরণ নিরসন করা এবং এসবের সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে যুগপুরুষোত্তম বর্তমান প্রেরিত-পুরুষকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্ম-দর্শনের মূল দিকটি হল সমন্বয়। যেটি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। শ্রীশ্রীঠাকুর চেষ্টা করেছেন পবিত্র গ্রন্থসমূহ যেমন গীতা, বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য দেখাতে। তিনি সকল ধর্মের সারবস্তুকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছেন যে সব ধর্মই এক শাশ্বত নীতিকে অনুসরণ করে চলে। পাশাপাশি, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সত্যকে বের করতে চেয়েছেন যে সব প্রেরিত পুরুষই এক; তাঁরা সবাই একই স্রষ্টার ভিন্ন সময়ের ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ ও আবির্ভাব মাত্র; তাদের প্রত্যেকের জীবনের ব্রতও একই এবং তা সমগ্র মানবজাতির জন্য। এমনকি তিনি তার জীবনে বাস্তবে প্রতিপালনে করে দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক পরবর্তী প্রেরিতই সকল পূর্ববর্তী প্রেরিতের পরিপূরক; প্রত্যেক পরবর্তী প্রেরিতই সকল পূর্ববর্তী প্রেরিতের আধুনিক রূপ। আর তাই কোনভাবেই সেখানে পার্থক্য তৈরীর কোন সুযোগ নেই এবং দ্বন্দ্বের অবকাশও খুবই কম। পুরুষোত্তমের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, এক নতুন আদর্শের জন্ম হয়েছে।

সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
উৎসর্গ	III
মাননীয় ডিন মহোদয়ের প্রত্যয়নপত্র	IV
তত্ত্বাবধায়কগণের প্রত্যয়নপত্র	V
ঘোষণাপত্র	VI
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	VII
টীকা	VIII
সূচীপত্র	IX
সারসংক্ষেপ	XIII
প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা	০১
১.১ পটভূমি	০১
১.২ গবেষণার গুরুত্ব	০৫
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	০৬
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	০৭
১.৫ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ/গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	০৭
১.৬ গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো	১৭
১.৭ গবেষণার সুযোগ ও অসুবিধাসমূহ	২০
১.৮ গবেষণা কাঠামো	২২
১.৯ উপসংহার	২৩
২য় অধ্যায় - বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি	২৪
২.১ বিশ্বশান্তির ধারণা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	২৪
২.২ বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	২৬
২.৩ সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	২৭
২.৪ বাঙালির ধর্ম, বাঙালির সম্প্রীতি	৩০
২.৪.১ বাঙালি সাহিত্যে সম্প্রীতির রূপ	৩১

২.৪.২ বাঙালি শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সম্প্রীতির রূপ	৩২
২.৪.৩ বাঙালি ধর্মবেত্তাদের সম্প্রীতির রূপ	৩৩
২.৫ বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপরেখা	৩৪
২.৬ উপসংহার	৩৭
৩য় অধ্যায় - বিভিন্ন ধর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপ	৩৮
৩.১ বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রীতির বাণী	৩৮
৩.২ ভারতীয় হিন্দুধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৩৮
৩.৩ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৪৪
৩.৪ ইহুদীধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৪৭
৩.৫ খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৫০
৩.৬ ইসলামধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৫২
৩.৭ শিখধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৫৮
৩.৮ বাহাইধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৬২
৩.৯ ধর্মীয় প্রতীকসমূহের তাৎপর্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৬৩
৩.১০ বিভিন্ন মনীষীদের জীবনে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ	৬৭
লালন সাঁই	৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯
মহাত্মা গান্ধী	৭০
কাজী নজরুল ইসলাম	৭১
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৭৩
৩.১১ বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	৭৫
৩.১০ উপসংহার	৭৯
৪র্থ অধ্যায় - শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শন	৮০
৪.১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৮০
৪.২ পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মদর্শন	৮৫

৪.৩ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্ম্মাচরণ ও প্রকৃত ধার্ম্মিক	৯২
৪.৪ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক	৯৫
৪.৫ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছ বা কাফের	৯৯
৪.৬ সৎসঙ্গ দর্শন	১০৩
৪.৩ উপসংহার	১০৭
৫ম অধ্যায় - শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে বিভিন্ন ধর্মদর্শনসমূহের অবস্থান	১০৮
৫.১ অন্য ধর্মদর্শন সম্পর্কে অভিমত	১০৮
৫.২ ইসলাম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর	১০৯
৫.৩ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর	১১৫
৫.৪ খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর	১১৯
৫.৫ হিন্দুধর্মের অপরাপর প্রেরিতদের সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর	১২৩
পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্র	১২৩
যোগেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ	১২৭
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য	১৩১
পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	১৩৩
৫.৭ উপসংহার	১৩৬
৬ষ্ঠ অধ্যায় - বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাস্তবায়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী রূপরেখা	১৩৮
৬.১ প্রকৃত ধর্মবোধ	১৩৮
৬.২ সাম্প্রদায়িকতা নিরসন	১৪৪
৬.৩ ধর্মান্তরিতকরণ নিরসন	১৪৭
৬.৪ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া	১৫১
৬.৫ ঈশ্বর ও প্রেরিতগণ অভিন্ন	১৫৪
৬.৬ স্বদেশে কুৎসা ও অপ্রতিষ্ঠা	১৫৯
৬.৭ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা	১৬০
৬.৮ পৌত্তলিকতা বর্জন কিন্তু দেবতা বা বীরের পূজা যথার্থতা	১৬২

৬.৯ পরনিন্দা ত্যাগ	১৬৫
৬.১০ মহাপুরুষদের প্রণীত পথের বিকৃতি নিরোধ করা	১৬৬
৬.৭ উপসংহার	১৭০
৭ম অধ্যায়- উপসংহার	১৭২
৭.১ সমাপনী মন্তব্য	১৭২
৭.২ পুরুষোত্তম হিসেবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী সম্পোষণা	১৭৫
৭.৩ প্রাপ্ত উপাত্ত ও সম্ভাব্য সুপারিশসমূহ	১৭৭
গ্রন্থপঞ্জি	১৮০

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নিজের মনের শান্তি এবং সমাজের শান্তি অপরিহার্য উপাদান। চীনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ইউরোপের ধর্মযুদ্ধ, চীন-রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আরব বিশ্ব ও ইসরাইলের দ্বন্দ্ব, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ, আমেরিকা-রাশিয়ার স্নায়ুযুদ্ধের স্মৃতিসমূহ ইতিহাসে এখনও তরতাজা। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য তৈরি হলেও নীতিগতভাবে পরস্পর বৈরিতা পোষণ করেই চলেছে, প্রতিষ্ঠা করে চলেছে ধনতন্ত্রের। আর যেসব মহাপুরুষেরা পৃথিবীর জন্য সর্বদা শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাদের মতবাদসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা বিকৃত করে আজকের ধর্মের ধারক-বাহক ও প্রচারকরা সৃষ্টি করেছে ধর্মীয় মৌলবাদ। ছোট ছোট মতানৈক্যের গোঁড়ামির নিকট হার মানছে ধর্মের বৃহৎ উদ্দেশ্য- মানবকল্যাণ। যে যার মতবাদকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করা ও নিজ নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে ভয়ংকর অধর্ম করতেও পিছপা হচ্ছে না। নিজ মতবাদকে অন্যের উপর চাপানো যেন ধর্মীয় নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য মতবাদের বিভিন্ন মূল্যবোধসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিক মানবধর্মের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদই লোপ পেয়ে যেতে বসেছে। তাই পবিত্র যুদ্ধের নামে ক্রুসেড, খ্রীষ্টান-মুসলমান দ্বন্দ্ব, শিখ-মুসলমান দ্বন্দ্ব, শিখ-হিন্দু দ্বন্দ্ব, হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ইতিহাসের বুকে পূর্বেও ঘটেছে; এখনও ঘটে চলেছে। অথচ শান্তির বাণী, অহিংসার বাণী, সাম্যের বাণী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে চলছে সবাই। অর্থাৎ মূলসূত্র ধরতে ব্যর্থ হয়েছে সবাই। তাই এক পিতাকে বহু পিতা এবং আপন সহোদরকে পর তৈরি করেছে।

এসব সমস্যা উত্তরণে আবার বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। গড়ে তুলেছেন মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্র করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সে লক্ষ্যে সফলও হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তেমনই একজন মহাপুরুষ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর অনুসারীদের নিকট তিনি এযুগের যুগপুরুষোত্তম ও কল্কি-অবতার। যিনি

‘শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’ সংক্ষেপে ‘শ্রীশ্রীঠাকুর’ নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর প্রবর্তিত ‘সৎসঙ্গ’ তাঁরই দার্শনিক বোধের এক মূর্ত সংগঠন। এর মূল কথা হল-

“সৎসঙ্গ চায় মানুষ,
ঈশ্বরই বল, খোদাই বল,
ভগবান বা God-ই বল, অস্তিত্বই বল–
ভূতমহেশ্বর যিনি এক— তাঁ’রই নামে,.....
সে বোঝে প্রতিপ্রত্যেকে তাঁরই সন্তান,
সে আনত ক’রে তুলতে চায় সকলকে সেই একে.....
সে পাকিস্তানও বোঝে না
হিন্দুস্তানও বোঝে না
রাশিয়াও বোঝে না
চায়নাও বোঝে না
ইউরোপ, আমেরিকাও বোঝে না—
সে চায় মানুষ,—
সে চায় সাকীস্তান,
সে চায় প্রত্যেকটি লোক
সে হিন্দুই হো’ক, মুসলমানই হো’ক,
খ্রীষ্টানই হো’ক, বৌদ্ধই হো’ক বা
যে-ই যা’ হো’ক না কেন,
যেন সমবেত হয় তাঁরই নামে
পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে–.......
প্রত্যেকটি মানুষ যেন বুঝতে পারে—
প্রত্যেকেই তা’র,
কেউ যেন না বুঝতে পারে—
সে অসহায়, অর্থহীন, নিরাশ্রয়,

প্রত্যেকটি লোক যেন বুক ফুলিয়ে

বলতে পারে—
আমি সবারই, আমার সবাই—. . . . .
এই দুনিয়ার বুকে
এক সহযোগিতায়
আত্মোন্নয়নী শ্রমকুশল সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
পারস্পরিক পরিপূরণী সংহতি-উৎসারণায়
—উৎকর্ষী অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
সেই আদর্শ পুরুষে
সার্থক হ'তে সেই এক অদ্বিতীয়ে।"[১]

অর্থাৎ সৎসঙ্গের দর্শনে কোনও ভেদ নেই, বরং আছে পরস্পর স্বার্থানুরাগ। আমি নিজে সুখে থাকব এবং আমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুখে রাখব। এই সপারিপার্শ্বিক বাঁচা-বাড়ার কথা আমরা বিভিন্ন মনীষীর মুখে শুনতে পাই। যেমনঃ এলেক্সিস ক্যারেল বলেছেন- 'মানুষের কোনও স্বাধীন সত্ত্বা নেই। সে তার পরিবেশে আবদ্ধ।'[২] ইউকেনের মতে- 'অনেকের সাথে একত্রিত হওয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি এককভাবে উন্নতি করতে পারে না। সে অন্যকে স্বস্থ না করে নিজে স্বস্থ হতে পারে না।'[৩] শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই সঙ্গতিপূর্ণভাবে এর বাস্তবিক রূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমতঃ পৃথিবীতে মানবকল্যাণার্থে আগত সকল মহাপুরুষ-নবী-রসূল-অবতার-প্রেরিত-পয়গম্বর সকলকে একই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা। তাঁর কথায়-

'বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস শ্রীচৈতন্য রসুল কৃষ্ণে,
জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব হন একই ওঁরা তাও জানিস্‌নে?'[৪]

---

[১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *জীবন-দীপ্তি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৭, পৃ.-৭

[২] Alexis Carrol, *Man, the Unknown,* Harper and Brothers Publishers, New York, 1935, p.128. *'Man has no independent existence. He is bound to his environment.'*

[৩] R. Eucken, *A new philosophy of life,* Create Space Independent Publishing Platform, 1912, p.131. *'The individual can progress only in so far as he is united with others: he cannot advance his own well-being without advancing that of others.'*

[৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪, পৃ. ২৮০

দ্বিতীয়তঃ সকল পূর্বতন প্রেরিত পুরুষদের মেনে চলা এবং বর্তমান প্রেরিতকে অনুসরণ করা। কারণ নতুন প্রেরিত যাঁরা আসেন তাঁরা কেউ পূর্বতনকে অশ্রদ্ধা করেন না। আমরা দেখতে পাই ভগবান যীশু বলেছেন-'আমি ধ্বংস করতে নয়, পূরণ করতে এসেছি।'[৫] আবার মহানবী এসেও তাঁর পূর্বতন নবীদের অবজ্ঞা করেননি। পবিত্র আল-কোরাণের সুরা মুনেনে উল্লেখ আছে- 'এবং সত্যসত্যই আমি তোমার পূর্বে প্রেরিত-পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে কেহ যে তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই।'[৬] আবার শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় জ্ঞানযোগে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই।'[৭] আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কথায়- 'পূর্বতনে মানে না যারা, জানিস নিছক ম্লেচ্ছ তারা।'[৮] আবার বললেন-'না ধরে প্রেরিতে বর্তমান, অন্ধ তমায় হয় প্রয়াণ।'[৯]

আমাদের চেতনার জগতে মানবিক সাড়াপ্রবণতাকে সঠিকভাবে অনুরণিত করতে একসাথে চলার এই আহবান আমাদের অনস্বীকার্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন বিষয় যেমন-তাঁর ধর্মদর্শন, সমাজদর্শন, সাহিত্যদর্শন, শিক্ষাচিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন, ছড়া-সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষত তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে পারস্পরিক বাঁচা-বাড়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দর্শন নিয়ে চর্চা ও বহুল গবেষণার আজ একান্ত প্রয়োজন।

এই চর্চাই বাংলাদেশের আবহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারাকে প্রোজ্জ্বল করতে পারে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে করতে পারে আরও দৃঢ়। তিনি বলতেন-'কত ভাগ্যে সোনার বাংলায় জন্মলাভ করেছি, ইচ্ছা করে এর ফল-জল, আলো-হাওয়া, খাদ্য-খাওয়া, স্নেহ-প্রীতি, প্রাকৃতিক মাধুর্য প্রাণভরে উপভোগ করি। বাঙালির মহৎ কিছু দেবার আছে জগতকে।... আমরা যদি বাংলাটাকে বৈশিষ্ট্যমাফিক গ'ড়ে তুলতে পারি, সারা ভারত, সারা জগৎ তা' থেকে পথ পেতে পারে।'[১০]

---

৫. *প্রেমের বাণী পবিত্র নতুন নিয়ম*, ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, ২০০২, ম্যাথু ৫:১৭।

৬. ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, *পবিত্র আল-কোরআন*, জোনাকি প্রকাশনী, ঢাকা, সুরা মুমেন ৭৮, আয়াত ০৮

৭. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ(অনুবাদ), *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, বেলুড়, কলিকাতা ১৯৮৫ শ্লোক-৪/৮, পৃ. ১০৫

৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৪৬

৯. ঐ, ঐ, পৃ. ৪৬

১০. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে(১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪, পৃ. ৩১৭

১.২ গবেষণার গুরুত্ব

বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব একটা পরিবার। এখন শুধুমাত্র নিজ পরিবারের সুখ-শান্তি চিন্তা করে শান্তি স্থাপন চিন্তা নিরর্থক। তাই বিশ্ব নামক এই পরিবারের সদস্য হিসেবে গোটা পৃথিবীর শান্তির জন্য আবশ্যিকভাবে শান্তিচিন্তা করা উচিত। নতুবা নিজের শান্তিই বিঘ্নিত হবে। পরন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার এই যুগে কোন ব্যক্তি, জাতিগোষ্ঠী বা দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাকে অন্যের চিন্তা করতেই হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের যোগাযোগ খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। তাই আমার শান্তির জন্যই আমাকে আমার পারিপার্শ্বিকের শান্তি অর্থাৎ বিশ্বশান্তির চিন্তা করতে হবে।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই শান্তিকামী। প্রত্যেকটি জীবসত্তাই শান্তি চায়। প্রত্যেক মানুষতো বটেই একটি ছোট পিঁপড়া পযর্ন্ত শান্তিতে বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। এ যেন সত্তার ধর্ম। সত্তা থেকেই ব্যক্তি বা ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব । আর ব্যষ্টি থেকে সৃষ্টি হয় সমষ্টির। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির জন্য পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ জাগতিক রূপ হল এই বিশ্ব, আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই তার অবস্থান থেকে শান্তির অন্বেষণ করছে। সুখে-শান্তিতে জীবন-বৃদ্ধিকে সার্থকতায় পর্যবসিত করাই প্রত্যেকেই লক্ষ্য। এলক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমে শান্তি অনুসন্ধানে রত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিজের শান্তির জন্য অন্যের শান্তি নষ্ট করার কোন অধিকার কারো নেই। অন্যের শান্তিকে অক্ষুন্ন রেখে নিজে শান্তিতে বসবাস করাই প্রকৃত শান্তি। এই হলো বিশ্বশান্তির মূলকথা। বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের মনে করে প্রত্যেকের শান্তির জন্য যে অভিন্ন সতত পথচলা তাই বিশ্বশান্তির পথ। অর্থাৎ প্রত্যেককে ভালোবাসার হৃদয়ে ধারণ করার মধ্যেই বিশ্বশান্তির গুরুত্ব নিহিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-‘ভালোবাসাই একমাত্র মুদ্রা যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়।’[১১] এভাবেই যে সম্প্রদায় বা ধর্ম গড়ে ওঠে তাতেই বিশ্বশান্তি নিহিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,‘অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে।’[১২]

আর এই ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখতে, এর পরিপূর্ণ রূপায়ণে যুগে যুগে বিভ্রান্ত মানুষকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনতে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন প্রেরিত পুরুষেরা। তাঁরা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে

---

[১১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ৪৬

[১২] ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ২৭৬

মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের কেন্দ্র করেই মানুষ শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছে বার বার। তাঁরা সবাইকে পরিপূরণ করতেই আসেন। প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই তাঁদের পূর্ববর্তীদের স্বীকার করে একটা যুগানুপাতিক সমন্বয়ী পথ প্রবর্তন করেন। তাঁদের মৌলিক বিষয়সমূহ একই থাকে। কিন্তু তাঁরা বিগত হওয়ার পর পর তাঁদের কেন্দ্র করেই বিভিন্ন বিভক্তি গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়। আর এসব সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাঁদের সমন্বয়ী ধারাকে ভেঙ্গে একটা সঙ্কীর্ণ ধারা-উপধারার তৈরি করে। এভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যেকোন রকমের উন্নয়নের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি মুখ্য বিষয়। প্রত্যেকেই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও প্রতিনিয়ত সম্প্রদায়গত বিরোধের বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু নিজের উন্নয়নের স্বার্থেই আমাদের সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষ ও তাদের প্রবর্তিত পথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

মুখ্য উদ্দেশ্য: গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দর্শনের প্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপরেখা প্রণয়ন। বিশেষতঃ বর্তমান বিশ্বের সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়গত সংঘাতের নিরসন করে সম্প্রীতিমূলক সমাজ গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তদনুযায়ী একটি সমন্বয়ী রূপরেখা প্রণয়ন করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

১. বর্তমান বিশ্বের সংঘাতময় পরিস্থিতি ও স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্পর্ক নির্ণয়।

২. বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদসমূহের ভূমিকা নির্ণয়।

৩. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দার্শনিক অবস্থান নির্ণয়।

৪. সর্বধর্ম সমন্বয়ে তথা ধর্মের শাশ্বত রূপদানে পূর্বতনী-পূরয়মান রূপে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মাদর্শের উপযোগিতা নির্ণয়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা ক্ষেত্র নির্ণয় ও তথ্যের উৎস— যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গবেষণা কার্যটি তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপটে করা হবে। তাই কোন প্রকার নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা থাকবে না। তথাপি বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ধর্ম-দর্শন বিশেষত ধর্ম-দর্শনের উৎকর্ষের ধারক ও বাহক ভারতীয় ধর্মদর্শনের আওতাভুক্ত মানব সম্প্রদায় এর আওতাভুক্ত হতে পারে। মূলতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক তথ্যের চেয়ে এ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট লেখা ও গ্রন্থসমূহই তথ্যের মূল উৎস হবে।

তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি— তথ্যানুসন্ধান ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির উভয় প্রক্রিয়াই প্রয়োজনানুপাতিকভাবে ব্যবহৃত হবে।

গবেষণা উপকরণ— মূলতঃ সংশ্লিষ্ট লেখা ও গ্রন্থসমূহই গবেষণা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন দর্শন-গ্রন্থ, তুলনামূলক আলোচনা, সভা-সেমিনারের আলোচিত বিষয় প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনে বিবেচ্য হতে পারে।

বিশ্লেষণ কৌশল— বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয়ের মিলিত কৌশল অবলম্বন করা হবে।

১.৫ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ/গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

গত কয়েক দশকে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে আলোচিত তন্মধ্যে শান্তি ও সংঘর্ষ অন্যতম। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। আবার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বা বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়েও পৃথকভাবে অনেক গবেষণা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর উপর কোন বিশেষ মহামানবের দর্শনকেন্দ্রিক গবেষণা ততটা দেখা যায় না। বিশেষতঃ বাংলাদেশে এ ধরণের গবেষণা অপ্রতুল। এ অপ্রতুলতাকে অতিক্রম করে গবেষণাকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বই ও গবেষণাপত্র নিয়ে চর্চা করতে হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হল:

১.৫.১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ) : শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শনের উপর শতাধিক গ্রন্থ থাকলেও 'সত্যানুসরণ' গ্রন্থের সাথে অন্যসব গ্রন্থ অতুলনীয়। এটি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের লেখা একমাত্র পুস্তিকা যা প্রকৃতপক্ষে

একটি চিঠি যেটি তিনি মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার বন্ধু শ্রীঅতুলচন্দ্রের অনুরোধে এক রাত্রিতে লিখেছিলেন। সৎসঙ্গ অনুসারীদের নিত্যপাঠ্য বই এটি। জীবন ও ধর্মের সহজ ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা এখানে অতি সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটিকে 'সর্বগ্রন্থের সার' হিসেবে মূল্যায়ণ করা হয়। জীবন চলার ক্ষেত্রে পকেট পাঠ্য হিসেবে খুবই উপযোগী অথচ ছোট্ট একটি বই এই সত্যানুসরণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র আদর্শের সারাংশ হিসেবে মনে করা হয় পুস্তিকাটিকে। বেদ, কোরান, তোরাহ, বাইবেল, জেন্দ আবেস্তাসহ বিশ্বের মৌলিক ধর্মগ্রন্থসমূহের মূল বাণীসমূহের গূঢ়ার্থ সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে পারলে যা হত তা এই পুস্তিকাটি। প্রচলিত ধর্মগ্রন্থসমূহের বিবেচনায় এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ।

১.৫.২ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, *অখণ্ড জীবন দর্শন,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ১৪১৬ : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও তার প্রণীত সৎসঙ্গ দর্শন সম্পর্কে জানার জন্য এ গ্রন্থটি খুবই উপযোগী। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজস্ব প্রণীত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এত গ্রন্থ পাঠ বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে তার একনিষ্ঠ শিষ্য শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস একটি বইয়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সৎসঙ্গ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র ভাবধারাকে একায়িত করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর অন্যতম একটি গবেষিত গ্রন্থ যেখানে একাধারে ব্যক্তি ও তাঁর দর্শন যে একই অভিন্ন আদর্শ তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরন্তু সকল মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রত্যেকেরই সৎসঙ্গ আদর্শ অনুসরণ করা যে আবশ্যিক সেই সার্বজনীন বিষয়টি তিনি ধারাবাহিক ও সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন।

১.৫.৩ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *জীবন দীপ্তি (১ম-৩য় খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭ : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের গদ্যবাণীসমূহের বেশ কিছু সিরিজ রয়েছে। যেমনঃ চলার সাথী, ধৃতি বিধায়না (২ খণ্ড), তপোবিধায়না (২ খণ্ড), আদর্শ বিনায়ক, সমাজ-সন্দীপনা, চর্য্যা-সূক্ত, আচার-চর্য্যা, নিষ্ঠা বিধায়না, বিজ্ঞান বিভূতি, বিধান-বিনায়ক, পথের কড়ি, সম্বিতী, শাশ্বতী প্রভৃতি। এই বাণীগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিরামচিহ্নের সুচারু ব্যবহার ও দীর্ঘপদ পেরিয়ে দাঁড়ির ব্যবহার, যা বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে কেউ ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে দেখা যায় না। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের অর্থই হলো মনের ভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ। সেই অর্থে দাঁড়ির এই সার্থক ব্যবহার বাংলা সাহিত্যেই এক নতুন আবিস্কার। সংখ্যা হিসেবে এসব বইয়ের সংখ্যা প্রায়

অর্ধশতাধিক, যাতে প্রায় ৬০০০ এর উপর বাণী রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ী ও সম্প্রীতিমূলক কতিপয় বাণী সংকলিত করা হয়েছে ছোট এই বইখানিতে। বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।

১.৫.৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম-২২শ খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭ : শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস সংকলিত আলোচনা প্রসঙ্গে পরিসরের দিক থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর সবচেয়ে বড় সম্ভার। এটি ২২টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আরও ৪টি খণ্ড এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিত্যদিনের কথোপকথনগুলোকে অবিকল সংকলন করা হয়েছে। ঐদিনের তারিখ, বার, সময়, স্থান, উপলক্ষ উল্লেখ করে লেখাগুলো যেন এক ঐতিহাসিক দলিলের ন্যায়। এখানে আশ্রমিক, কর্মী, যতি, ঋত্বিক, গৃহস্থী, চাকুরে, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, গায়ক, কবি, লেখক, সমাজসেবক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের মানুষের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান পাওয়া যায়। এ বইয়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সব উত্তরই সোজা, যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক। যে যেমনভাবে যে প্রশ্নই করুক না কেন তার একটা সহজ ও যুক্তিযুক্ত উত্তর সহজাত ভাবেই প্রদান করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এটা কোন পরিকল্পিত সাক্ষাতকারমূলক বই নয়, বরং এক জীবন্ত কিংবদন্তি কথোপকথন। দেশবিভাগ পূরবর্তী সময় (১৫/৬/১৯৩৯ ইং) থেকে শুরু করে দেশবিভাগ পরবর্তী (১১/২/১৯৫৪ ইং) সময় পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখানে উঠে এসেছে।

১.৫.৫ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭ : শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ‘দীপরক্ষী’ বইয়ের সংকলনও ‘আলোচনা প্রসঙ্গে’-এর ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথনমূলক গ্রন্থ। এটি ৬টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সংকলকও অনুলেখক হিসেবে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিত্যদিনের কথোপকথনগুলো সংকলন করেছেন। এখানেও তারিখ, বার, সময়, স্থান, উপলক্ষ উল্লেখ করা লেখাগুলোর ঐতিহাসিক মাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গের ন্যায় এ বইটিও শ্রীশ্রীঠাকুরকে গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যপাঠ্য একটি বই, যার চর্চা ও প্রসার মানবকল্যাণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৫.৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম-৭ম খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭ : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছড়াবাণীর সংকলন এই গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৭টি খণ্ডে গ্রন্থিত। সমাজ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, নীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সদাচার, চরিত্র, পুরুষ ও নারী, বর্ণাশ্রম, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, জনন-নীতি, ব্যবহার, অনুরাগ, কর্মকৌশল, সেবা, ধর্ম, আদর্শ, সাধনা, যজন, যাজন, রাজনীতি, আর্য্যকৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্নমুখী বিষয়ে তাঁর ছড়াবাণীসমূহ সংগ্রথিত আছে এই গ্রন্থে। বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়া খুবই জনপ্রিয় হলেও ছড়াগ্রন্থ খুবই অপ্রতুল। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া সুকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, জসীমউদ্দিন, এ ছড়াগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এগুলো তথাকথিত বাচ্চাদের জন্য লেখা কোন চটুল ছড়া নয় বা কোন আনন্দদায়ক রম্য ছড়াও নয়। প্রত্যেকটি ছড়া যেন একেকটি দর্শন। খুবই সহজ ছন্দে একেকটি উচ্চতর দর্শনকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার সার্থক প্রয়াস এটি। ইতোপূর্বে কেবলমাত্র খনার বচনেই ছড়ার মাধ্যমে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়, যদিও তা ছিল কেবলমাত্র কৃষিভিত্তিক। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম ছড়া প্রদান শুরু করেন ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে। তখন থেকে শেষ অবধি তিনি অসংখ্য বাণী দিয়েছেন। তন্মধ্যে 'অনুশ্রুতিতে' মোট সাতটি খণ্ডে সর্বমোট ৮৮৩০টি বাণী সংকলিত আছে।

১.৫.৭ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ : ইসলাম ধর্ম নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাথে মাওলানা খলিলুর রহমান ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে গড়ে উঠেছে 'ইসলাম প্রসঙ্গে' বইটি। ইসলামের বিভিন্ন দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয়ী ও যুক্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে এই গ্রন্থে। বিশেষ করে গ্রন্থটি ইসলামের সার্বজনীন স্বরূপ-সম্বন্ধে যেমন অবহিত করে, তেমন রসুল সম্বন্ধে বাস্তব শ্রদ্ধাবোধ তৈরী করে। যদিও ইহা সকল দেশের সকল জাতির জন্য, তথাপি বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার সুষ্ঠু সমাধানে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ, ও ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এক ভাগবত ঐক্যের অমৃতসূত্রে গ্রথিত হতে পারে এই গ্রন্থের সমাধানী আলোকে।

১.৫.৮ শ্রীব্রজগোপাল দত্তরায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (১ম-৩য় খণ্ড),* তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২ : এটি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে তাঁর বংশ পরিচয়, বাল্যলীলা, কীর্তন ও সমাধি পর্ব প্রভৃতি; দ্বিতীয় খণ্ডে সৎনাম, সদগুরু, সৎসঙ্গ, কর্মপ্রবাহ, লোকসমাগম ও আলোচনাপর্ব, তাঁর সংস্পর্শে বিভিন্ন মনীষীর আগমণ প্রভৃতি ও তৃতীয় বা শেষ খণ্ডে সাহিত্য পরিচিতি, বিচিত্র লীলা, সমাধানী দিকনির্দেশনা, সাধনতত্ত্ব, মহাপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তাঁকে নিয়ে আরও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ থাকলেও শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর সৎসঙ্গকে পূর্ণাঙ্গরূপে জানতে এই জীবনীগ্রন্থটি অমূল্য।

১.৫.৯ শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্তী (সংকলক), *ধর্ম্ম প্রসঙ্গ,* চর্য্যাশ্রম প্রকাশন, অস্তিকায়ন, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ভারত, ১৪২৪ : এটি একটি সংকলিত গ্রন্থ। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনামূলক দুটি মৌলিক গ্রন্থ 'আলোচনা প্রসঙ্গে'-এর ২২ টি খন্ড এবং 'দীপরক্ষী'-এর ৬টি খন্ড থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মানুচলন এবং তজ্জাতীয় বিষয়ক সম্যক আলোচনার উদ্ধৃতি সমূহ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এটি সার্থকভাবে সংকলন করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই প্রপৌত্র শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্তী।

১.৫.১০ শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্তী (সংকলক), *প্রেরিত প্রসঙ্গ,* চর্য্যাশ্রম প্রকাশন, অস্তিকায়ন, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ভারত, ১৪২৪ : এটিও একটি সংকলিত গ্রন্থ। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনামূলক দুটি মৌলিক গ্রন্থ 'আলোচনা প্রসঙ্গে'-এর ২২ টি খন্ড এবং 'দীপরক্ষী'-এর ৬টি খন্ড থেকে অন্যান্য প্রেরিত পুরুষ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমতসমূহ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এখানে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, প্রভু যীশু, হযরত মোহম্মদ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমতসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি সার্থকভাবে সংকলন করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই প্রপৌত্র শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন চক্রবর্তী।

১.৫.১১ ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম,* মেরিট ফেয়ার পাবলিশেন্স, ঢাকা, ২০১৫ : ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন ও সবচেয়ে নবীন ধর্ম বিবেচনা করে বিশ্বের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম সম্পর্কেও জানবার জন্য ইসলাম শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম বইটি একটি গবেষিত বই। এখানে ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ, টাবু-টোটেম-যাদুবিদ্যা থেকে শুরু করে উপজাতীয়-জাতীয়-বিশ্বজনীন ধর্ম

সম্পর্কে বর্ণনা হয়েছে। তৎসঙ্গে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, জরথুষ্টবাদ, ইহুদীধর্ম, খ্রিষ্টধর্মসহ ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন।

১.৫.১২ *পবিত্র আল-কোরাণ,* ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এটি, যা আল্লাহর বাণী বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে। আরবীয় ধর্মসমূহের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ এটি। আরবী সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ধরা হয় এটিকে। মোট ৩০টি পারা বা অধ্যায়ে ১১৪টি পূর্ণাঙ্গ সূরা রয়েছে গ্রন্থটিতে।

১.৫.১৩ *সহীহ-বুখারী,* ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : হাদিস হল ইসলামের শেষনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বাণী সংকলন। হাদিস বিষয়ক ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে সহিহ বুখারী প্রধান। পারস্যের স্বনামধন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম বুখারী এর সংকলক।ইসলাম ধর্মে আল-কোরানের পর সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই হাদিসকে। এ গ্রন্থে মোট ৭৫৬৩ খানা হাদিস সংকলিত আছে।

১.৫.১৪ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ (অনুদিত), *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা,* শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, বেলুড়, কলিকাতা ১৯৮৫: শ্রীমদ্ভাগবতগীতা হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ না হলেও বৈষ্ণববাদের মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। মূল গীতা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত, যা প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৭০০টি শ্লোক নিয়ে গীতা রচিত। এটি বৈদান্তিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। গীতাকে গীতোপনিষদও বলা হয়। এটি মূলতঃ অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হলেও এর বাণীসমূহ সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

১.৫.১৫ *প্রেমের বাণী: পবিত্র নতুন নিয়ম,* ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ২০৬, মাহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর, ভারত, ২০১৩: এটি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এটি বাইবেল নামে পরিচিত। এর মূল আলোচ্য বিষয় প্রভু যীশু। প্রচলিত বাইবেলের ৬৬টি অধ্যায়ের ২৭টি অধ্যায় নিয়ে সংকলিত হয়েছে পবিত্র নতুন নিয়ম। বাকি ৩৯টি অধ্যায় পবিত্র পুরাতন নিয়ম যা তোরাহ নামে পরিচিত। পবিত্র নতুন নিয়ম সর্বপ্রথম লেখা হয় চলতি গ্রীক ভাষায়। যা এখানে চলতি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে একে 'ইঞ্জিল শরীফ' ও প্রভু যীশুকে ঈসানবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

১.৫.১৬ কিতাবুল মোকাদ্দেস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬ঃ কিতাবুল মোকাদ্দেস মূলতঃ অনেকগুলো অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। এর মধ্যে তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ, নবীদের কিতাব ও ইঞ্জিল শরীফ একত্রিতভাবে আছে। এগুলোর মূলভাষা হিব্রু, আরামীয় কিংবা গ্রীক। তন্মধ্যে তৌরাত শরীফ বা পবিত্র তোরাহ মসীহ বা মুসানবীর প্রতি, জবুর শরীফ ডেভিড বা দাউদ নবীর প্রতি, এবং ইঞ্জিল শরীফ বা বাইবেল প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বা ঈসানবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

১.৫.১৭ *ধম্মপদ* (পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত), বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৫৪ : বুদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের বাণীর সংকলন গ্রন্থ ধম্মপদ। মূল ধম্মপদ গ্রন্থটি থেরবাদের পালি ধর্মগ্রন্থ ‘খুদ্দক নিকায়’-এর অন্তর্গত। থেরবাদ সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ এটি। ধম্মপদে মোট ২৬টি অধ্যায় ও ৪২৩টি শ্লোক রয়েছে। হিন্দুধর্মে গীতাকে যে মর্যাদায় দেখা হয় বৌদ্ধধর্মে বিশেষত থেরবাদে ধম্মপদকে সে মর্যাদায় দেখা হয়।

১.৫.১৮ সুবোধ চন্দ্র দাস, *শ্রী গুরু গ্রন্থসাহিব পরিক্রমা,* র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২ : শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহেব শিখদের সর্বশেষ গুরু। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গ্রন্থ, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গুরু নানক থেকে শুরু করে দশম গুরু গোবিন্দ সিং এরপর অনন্তকালের জন্য পন্থ খালসার সাথে শিখদের গুরু হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিব। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিব পরিক্রমায় লেখক প্রথমে শিখধর্মের ইতিহাস, গুরুদুয়ারা, অন্যান্য ধর্মের সাথে শিখ ধর্মের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। এরপর শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবের উপর তাঁর গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এগ্রন্থের সূচনা সংস্কৃত ভাষায় হলেও পরবর্তীতে গুরু অঙ্গদদেব কর্তৃক প্রবর্তিত গুরুমূখী ভাষায় এটি লিপিবদ্ধ, এর অন্যনাম সন্তভাষা। এগ্রন্থে রাগের সংখ্যা একত্রিশটি। শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিব তিনটি মূলপর্বে বিভক্ত হলেও বিষয়বস্তু ও রচনার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে দশটি ভাগে ভাগ করা যায়। গুরু নানক, গুরু অমরদাস, গুরু অর্জুন প্রমুখ শিখগুরুদের বাণী ছাড়াও বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান ভগত, ভাট ও সন্তদের রচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমনঃ কবীর জী, নামদেব জী, রবিদাস জী, শেখ ফরিদ জী, কাল প্রমুখ।

১.৫.১৯ সৈয়দ শাহ্ আলম, *শান্তি দর্শন,* পালোমা, রায়েরবাগ, ঢাকা, ২০০৮ : শান্তি বিষয়ক পাঠ হিসেবে এটি একটি সহজপাঠ্য বই। লেখক ঝগড়া, কলহ, মারামারি নিয়ে তার বাল্যবয়সের

সমাধানী চাহিদাকে বিভিন্ন মনীষীদের বাণীর আলোকে কিভাবে সমাধানে নিয়ে গিয়েছেন তা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সমগ্র জাতিসত্তা মিলে একই মানবজাতি এবং এই অখণ্ড মানবসমাজ প্রতিষ্ঠায় লেখকের স্বকীয় চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে বইটিতে।

১.৫.২০ আহমদ রফিক (সম্পাদনা), *সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬: এটি আহমদ রফিকের একটি সম্পাদিত বই যাতে সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি নিয়ে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মোট ১৩ জন লেখকের প্রবন্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে অমলেন্দু দের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা, নূহ-উল আলম লেনিনের সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা, সোমেশ দাসগুপ্তের খোলা চোখে খোলা মনে সাম্প্রদায়িকতা, যতীন সরকারের ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, আহমদ রফিকের সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সম্প্রদায়-সম্প্রীতি বিষয়ক ইশতেহার, কলকাতা ও ঢাকা ঘোষণাপত্র প্রভৃতিও রয়েছে।

১.৫.২১ Sri Sri Thakur Anukul Chandra, *The Messege (Vol I-IX),* Satsang Publishing House, Satsang, Deoghar, 1935 (1st Edition): শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরেজি বাণীসমূহের সংকলন এই গ্রন্থটি। এটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ বিজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাঁকে ইংরেজীতে কিছু বাণী দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সঠিকভাবে ইংরেজি গুছিয়েই বলতে পারতেন না। কিন্তু ১৯৩৪ সালের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজিতে বাণী বলা শুরু করলেন। এ গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর বিষয়বস্তু, যা বাংলা গ্রন্থগুলির সামগ্রিক বিষয়বস্তুকেই ধারণ করে। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সহ বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইংরেজি বাণীসমূহের প্রথম প্রকাশ এটি। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষাগত উৎকর্ষতা, যা স্বাভাবিক ইংরেজির মত ন্যায়, বরং কিছুটা ল্যাটিন সংশ্লিষ্ট বাইবেলের ভাষার মত।

১.৫.২২ Kazi Nurul Islam, *Historical Overview of Religious Pluralism in Bengal,* Bangladesh e-Journal of Sociology. Volume 8, Number 1. 2011: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ধর্মতত্ত্ব চর্চায় ড. কাজী নুরুল ইসলাম একজন অন্যতম পথিকৃত। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তার অনেকগুলো জনপ্রিয় লেখার মধ্যে এটি একটি। 'বাংলায় ধর্মীয় বহুত্ববাদের

ঐতিহাসিক পরিদর্শন’ লেখাটিতে তিনি ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম থেকে শুরু করে বাংলায় ইসলামধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের প্রসারকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মীয় বহুত্ববাদের বর্তমান অবস্থাও এখানে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক যেকোন গবেষণার জন্যই এটি একটি অবশ্যপাঠ্য লেখা।

১.৫.২৩ Huston Smith, *The World’s Religion,* Harper Collince Publishers, India, 1997: সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত সকল বৃহৎ ধর্মমতসমূহ, যেমনঃ হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়াসধর্ম, তাওবাদ, ইসলামধর্ম, ইহুদীধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম তৎসহ এর অভ্যন্তরীন উপবর্গসমূহ যেমনঃ তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম, সুফীবাদ, খ্রিষ্টের শিক্ষা এবং সবশেষে আদিধর্মসমূহ যেমনঃ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া এলাকার আদিবাসী ধর্মমতসমূহের সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় ‘দি ওয়ার্ল্ডস রিলিজিয়ন’ এই বইটিতে। লেখক হাস্টন স্মিথ অত্যন্ত সার্থকতার সাথে বর্ণিত সবগুলো ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়াসধর্ম, তাওবাদ, ইসলামধর্ম, ইহুদীধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও আদিবাসী ধর্মমতসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে এখানে।

১.৫.২৪ Johan Galtung, *Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking,* International Peace Research Institute, Oslo, 1967, p. 70: শান্তিস্থাপন নিয়ে গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে জোহান গ্যালটাং এর ‘শান্তিতত্ত্বঃ শান্তির ভাবনা নিয়ে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী’ লেখাটি একটি আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত। নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণায় শান্তিতত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন লেখক। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি নিয়ে অবস্থার পর্যবেক্ষণে ইউনেস্কোর অন্যতম একটি প্রয়াস ছিল এটি। লেখক এখানে শান্তি নিয়ে গবেষণার তিনটি পরিসর নির্ণয় করেছেনঃ উপজাতিক, আন্তঃজাতিক ও আধিজাতিক। এটি প্রমাণ করেছে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখারই শান্তিস্থাপনে ভূমিকা রয়েছে এবং কোনটিই এককভাবে পর্যাপ্ত নয়। শান্তিস্থাপনে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান যেমন উপজাতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন, ধর্মতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক আইন কিংবা অর্থনীতি আন্তঃজাতিক ও আধিজাতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.৫.২৫ Friedrich, P. ***“Theories of peace and their relationship to language”*****. In: “*****Language, Negotiation and Peace:The Use of English in Conflict,”*** **Continuum, London, 2007 :** ‘শান্তিতত্ত্বসমূহ ও ভাষার সাথে এগুলোর সম্পর্ক’ এ গবেষণায় লেখক ফ্রেডেরিখ প্রথমে শান্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি রূপ বর্ণনা করেছেন। তারপর ইংরেজি ভাষার সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক শান্তিকে সম্পর্কিত করেছেন যেখানে মানবাধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি জড়িত। পরবর্তীতে তিনি সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সংঘর্ষ বিষয় উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে শান্তি প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আন্তঃসংযোগকারী ভাষার মাধ্যমে ভাষা, যোগাযোগ, শিক্ষা ও শান্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাকে শান্তি ভাষাতত্ত্ব বলা যেতে পারে।

১.৫.২৬ Susanna P. Campbell, Michael G. Findley & Kyosuke Kikuta, ***An Ontology of Peace: Landscapes of Conflict and Cooperation with Application to Colombia,*** **International Studies Review, 2017 :** এ প্রবন্ধের লেখকেরা শান্তিগবেষণায় নেতিবাচক শান্তির চেয়ে ইতিবাচক শান্তিচর্চা অর্থাৎ সংঘর্ষ অধ্যয়নের চেয়ে শান্তির ধারণাগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিমাপের সুপ্ত চলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সক্রিয়করণ প্রক্রিয়ায় শান্তির ধারণাগত ব্যাপ্তি সংঘর্ষ ও সহযোগিতা উভয়কেই একত্রিত করেছে। কলম্বিয়ার ১৯৯৩ থেকে ২০১২ সালের প্রেক্ষিতে তৈরী এই গবেষণায় শান্তির দর্শন তুলে ধরা হয়েছে যা আমাদের ভবিষ্যত শান্তি গবেষণায় সহযোগী হবে।

১.৫.২৭ Shiv Talwar, ***The Common Ground: A Unified Basis of Existence (Vol-1),*** **Library of Congress , 2019 :** আজকের মানবসমাজ পৃথিবীর বৈচিত্র্য দেখে একে বিভক্ত হিসেবে দেখে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ঐক্যতানকে দেখতে পায় না। শিব ডি তালওয়ার লিখেছেন যে জাতিগত সংঘর্ষ, পরিবেশগত অবনতিসহ অন্যান্য সমস্যাসমূহের মূলে হল এই বিভক্তি। এটা দেখাতে গিয়ে তিনি শিক্ষার এক নতুন বৈপ্লবিক রূপের প্রস্তাবনা করেছেন যেখানে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞানভান্ডারসমূহ যেমন ভারতীয় বেদ ও উপনিষদ, বাইবেলীয় পুস্তকসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামে ঈশ্বরের নিরানব্বই নাম, ইহুদী আধ্যাত্মিবাদ ও লাও জুর লেখা

এবং আধুনিক জীববিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞানকে একত্রিত করেছেন। ধর্ম বহু হতে পারে কিন্তু তাদের জ্ঞান-দর্শন একই, আর সেই জ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞানের সাথেও একাত্মপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আছে, যা ড. তালওয়ার এই বইয়ে উল্লেখ করেছেন। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দ্বারা মানবতার শাশ্বত ও অনন্য চরম বাস্তব চেতনা গড়ে ওঠে।

১.৬ গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো

শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জোহান গ্যালটাং সংশ্লেষনণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শান্তিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন যেখানে তিনি বিশদভাবে শান্তির ধারণার প্রকরণ তৈরী করেছেন। উপজাতিক, আন্তর্জাতিক ও আধিজাতিক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রকারসমূহ বর্ণনায় তিনি শান্তির মোট ৩৫টি ক্ষেত্র উপস্থাপন করেছেন।[১৩]

ক) শান্তির ধারণার উপজাতিক মৌলিক প্রকারসমূহ

১. ব্যক্তিগত বিবেকী জগত, ২. আন্তঃব্যক্তিগত সম্প্রীতি জগত, ৩. সামাজিক বিবেকী জগত

খ) শান্তির ধারণার আন্তর্জাতিক মৌলিক প্রকারসমূহ

৪. কতিপয় জাতিক জগত, ৫. বহুজাতিক জগত, ৬. একজাতীয়-জাতিক জগত, ৭. নানাজাতীয়-জাতিক জগত, ৮. বিসদৃশ-জাতিক জগত, ৯. সদৃশ-জাতিক জগত, ১০. স্বল্প আন্তঃনির্ভর জগত, ১১. বৃহৎ আন্তঃনির্ভর জগত, ১২. মেরুপ্রবণ জগত, ১৩. মেরুপ্রবণ বিরুদ্ধ জগত, ১৪. সাম্রাজ্যবাদী জগত, ১৫. মিশ্র জগত, ১৬. শ্রেণি বিভক্ত জগত, ১৭. শ্রেণিহীন জগত, ১৮. শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ জগত, ১৯. একক শক্তির জগত, ২০. অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত জগত, ২১. অস্ত্রহীন জগত, ২২. নেতিবাচক অহিংস জগত, ২৩. ইতিবাচক অহিংস জগত, ২৪. চুক্তিভিত্তিক জগত, ২৫. সম্মেলন ভিত্তিক জগত, ২৬. নেতিবাচক ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ব, ২৭. ইতিবাচক ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ব, ২৮. আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাভিত্তিক বিশ্ব, ২৯. মিশ্র বিশ্ব

গ) শান্তির ধারণার আধিজাতিক মৌলিক প্রকারসমূহ

৩০. এলাকাভিত্তিক, ৩১. আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থাভিত্তিক, ৩২. উন্নত রাষ্ট্রভিত্তিক, ৩৩. বৈশ্বিক রাষ্ট্রভিত্তিক, ৩৪. উন্নত আন্তর্জাতিক সরকারী সংস্থাভিত্তিক, ৩৫. মিশ্র বিশ্ব

---

[১৩] Johan Galtung, Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking, International Peace Research Institute, Oslo, 1967, p. 70

শান্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব শান্তির এসব প্রকারসমূহের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। শান্তি স্থাপনে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত কিছু তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব— শক্তিশালী ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে গণতন্ত্র কখনোই পরষ্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা করলেও খুব কম।

পুঁজিবাদী শান্তি তত্ত্ব— আইন র‍্যান্ড তার 'দ্য রুটস অব ওয়্যার' বা 'যুদ্ধের শিকড়' প্রবন্ধে লিখেছেন যে ইতিহাসের প্রধান যুদ্ধসমূহ শুরু হয়েছিল মুক্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে সময়ের অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিসমূহের দ্বারা এবং একমাত্র পুঁজিবাদই মানুষকে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি দিয়েছিল যে সময় গোটা সভ্য বিশ্বের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি, ১৮১৫ সালের নেপোলিয়নের যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শুধুমাত্র ১৮৭০ সালের ফ্রান্স-পারস্য যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ ও ১৮৬০-১৮৬৩ সালের আমেরিকান গৃহযুদ্ধ ছাড়া যেগুলো সম্ভবত শিল্প বিপ্লবের শুরুতে বিশ্বের সবচেয়ে মুক্ত অর্থনীতিই ঘটিয়েছিল। তাই পুঁজিবাদ যে শান্তি স্থাপন করেছে তাকে পুঁজিবাদী শান্তি তত্ত্ব বলা হয়েছে।

শান্তিস্থাপন দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে ফ্রেডেরিখ ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ দুটি রূপ দেখিয়েছেন। যেখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই উপায়েই শান্তি স্থাপন সম্ভব।[১৪]

ইতিবাচক শান্তি তত্ত্ব- ইতিবাচক শান্তি একটি পরিবর্তনের তত্ত্ব সরবরাহ করে। ইতিবাচক শান্তির বিষয়গুলি মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিষয়গুলি শান্তি ও সুখের উচ্চস্তরের দিকে নির্দেশনা দানের ভিতর দিয়ে একটি কাঠামো তৈরী করে, অর্থনীতি এবং সমাজের স্থিতিস্থাপক এবং আরও বেশি পরিবর্তনযোগ্য স্তরগুলিকে আরও শক্তিশালী করে।

নেতিবাচক শান্তি তত্ত্ব- নেতিবাচক শান্তি হলো অশান্ত পরিবেশের অনুপস্থিতি। যেসব অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি বিরাজমান সেসব অঞ্চলে এগুলো নিরসন করাই শান্তির পথ। একেই নেতিবাচক শান্তি তত্ত্ব বলে। এসব ক্ষেত্রে মীমাংসা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

---

[১৪] FRIEDRICH, P. *"Theories of peace and their relationship to language"*. In: "*Language, Negotiation and Peace"*: The Use of English in Conflict. London: Continuum, 2007.

ধর্ম ও শান্তিস্থাপন পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়, কারণ প্রত্যেকটি ধর্মই শান্তি স্থাপনের কথা বলে। গবেষকদের মতানুসারে শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মমতসমূহ উপকারী ও ক্ষতিকর উভয় ভূমিকাই পালন করেছে।[১৫]

প্রচলিত ধর্মমতসমূহ ও শান্তিস্থাপন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাথান সি ফাঙ্ক ও ক্রিস্টিনা জে উলনার তিনটি মডেলের কথা বলেছেন। প্রথমটি হল- একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই শান্তি। দ্বিতীয়টি হল- ধর্ম ছাড়াই শান্তি। আর তৃতীয়টি হল ধর্মের মাধ্যমেই শান্তি।[১৬] এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী ধর্মীয় সংস্থা আছে যেগুলো ধর্ম ও শান্তিস্থাপনের জন্য কাজ করে থাকে, তারাও শান্তিস্থাপনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন। যেমন: ডগলাস জনস্টন নামক একটি প্রতিষ্ঠান এরকম দুটি ইতিবাচক বিষয় তুলে ধরেছে; প্রথমতঃ এলাকাভিত্তিক কাজ করার কারণে সহজে তাদের মতামতের প্রাধান্য দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত করা যা তাদের পরমতসহিষ্ণু ও শান্তির নীতিতে আগ্রহী করে তোলে।[১৭]

শান্তি স্থাপনে সংশ্লিষ্ট কতিপয় তত্ত্ব এই গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে নাথান সি ফাঙ্ক ও ক্রিস্টিনা জে উলনার তিনটি মডেলের সমন্বিত রূপ ফুটে উঠেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে।[১৮]

প্রথমতঃ তাঁর মূল তত্ত্বই হলো ধর্মের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা, যা সবার জন্যই এক এবং সেই ধর্ম অনুসরণ করার ভিতর দিয়ে ঐক্য ও শান্তি স্থাপন। অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত রূপ অনুধাবন করে যে যার মতবাদের প্রকৃত পথ অনুসরণ করবে এবং নিজ প্রেরিত ছাড়াও প্রত্যেক প্রেরিতকেই সম্মান শ্রদ্ধা করবে।

---

[১৫] Nathan C. Funk and Christina J. Woolner, *"Religion and Peace and COnflict Studies,"* in Critical Issues in Peace and Conflict Studies, ed. Thomas Matyok, Jessica Senehi, and Sean Byrne, Lexington Books, Toronto, 2011, pp 351-358.

[১৬] John Siebert, "Religion and Violent Conflict: A Practitioner's Functional Approach," The Ploughshares Monitor, Vol 28, No.2 (Summer 2007),pp9.

[১৭] Douglas Johnston, "Faith-Based Organizations: The Religious Dimension of Peacebuilding." in People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society, ed Paul van Tongeren, et al (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2005), pp. 209-218

[১৮] Nathan C. Funk and Christina J. Woolner, "Religion and Peace and COnflict Studies," in Critical Issues in Peace and Conflict Studies, ed. Thomas Matyok, Jessica Senehi, and Sean Byrne (Toronto: Lexington Books, 2011), pp 351-358.

দ্বিতীয়তঃ যারা নাস্তিক্যবাদী তাদেরও অস্তিত্বের স্বার্থে ও প্রকৃত সর্বতোমুখী উন্নয়নের জন্য ঈশ্বরে বা সেরকম কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করেও কোন আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত। এভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকেই একই অস্তি-বৃদ্ধির পথে একায়িত হতে পারবে, যা প্রত্যেকেই চায়। রকম ভিন্ন থাকবে, ধর্মবোধ এক থাকবে; সম্প্রদায় ভিন্ন থাকবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুর এক থাকবে; ধর্মগ্রন্থ ভিন্ন থাকবে, প্রত্যেকটির মূলতত্ত্বের চর্চায় ঐক্য থাকবে। এভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আপ্ত করে নিয়ে নিজে শান্তিতে থাকবে ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে শান্তিতে রাখবে; স্থাপিত হবে প্রকৃত বিশ্বশান্তি।

সবশেষে একটি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের আলোকে একটি 'বিশ্বশান্তির তত্ত্বীয় পিরামিড' দেওয়া হল যা এই গবেষণার মূল লক্ষ্যকে ধারণ করে।

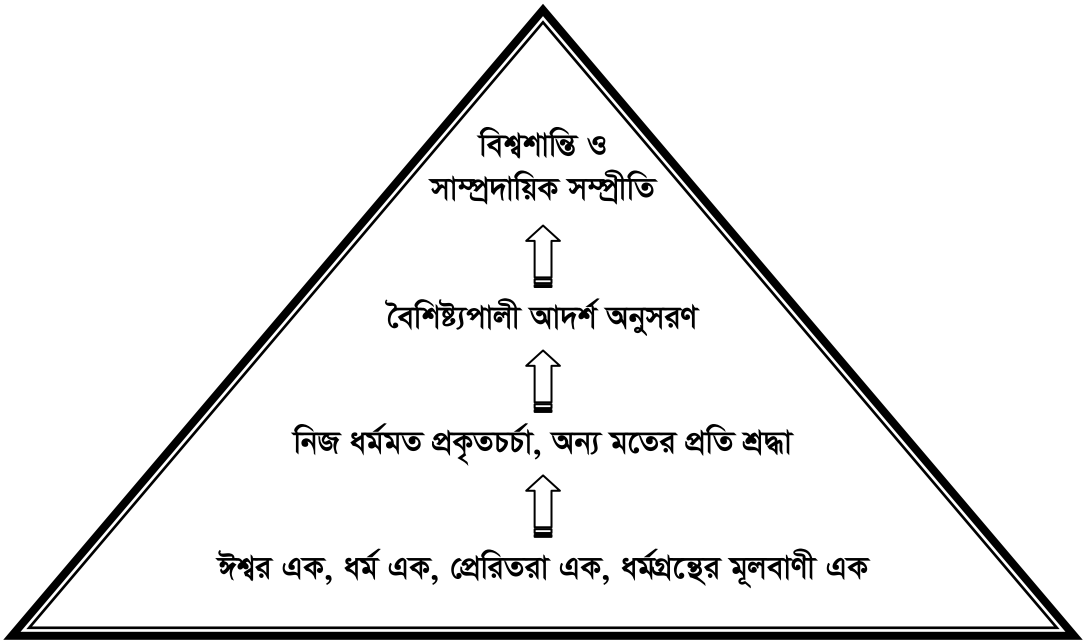
বিশ্বশান্তি ও
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
বৈশিষ্ট্যপালী আদর্শ অনুসরণ
নিজ ধর্মমত প্রকৃতচর্চা, অন্য মতের প্রতি শ্রদ্ধা
ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিতরা এক, ধর্মগ্রন্থের মূলবাণী এক

চিত্র: 'বিশ্বশান্তির তত্ত্বীয় পিরামিড'

১.৭ গবেষণার সুযোগ ও অসুবিধাসমূহ

অতীতে শাসক শ্রেণির ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আগ্রাসনী ঘটনাবলী বাংলায় ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বহুত্ববাদের সূচনা করে। বাংলাদেশ ষোল কোটি জনগণের দেশ। এখানে প্রায় ৮৮% মুসলিম, ১০% হিন্দু আর অবশিষ্টরা বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, বাহাই বা প্রকৃতি পূজারী। স্বাধীনতার পর বাহাত্তরের সংবিধানে যে চারটি মূলনীতি নিয়ে দেশটি যাত্রা

করে তার একটি হলো -ধর্মনিরপেক্ষতা। পরবর্তীতে যদিও এই অবস্থান সুদৃঢ় ছিল না। তবুও বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কোরান, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়।[১৯] সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও বর্তমানে বহুজাতিক ও ধর্মের দেশ হিসেবে শান্তি ও সম্প্রীতিভাব অটুট রেখে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে সদর্পে অবস্থান করছে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে ১৯৮৮ সালে অংশগ্রহণের পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। সম্প্রতি বাংলাদেশের সন্তান ড. মোহাম্মদ ইউনুস শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্বশান্তি নিয়ে কর্মরত প্রায় সকল সংগঠনই বাংলাদেশে কর্মরত। শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয় এখন যেমন বাংলাদেশে সহজপাঠ্য হয়েছে, তেমনি ধর্মীয় বহুত্ববাদ নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ। তাই বলা যায় যে বর্তমান প্রেক্ষিতে এজাতীয় বিষয়ে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

পাশাপাশি কোন গবেষণাই ত্রুটিহীন নয়। এ গবেষণাতেও গবেষককে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলাদেশে বহুত্ববাদ থাকলেও এ নিয়ে বই ও গবেষণা অপ্রতুল। বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, সভা, কিংবা কিছু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পুস্তিকাসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, যা বেশ সময়সাপেক্ষ ও অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল। আবার পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্মগতভাবে বাংলাদেশের সন্তান হলেও তাঁর বিষয়ক প্রায় সমস্ত বইয়ের উৎস বাংলাদেশ নয়। এমনকি বাংলাদেশে স্বনামধন্য গ্রন্থাগারগুলোতেও তার বইসমূহের সরবরাহ অপ্রতুল। তাই সময়মতো প্রয়োজনীয় বইসমূহ না পাওয়া গবেষণাকে বেশ সময়সাপেক্ষ করেছে। অসাবধানতাবশতঃ বানানগত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

---

[১৯] Kazi Nurul Islam, *Historical Overview of Religious Pluralism in Bengal,* Bangladesh e-Journal of Sociology. Volume 8, Number 1. 2011 p.26

১.৮ গবেষণা কাঠামো

'বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: পরিপ্রেক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দর্শন' এই শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এ অধ্যায়গুলোর সমন্বয় করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার মূল বিষয়বস্তু সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে গবেষণার পটভূমি, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা, গবেষণার তত্ত্বীয় কাঠামো, গবেষণার সুযোগ ও অসুবিধাসমূহ, গবেষণা কাঠামো প্রভৃতির মাধ্যমে গবেষণার প্রাথমিক ধারণাকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি'। এ অধ্যায়ের প্রথমে বিশ্বশান্তির ধারণা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বশান্তির সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এরপর সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির ধর্মচর্চায় যে সর্বদা সম্প্রীতিচর্চা ছিল সেটি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বাঙালি সাহিত্য, বাঙালি শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালি ধর্মবেত্তাগণ যে সর্বদা সম্প্রীতির পৃষ্ঠপোষক ও সম্প্রসারক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে তা দেখানো হয়েছে। সর্বশেষে বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে রূপরেখা আছে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিভিন্ন ধর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপ'। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রীতির বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম, ইহুদীধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলামধর্ম, জরথুষ্টবাদসহ অন্যান্য ধর্মদর্শনে যেসব শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী রয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মদর্শন'। এ অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। শেষাংশে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মদর্শন সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ, প্রকৃত ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, আর্য্যধর্ম্ম, ম্লেচ্ছ বা কাফের প্রভৃতি প্রপঞ্চসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে বিভিন্ন ধর্মদর্শনসমূহের অবস্থান'। এ অধ্যায়ে অন্য ধর্মদর্শন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমতসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম,

খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্মসহ অন্যান্য ধর্মদর্শন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসব ধর্মের গ্রন্থ ও প্রবক্তাগণ সম্পর্কে এবং প্রচলিত আচার-প্রথাসমূহ নিয়ে তাঁর সমন্বিত ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাস্তবায়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী রূপরেখা'। এ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেইসব সমাধানী দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে সমাধান হিসেবে প্রকৃত ধর্মবোধ চর্চা করা, ধর্মান্তরিতকরণ নিরসন করা, ঈশ্বর ও প্রেরিতগণকে অভিন্ন ভাবা, বহুত্ববাদে শ্রদ্ধা রেখে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা, মহাপুরুষদের প্রণীত পথের বিকৃতি নিরোধ করা, পবিত্র গ্রন্থসমূহের বাণীর বিকৃতিসমূহ রোধ করা এবং বর্তমান প্রেরিতকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে কিছু সমাপনী মন্তব্য ও সুপারিশের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সমন্বয়ী আদর্শচর্চার যৌক্তিকতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৯ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় এ অধ্যায়ে আলোচিত গবেষণার পটভূমি, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সুযোগ বা অসুবিধা আলোচনার ভিতর দিয়ে 'বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দর্শন' শীর্ষক গবেষণার যে ধারণা পাওয়া যায়, গবেষণা কাঠামো অনুযায়ী আগামী অধ্যায়গুলোতে তারই সার্থক ব্যাপ্তি রয়েছে।

২য় অধ্যায়

বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

২.১ বিশ্বশান্তির ধারণা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

> আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন-'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ', তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্', তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও নয়।[১]- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শান্তি কাকে বলে?' এ প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হতে পারে। শান্তি বলতে কোথাও আত্মিক শান্তি, কোথাও যুদ্ধ না হওয়া, আবার কোথাও সামাজিক ন্যায়বিচার। এসবের সমন্বয়ের গবেষণায় ফ্রেডেরিখ শান্তির যে ধারণা দিয়েছেন তা হল সেই স্বাধীনতার চর্চা যা অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে না।[২] ইতিবাচকভাবে শান্তি হলো সবকিছুর সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা আর নেতিবাচক শান্তি হলো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অনুপস্থিতি। বিশ্বশান্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে আমরা বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত কয়েকজন মনীষীর বাণীর প্রতি আলোকপাত করব।[৩]

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, 'শান্তি কেবলমাত্র যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, বরং বিচার, আইন ও নীতি সংক্ষেপে সরকারের উপস্থিতি।'

মাদার তেরেসা বলেন, 'শান্তির সূত্রপাত হয় একটি হাসি থেকে। তুমি যার সাথে হাসতে পছন্দ করো না, শান্তির জন্য তার সাথেও দিনে পাঁচ বার হাসো।'

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ওয়েইন ডায়ার বলেন, 'আমার নিকট যে মন সবার জন্য উন্মুক্ত আবার কোন কিছুর সাথেই সম্পর্কিত নয়, সেই মনই ব্যক্তিগত ও বিশ্বশান্তি অর্জনে মৌলিক আদর্শ।'

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মবোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী*, (৮ম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৬০০

২. Friedrich, P. "Theories of peace and their relationship to language". In '*Language, Negotiation and Peace*: The Use of English in Conflict. London: Continuum, 2007.

৩. www.brainyqoute.com/topics/world-peace-qoutes

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেন, 'শান্তির ঈশ্বর! আমাদের সংঘাতময় পৃথিবীতে তোমার শান্তি নিয়ে এসো, নর-নারীর হৃদয়ে শান্তি দাও এবং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে শান্তি দাও।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের পথ সোজা ও পরিষ্কার- একটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সবার জন্য স্বাধীনতা ও উন্নয়ন থাকবে, বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা থাকবে এবং বিদেশী সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব থাকবে।

ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান কুয়ামে এনক্রুমা বলেন, 'নব্য-উপনিবেশবাদের কবলে থাকা একটি রাষ্ট্র তার নিজের ভাগ্যের নির্ণায়ক নয়। এই বিষয়টিই নব্য-উপনিবেশবাদকে বিশ্বশান্তির হুমকি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।'

আমেরিকান সেনা জর্জ সি মার্শাল বলেন, 'যদি মানুষ বিশ্বশান্তির জন্য সমাধান না খোঁজে, মানব ইতিহাসে যে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আমাদের ধারণার বাইরে।'

চীনা রাষ্ট্রনায়ক, হু জিন তাও বলেন, 'আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং বিশ্বশান্তি ও সম-উন্নয়ন ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও কাঁধে রয়েছে। বিশ্বশান্তির একটি খাঁটি রক্ষক এবং সম-উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে আমরা আমাদের স্বাধীন শান্তিময় পররাষ্ট্রনীতিতে অটল।'

অর্থাৎ বিশ্বশান্তি যে বর্তমান পৃথিবীতে সবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, কাম্য বস্তু। যে যেখানে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন বিশ্বশান্তি তার নিজের ও তার পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। বিশ্বশান্তি ব্যাক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবখানেই একটি আবশ্যিক ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা মিলে মহাদেশ কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু মিলে মহাসাগর গড়ে ওঠে, তেমনি এক একজন ব্যক্তির শান্তির নিশ্চয়তা ক্রমে ক্রমে একটি সমাজের বা রাষ্ট্রের শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যদি তার মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে ভোগ করে, পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তার নির্দিষ্ট দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করে তখন সত্যিকার অর্থেই ইতিবাচক অর্থে শান্তি অবস্থান করে। পাশাপাশি রাষ্ট্রগতভাবে যদি দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা না

থাকে, বরং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার অটুট থাকে তবে নেতিবাচক অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি জনগনই সেই শান্তি ভোগ করে থাকে।

২.২ বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দুটি আলাদা শব্দ বা প্রত্যয় হলেও একই বিষয়ের ভিন্নরূপ মাত্র। সমগ্র বিশ্বই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই বিভক্তি কখনো বা ধর্মের ভিত্তিতে, কখনো অর্থের ভিত্তিতে, কখনো সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে, কখনো সংখ্যার ভিত্তিতে, কখনো দেশ বা অবস্থানের ভিত্তিতে, কখনো জন্মগত বর্ণ-বংশ-গোত্রের দ্বারা, কখনো বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টানুপাতে কিংবা লিঙ্গের ভিত্তিতে। যেভাবেই তা হোক না কেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের চারপাশে অহরহ দৃশ্যমান। এসব সম্প্রদায়সমূহ পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার ভিতর দিয়েই বেড়ে উঠেছে এবং এখনো সদর্পে টিকে আছে। তাই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হাজারো সম্প্রীতির উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র আমাদের আশেপাশে নিত্য লক্ষ্য করা যায়। তথাপি এ শব্দটি কেবল ধর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে কিছু যৌক্তিক কারণে। তাই ধর্মক্ষেত্রে বিশ্বশান্তির আলোচনাও খুবই জরুরী। কারণ বিশ্বশান্তি হল বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সম্প্রীতিপূর্ণ অবস্থান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চর্চা গড়ে তোলো ঐক্য, যা শান্তির আবাহন করে থাকে। এই মানবতার ঐক্যের কথা প্রত্যেক ধর্মেই উল্লেখ করা হলেও তা থেকে যতই বিচ্যুত হচ্ছি আমরা ততই আমরা শান্তির পথ থেকে চ্যুত হয়ে অশান্তির উদ্‌গম করছি। এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সেরকম সমন্বয়ী কিছু উদ্ধৃতি থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

পবিত্র ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ‘হে মানব! ওঠো! দাঁড়াও! পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয়। জ্ঞানের আলোকবর্তিকা শুধুমাত্র তোমাকেই দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তুমি সকল অন্ধকূপ এড়িয়ে যেতে পার।’ (অথর্ববেদ, ৮/১/৬) ‘মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে কেউই বড় নয়, কেউই ছোট নয়, সবাই সমান। প্রভুর আশীর্বাদ সবারই জন্য।’ (ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫) ‘সত্যিকারের ধার্মিক সবসময় মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সহমর্মী।’ (সামবেদ, ২/৫১) ‘এসো প্রভুর সেবক হই! গরীব ও অভাবীদের দান করি।’ (ঋগ্বেদ, ১/১৫/৮) ‘নিঃশর্ত দানের জন্য রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব।’ (ঋগ্বেদ, ৬/৭৫/৯) ‘সমাজকে ভালবাসো।

ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য কর। সত্য ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। (ঋগ্বেদ, ৬/৭৫/৯) ‘ঈর্ষা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করো। সহিংসতা থেকে বিরত থাকো।’ (সামবেদ, ২৭৪) ‘ধনুকের তীর নিক্ষেপের ন্যায় হৃদয় থেকে ক্রোধকে দূরে নিক্ষেপ করো। তাহলেই তোমরা পরস্পর বন্ধু হতে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।’ (অথর্ববেদ, ৬/৪২/১) ‘একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি যে করে সে মানুষ নয়, সে হায়েনা। তার কাছ থেকে দূরে থাকো।’ (ঋগবেদ, ২/২৩/৭) ‘হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও। পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম করো। জীবনের আনন্দে সম-অংশীদার হও। (অথর্ববেদ, ৩/৩০/৭)[৪, ৫]

পক্ষান্তরে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, ‘হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃজন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায় ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও।’ (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত-১৩) ‘এবং তোমরা পরমেশ্বরের রজুকে একযোগে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে তোমাদের প্রতি তখনকার ঈশ্বরের কৃপাকে স্মরণ কর, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তোমরা তাহার কৃপায় পরস্পর ভ্রাতা হইলে’... ‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে।’ (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১০৩ ও ১১০) [৬] ‘কোন মুসলমান যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ক্ষুন্ন করে কিংবা তাদের উপর জুলুম করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি মুহাম্মদ ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে লড়াই করব।’(আবু দাউদ, ৩০৫২)[৭]

২.৩ সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি এসেছে ‘সম্প্রদায়’ থেকে। সম্প্রদায় বা community বলতে সাধারণত সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হলেও সাম্প্রদায়িতকা প্রসঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়ে

---

৪. পন্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার, *পবিত্র বেদসমগ্র,* কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০০

৫. ড. অলোক কুমার সেন, *বেদ সমগ্র অখণ্ড*, নারায়ণ পুস্তকালয়, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ২০০৫

৬. ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন (অনূদিত), *কোরআন শরীফ*, ঝিনুক পুস্তকা, ৩/১৩, লিয়াকত এভিনিউ, ঢাকা, ১৮২৯, পৃ ৭০৪, ৯৯ ও ১০০

৭. *আল-হাদীস(আবু দাউদ, ৩০৫২)*

থাকে প্রায়শঃ। এই ভ্রান্ত অনুধাবন আমাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে এক অশুভ সত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর সাধারণ মানুষ একেই ধর্ম ভেবে পালন করে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতা কখনো ধর্ম নয়।

সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ সন্ধানে দুটি প্রশ্ন আসে।[৮] প্রথমতঃ কাকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়? নিশ্চয়ই সব ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রকেই নয়। যিনি নিজ নিজ ধর্ম যথাযথভাবে পালন করে এবং অপরাপর ধর্মমতকে বা সেই ধর্মবিশ্বাসীকে অবজ্ঞা বা আঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক সামাজিক সহাবস্থানে বিশ্বাসী তাকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। বরং যিনি কেবলমাত্র নিজ ধর্মকেই একমাত্র সত্য মনে করে এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকে অসত্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করে বা আঘাত করে কথা বলে বা তজ্জাতীয় আচরণ করে বা সমর্থন করে তাকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়। এরূপ বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই জাগতিক বা তথাকথিত ধর্মীয় স্বার্থের নামে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে কিভাবে? 'আমরা'-'ওরা' এই সংকীর্ণ মনোভাবই উক্তপ্রকার চেতনার সূত্রপাত করে। এ মানসিক দূরত্ব ও সংস্কারই সমস্যার মূল কারণ। আর এ দূরত্ব শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশ থেকে। শৈশব কৈশোরে প্রাপ্ত এই পারিবারিক শিক্ষাই একজনকে জীবনের প্রাকলগ্নে এক সংকীর্ণ কন্টকাকীর্ণ পথে ঠেলে দেয় যেখান থেকে সে সাধারণতঃ বের হতেই পারে না। পাশাপাশি কোন গোঁড়া প্রতিবেশী, খেলা বা পড়ার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গৃহশিক্ষক বা ধর্মীয় শিক্ষকের সাহচর্য্যে তা আরও প্রগাঢ় হয়। এভাবে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা, আচার-প্রথা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সে কেবলমাত্র নিজের ধর্মকেই সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে; আর অন্যান্য ধর্মসমূহকে ভ্রান্ত ও অপর বা শত্রু ভাবতে শুরু করে। শৈশবে মনের কাঁচামাটিতে গড়ে ওঠা এই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ আর মুছতে চায় না, বরং পরিণত বয়সে পরিবেশের আনুকূল্যে তা আরও বেশি গভীর হয়। নানা ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে মিশে ঐ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা একান্ত নিজের সম্প্রদায়কেন্দ্রিক এক চেতনায় রূপ নেয়। একেই বলা যায় সাম্প্রদায়িকতা। এর ফলে মানুষ স্বধর্মগত অনেক আচরণ অযৌক্তি হলেও তার সমর্থন করে। যেমন জল ও পানি একই হলেও এর শাব্দিক ব্যবধান সংস্কারে পরিণত হয়।

---

[৮] আহমদ রফিক (সম্পাদক), *সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা*, সাহিত্য প্রকাশ, বাংলাদেশ, ২০০৬. পৃ-১০৫

সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত দিকটি হল সম্প্রীতি। সম্প্রীতি শব্দটি এসেছে সম+প্রীতি থেকে। অর্থাৎ সমান প্রীতি বা ভালোবাসার ভাব না থাকলে কখনো সম্প্রীতি স্থাপন সম্ভব না। আমি আমার ধর্মকে যতটা ভালবাসি অন্য ধর্মকে ততটাই ভালবাসব। আমার আদর্শকে যতটা শ্রদ্ধা করি অন্য আদর্শকে ততটাই শ্রদ্ধা করব। আমার ধর্মীয় গ্রন্থ যতটা শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করি বা এর বাণী যতটা বিশ্বাস করি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোও ততটা শ্রদ্ধাসম্পন্নভাবে পাঠ করব বা বিশ্বাস করব। আমার প্রেরিতকে বা ধর্মবেত্তাপুরুষকে যতটা মূল্যায়ণ করি অন্যান্য প্রেরিতদের বা বেত্তাপুরুষদেরও ততটাই মূল্যায়ণ করব। এই-ই সম্প্রীতি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা যেমন পরিবার থেকে শুরু হয়, সম্প্রীতির চর্চাও ঘর থেকে শুরু হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর চর্চাটি হল পরমতসহিষ্ণুতা। অর্থাৎ সকল মতকেই গুরুত্ব দেওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানা প্রকারে হতে পারে।'[৯]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হবে, অপরের ধর্ম কি বলে সেটা জানতে হবে, অপর সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের মূল বক্তব্য ছাত্রদের পাঠক্রমের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। ছাত্র অবস্থান থেকেই তারা বুঝবে যে, সব ধর্মই মানুষের মঙ্গল চায়। কোনো ধর্মের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব জন্মাবে না।

তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা নয় বরং সর্বসাম্প্রদায়িকতা। সর্বসাম্প্রদায়িকতা হল মানুষের জীবন-বৃদ্ধির উপযোগী সকল ধর্মকে, সকল মতকে, সকল পথকে, সকল প্রেরিত-রাসুল-অবতারকে, সকল ধর্মগ্রন্থকে কিংবা সকল উপাসনালয়কেই সমানভাবে মূল্যায়ন করা। বিভেদচিন্তা ভুলে গিয়ে অভেদচিন্তার চর্চা করা। অপরচিন্তা ভুলে গিয়ে আপনচিন্তা চর্চা করা। তাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও অন্যান্য প্রচলিত বা অপ্রচলিত সকল মতবাদকে শ্রদ্ধা ও নিজের মতের সাথে মিলকরণের চর্চাই এই ভাবের সূত্রপাত করে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'বুদ্ধ-ঈশায় বিভেদ করিস্ শ্রীচৈতন্য-রসুল-কৃষ্ণে, জীবোদ্ধারে আবির্ভূত হন একই ওরা তাও জানিস্ নে।'[১০]

---

[৯] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (৪৫ সংস্করণ)। পৃ. ১৩

[১০] ঐ. ঐ., *জীবন-দীপ্তি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৪১

২.৪ বাঙালির ধর্ম, বাঙালির সম্প্রীতি

বাংলায় ধর্ম শব্দটি ইংরেজিতে Religion শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও মর্মগতভাবে দুটি শব্দের অর্থদ্যোতনা এক নয়, বরং অনেক পার্থক্য রয়েছে। ধৃ ধাতুর সাথে মন প্রত্যয় যোগে গঠিত সংস্কৃত ধর্ম শব্দটি তৎসম শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত, গভীর ও বহুমুখী। সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির অর্থ যা ধারণ করে। এই অর্থে প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা সেই বস্তুর নিজস্বতা বা স্বকীয়তাকে ধারণ করে, তাই সেই বস্তুর ধর্ম। এভাবে জড়েরও যেমন আছে নিজস্ব ধর্ম, জীবেরও তেমনি আছে।

আবার জীবশ্রেষ্ঠ মানবকূলেরও নিজস্ব ধর্ম আছে। মানবিক চেতনা বা মানবিক মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট যেসব অভীষ্ট গুণাবলী অর্জন ছাড়া কারও মনুষ্যত্ব ফুটে ওটে না। মানুষের ধর্মই তাই, পারিপার্শ্বিককে নিয়ে নিজে সুন্দরভাবে বেঁচে-বেড়ে থাকা। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-‘বাঁচা-বাড়ার মর্ম যা, ঠিকই জানিস ধর্ম তা। বাঁচতে নরের যা’ যা’ লাগে, তাই নিয়েইতো ধর্ম জাগে।’[১২] পক্ষান্তরে ইংরেজি Religion শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Religio থেকে, যার অর্থ to bind. অর্থাৎ Religion হল কোন নিয়ম বা কানুনে বেঁধে রাখা বা বাধ্য করা।[১৩] Religion শব্দের অর্থ হিসেবে বাধ্যতা ও কর্তব্যবোধ এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে প্রচলিত অর্থে Religion বলতে কোন এক বিশ্বাস এবং তাকে কেন্দ্র করে আচার-আচরণ, প্রথা, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতিকে বোঝনো হয়ে থাকে। সেই অর্থে ধর্মকে এর সমার্থক হিসেবে ধরলে ধর্মের মূল অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তিত অর্থই ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার বা সম্প্রদায়-কেন্দ্রিকতার উদ্ভব ঘটায়। বড় বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে, যেগুলো একসময় পূর্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। যেমন- হিন্দুধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব-শাক্ত, বৌদ্ধধর্মের হীনযান-মহাযান, খ্রিষ্টধর্মের ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট, মুসলমানধর্মের শিয়া-সুন্নী প্রভৃতি। এসব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও আবার রয়েছে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-আদিবাসী ধর্ম মিশ্রিত এক মিশ্র অসাম্প্রদায়িক রূপের।

---

১১. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ২৮৩

১২. Harper, Douglas. *‘Religion’. Online Etymology Dictionary,* 01-06-2019

বাঙালি ভারত উপমহাদেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি এলাকায় দীর্ঘ সময়ের বাস এদের। হিন্দু ও ইসলাম দুটি প্রধান ধর্ম বঙ্গে কয়েকশত বছর ধরে পাশাপাশি প্রচলিত থাকায় বাঙালিদের কোন কঠিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় নি, উল্টো পুরো বাঙালি সমাজের বিভিন্ন আচার বিচার, সংস্কার, কিছু যজ্ঞপালনের রীতি দুই ধর্মীয় সমাজে প্রায় একই হয়ে ওঠে।[১৩] বাংলার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার স্থান কখনো ছিল না। এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-চর্চা, ধর্মীয় আচার, স্থাপত্য বা সভ্যতা নিদর্শন কোন কিছুই সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দেয় না। এদেশের ধর্মবেত্তা মনীষীরাও কখনো ধর্মপ্রচারে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেননি।

২.৪.১ বাঙালি সাহিত্যে সম্প্রীতির রূপঃ বাঙালি কবি বড়ু চন্ডীদাসের লেখায়- “শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ লালন শাহ তো কোনপ্রকার জাতপ্রথাকেই স্বীকার করতেন না। তাঁর কথায়-‘কেউ মালা কেউ তসবী গলে নাই তো ওে জাত ভিন্ন বলে, যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কারে।’ পাঞ্জাশাহ তাঁর বাউল গানে লিখেছেন-‘শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওর মন পাগেলা। সে ভাবে আল্লাতালা বিষয়লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা। আর কতজন জপে মালা তুলসীতলা হাতে ঝোলে জপের মালা, কতজন হরি বলে মারে তালি নেচে গেয়ে হয় মাতেলা। কতজন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে দিয়েছে মেলা।’ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম-সম্প্রদায় বিষয়ে সর্বদা সমন্বয়বাদী মত পোষণ করতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রদ করতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য তিনি রাখীবন্ধনের প্রবর্তন করেন। হিন্দু-মুসলমানের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য তার চেষ্টা ছিল নিরন্তর। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক করেছেন তাঁর আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।’[১৪] তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো দুটি ধর্মকেই ধারণ করতেন নিজের বলে। তাঁর ইসলামী সঙ্গীতের গূঢ়ার্থ প্রমাণ করে যে তিনি একজন খাঁটি ইসলাম অনুরাগী। আবার তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের বাণীতে স্পষ্টতরভাবে এক শ্যামা মায়ের ভক্তের রূপ ফুটে ওঠে। যা কোন অংশে রামপ্রসাদ কিংবা কমলাকান্তের চেয়ে কম নয়। অন্যান্য ভজন সঙ্গীতেও সে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বলে তাঁকে

---

১৩. ড: ফজলুল আলম, সংস্কৃতিতত্ত্ব ও বাঙালি, কথাপ্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৩১

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা*, বসুন্ধরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.২৮

বাস্তবিকভাবে একজন খাঁটি হিন্দু অনুরাগী বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রকৃত অর্থে তিনি দুটি ধর্মই একাধারে ধারণ করতেন। তাইতো তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমনি হিন্দু তাহার প্রাণ।”[১৫] আবার বলেছেন, “হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।”[১৬] তাইতো বাঙালি মানবতার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,‘জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।” [১৭]

২.৪.২ বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সম্প্রীতির রূপঃ গির্জার ঘন্টাধ্বনি, মসজিদের আযান, মন্দিরের শঙ্খ নিনাদ কিংবা প্যাগোডার মন্ত্রের এক সমন্বিত সুর বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। সব মিলে এ এক ঐকতান। এ এক বিচিত্র সংস্কৃতি। এ চিরন্তন বাঙালি সংস্কৃতি।

প্রাচীন বাংলায় প্রকৃতি পূজার পাশাপাশি আর্যদের প্রণীত হিন্দুধর্ম একই সাথে পালিত হয়েছে। পরবর্তীতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হলেও তা হিন্দুধর্মের সাথে কখনো দ্বন্দ্ব বা বিভেদ সৃষ্টি করেনি। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অনুসারী পাল রাজাদের আমলে আমরা হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রীতির চিত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ রাজারা হিন্দুদের মন্ত্রী ও রাজকীয় উচ্চপদসমূহে রাখতেন। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিল একজন ব্রাহ্মণ। তখনকার তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ্য মন্দির নির্মাণে ভূমিদানের কথা জানা যায়। সেন আমলেও এধারা অনেকটা অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম আগমনেও ধর্মীয় বিদ্বেষের চেয়ে সম্প্রীতির দিকটি লক্ষ্য করা যায়। সর্বধর্মসমন্বয়ার্থে মোগল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত ‘দীন-ই-এলাহি’ ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানি। সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দুধর্মের মানসিংহ। যদিও সম্রাট জাহাঙ্গীরের পূর্বে বাংলায় দিল্লীর মোঘল শাসন কখনোই স্থিতাবস্থা লাভ করেনি তবুও সম্রাট বাবরের স্বীয় পুত্র হুমায়ুনকে লেখা এক গোপন চিঠি বেশ সহিষ্ণু ভাবেরই প্রকাশ করে,‘হিন্দুস্তানের জনগণের মন জয় করার জন্য গোহত্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। অন্যান্য ধর্মের মন্দির বা ভজনালয়গুলো অপবিত্র কোরো না। শিয়া-সুন্নী ভেদাভেদ করো না, ওটি ইসলামের দুর্বলতা। তরবারির জোরে নয় দয়ার দ্বারা ইসলামের প্রচার করো।’[১৮]

---

১৫. রশিদুন নবী (সম্পাদনা), *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৮

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম, *সর্বহারা*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৭,পৃ.১৭

১৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৪

১৮. সুরিন্দার কাউর ও তপন সান্যাল, *দ্য সেকুলার এম্পারার বাবর*,লোকগীত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৬৫

২.৪.৩ বাঙালি ধর্মবেত্তাদের সম্প্রীতির রূপঃ প্রেমের অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমাজের নিম্নবর্গীয় বুকে জড়িয়ে ধরে হরিনাম বিতরণ করতেন। অত্যাচারী জগাই-মাধাইকে তিনি ভক্তে রূপান্তরিত করেন। তাঁর প্রভাবে মুসলমান 'যবন হরিদাস' বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করেন। নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁর নিকট হিন্দু মুসলানের কোন ভেদ ছিলনা। জাতিভেদের অসারতা দেখাতে তিনি শুদ্র রামরায়কে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন।[১৯]

সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য খ্যাত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, "যত মত তত পথ।" তিনি বিভিন্ন মতে ও পথে সাধনা করে দেখান যে সবই এক। 'ঈশ্বরের অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে, যেভাবে তাঁকে ডাকতে ভালোলাগে সে সেই নামে ও ভাবে ডাকলে তার ঈশ্বরলাভ হয়।"[২০] শিবজ্ঞানে জীবসেবাই তত্ত্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সার্বজনীন রূপকে তুলে ধরেন। শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ শেষে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামিগুলোর ভয়াবহ ফলস্বরূপ, ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে। বারবার এটিকে নরশোণিতে সিক্ত করেছে। সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং জাতিসমূহকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এ ভীষণ পিশাচগুলো যদি না থাকত, তা হলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হত। তবে এর মৃত্যুকাল উপস্থিত এবং আমি সর্বতো আশা করি এ ধর্ম মহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে, তাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি, অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যেও দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।' এভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা কেবলমাত্র বিশ্বজনীন সহনশীলতাতেই বিশ্বাস করি না, আমরা সব ধর্মকেই মত্য বলে স্বীকার করি।' সর্বধর্মের সমন্বয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ইচ্ছা করি না যে, খ্রিষ্টান হিন্দ হউন অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিষ্টান বা মুসলিম হউন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মগুলোর সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহন দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদগুনসমূহ কোন ধর্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নত চরিত্র

---

[১৯] দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৮৬

[২০] শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়, কলকাতা, ২০১২

নর-নারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শীঘ্রই দেখিবেন...সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, সমর নহে- সহায়তা, বিনাশ নহে- বরণ! দ্বন্দ্ব নহে- মিলন ও শান্তি।'[২১]

এছাড়া অতীশ দিপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শ্রীঅরবিন্দ, মা আনন্দময়ী, স্বামী প্রণবানন্দজী, প্রভু নিত্যানন্দ, স্বামী নিগমানন্দ, সিদ্ধান্ত স্বরসতী, রাণী রাসমনি, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর, আচার্য গুরুনাথ, প্রভু জগদ্বন্ধু, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রত্যেক বাঙালি ধর্মবেত্তাদের জীবনে কখনো সাম্প্রদায়িক আচরণ পাওয়া যায় না। বরং জাতি-বর্ণ-ধর্মের আপামর জনতা সর্বদা তাঁদের নিকট একই রমক ব্যবহার পেয়েছে। তাঁদের আদর্শ ও বাণীও সকলের জন্যই একই রকম ছিল। আবার এদেশে আগত ইসলাম প্রচারকগণের নিকটও (সুফি শাহ জালাল, সুফি শাহ মখদুম, সুফি শাহ পরাণ) সকলের অবাধ যাতায়াত লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষু ও খ্রিষ্টান যাজকদের নিকটও ভালোবাসার উদাহরণই বেশি দেখা যায়। সর্বশেষ ধর্মের বাস্তব মূর্তাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে আমরা এই গবেষণাতেই জানতে পারব।

২.৫ বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপরেখা

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২ক রাষ্ট্রধর্ম [২২] নিয়ে বলা হয়েছে- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা[২৩] সম্পর্কে অনুচ্ছেদ-১২-এ বলা হয়েছে- ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য-

ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

---

[২১] মোঃ দিদারুল আলম, *স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী দার্শনিক*, ভারত বিচিত্রা, বাড়ি-২, রোড-১৪২, গুলশান-১, ঢাকা, ২০১৪ (জানুয়ারি সংখ্যা), পৃ. ০৮

[২২] হাসান মোঃ হাফিজুর রহমান ও আব্দুল ওয়াদুদ, *বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)*, মোরশেদ ল বুক হাউজ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ০৬

[২৩] ঐ. ঐ. পৃ. ১৭

ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

সুযোগের সমতা[২৪] নিয়েঅনুচ্ছেদ-১৯-এ বলা হয়েছে যে-

১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি[২৫] নিয়ে অনুচ্ছেদ-২৩ক-এ বলা হয়েছে যে-

রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যসংনক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন[২৬] নিয়ে অনুচ্ছেদ-২৫-এ বলা হয়েছে যে-

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়-অনুযায়ী পথ পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন;এবং

গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

---

২৪. ঐ. ঐ. পৃ. ২৪

২৫. ঐ. ঐ. পৃ. ২৮

২৬. ঐ. ঐ. পৃ. ২৯

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য[২৭] নিয়ে অনুচ্ছেদ-২৮-এ বলা হয়েছে যে-

১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

আবার, সরকারী নিয়োগলাভের সুযোগের সমতা[২৮] নিয়ে অনুচ্ছেদ-২৯-এ বলা হয়েছে যে-

১) প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেইক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হইবে না।

৩) এই অনুচ্ছেদের যেকোন কিছুই-

ক) নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে;

খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যেকোন আইন কার্যকর করা হইতে;

---

[২৭] ঐ. ঐ. পৃ. ৩০

[২৮] ঐ. ঐ. পৃ. ৩১

গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা[২৯] অনুচ্ছেদ-৪১-এ বলা হয়েছে যে-

১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-

ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রাহিয়াছে।

২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

২.৬ উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিশ্বশান্তি হলে সম্প্রদায়সমুহে সম্প্রীতি সম্ভব। আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ইতিবাচক মানসিকতার চর্চা করতে হবে। তাহলে প্রত্যেক ধর্ম বা মতবাদ, ধর্মবেত্তা মনীষী ও তাঁদের বাণীসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন আত্মিক অনুরণন তৈরী হবে। আর আবহমান বাঙালি সত্তা চিরকাল সেই অসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বহন করে চলেছে। এখনও বাংলার সনদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় বহুত্ববাদের চর্চাকেই গুরুত্বেও সাথে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

---

[২৯] ঐ. ঐ. পৃ. ৪৫

৩য় অধ্যায়

বিভিন্ন মতবাদসমূহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপ

৩.১ বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রীতির বাণী

প্রত্যেক ধর্মই মানুষের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু শান্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের সারবস্তু হল এই শান্তি, কারন শান্তিস্থাপন ছাড়া কোন ধর্মেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হতে পারে না। প্রধানত প্রত্যেক ধর্মের লক্ষ্যই হল মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও প্রত্যেক সত্তাকে মহত্বের পথে পরিবর্তন করানো। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছাড়া এজাতীয় নির্দেশনা, জ্ঞানদান ও অনুশীলন সম্ভব নয়।

উৎপত্তি স্থান অনুসারে বিশ্বের প্রচলিত ধর্মমতসমূহকে প্রধানত দুটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটি ভারতীয় প্রাচ্য ধারা, অন্যটি আরব-ইসরাঈলীয় ধারা। প্রথম ধারায় গড়ে উঠেছে সনাতন বা হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারায় গড়ে উঠেছে ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এ দুই ধারার মাঝে প্রাচীন পারস্যে অর্থাৎ বর্তমান ইরানে গড়ে ওঠে জারাস্ট্রার প্রচারিত একেশ্বরবাদী একটি ধর্ম যা, জরথুষ্টবাদ নামে পরিচিত। এর বাইরে দূরপ্রাচ্যে গড়ে ওঠা কনফুসিয়াসবাদ, তাওবাদ কিংবা সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ধর্ম, আদিবাসী ধর্ম ও আরও অন্যান্য প্রচলিত সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। যাহোক গবেষণা অনুসারে দেখা যায় পৃথিবীতে প্রচলিত ৪২০০টি ধর্মমত প্রচলিত আছে।[১]

এসব প্রত্যেক ধর্মমতসমূহেই মানব কল্যাণার্থে বিভিন্ন বাণী রয়েছে। এসব বাণীর বাস্তব প্রতিফলনের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রেরিতরা সবরকম সংঘাত এড়িয়ে শান্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। আমরা সেরকম কিছু বাণী নিয়ে আলোচনা করব।

৩.২ ভারতীয় হিন্দুধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি উক্তি স্মর্তব্য।

---

১. https://www.adherents.com

এক. মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিমাণ।[২] দুই. আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহা হিন্দু।[৩]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে সনাতন বা হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনধর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ তো একে অন্যতম জীবিত প্রাচীন সভ্যতা বলেও আখ্যায়িত করেন।[৪] প্রচলিত অর্থে সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মে সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হলেও আন্তঃসম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও এদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ ধর্মীয় স্বাধীনতাও এখানে বেশী। কোন বিশেষ ব্যক্তি এ ধর্মের প্রবর্তক নন। প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা তাদের নিরাকার ঈশ্বরোপলব্ধি থেকেই এর প্রবর্তন। পরবর্তীতে বহুত্ববাদী অনার্য মিশ্রণে তাও এধর্মে স্থান পেয়েছে। এভাবে একেশ্বরবাদেও পাশাপাশি বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ও স্থিতি হয়েছে এধর্মে। বিভিন্ন মতবৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য এধর্মের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই পাশ্চাত্য মনীষীদের ধর্মের সংজ্ঞায় হিন্দুধর্মকে হিন্দুসংস্কৃতি আখ্যায়িত করা হয়েছে। বৈদিক হিন্দুধর্মে বেদ-বেদান্তের দর্শনের উপর ছয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল এই ধর্ম। তবে কালক্রমে তিনটি প্রধান ধারা দাড়িয়ে যায়। যথা: বৈষ্ণবমত, শৈবমত ও শাক্তমত। ম্যাকডেনিয়েল প্রচলিত হিন্দুধর্মের মতবাদসমূহকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: লৌকিক হিন্দুধর্ম, বৈদিক হিন্দুধর্ম, বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম, যৌগিক হিন্দুধর্ম, প্রাত্যহিক হিন্দুধর্ম ও ভক্তিবাদ। হিন্দুধর্মে একাধারে একশ্বরবাদ, বহুদেববাদ, সর্বেশ্বরময়বাদ, অদ্বৈতবাদ এমনকি নাস্তিক্যবাদও স্থান পেয়েছে এই ধর্মে।

হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে, যার অর্থ হল এই পৃথিবীতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং এটি একই সত্তা যা বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জীব ও বস্তুর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই নীতি অনুসারে একজন মানুষ ও তার অনুসারী এক ও অভিন্ন। কারও সাথে কারও কোন ভিন্নতা নেই। এই ধারণা সমগ্র জীবিত সত্তায় এক সমানুভূতির উন্মেষ

---

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী (৯ম খণ্ড)*, ঐতিহ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২। পৃ.৫৯৯

৩. ঐ. ঐ., পৃ. ৫৮৭

৪. J. McDaniel, *Hiduism,* in John Crrigan, *The OxfordHandbook of Religion andEmotion,* Oxford University Press, 2007, pp52-53

৫. Gurdev Singh, *Toynbee on Indian Civilization,* in *Indian History Congress, Vol-46,* 1985, pp108-115

ঘটায়। অপরভাবের নীতিকে এটি নেতিবাচক হিসেবে দেখতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে অপরভাব সহজাতভাবে উবে যায়। তাই এই সত্তার অন্যের বিরূদ্ধে সহিংসতা বা হিংস্রতা করা মানে নীতিগতভাবে তার নিজের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা হিংস্রতা করা। এই নীতিই হিন্দুধর্মে শান্তির আদর্শগত উৎস। বৃটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি এটাকে শান্তির 'বাঁচ এবং বাঁচতে দাও' নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫]

অর্থাৎ এটির অর্থ হল এই যে আমাদের অন্যদের শান্তি প্রদান করা উচিত বিনিময়ে আমরাও তাদের নিকট থেকে শান্তি পাব। সহিষ্ণুতা হল হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক নীতি। এই সহিষ্ণুতা নীতি মূলত সকল ধর্মের সত্যবিশ্বাসকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে। পবিত্র গীতা অনুসারে, প্রত্যেক ধর্মীয় পথই আমাদের একই লক্ষ্যে পরিচালিত করে, যে যেভাবেই ভজনা করুক তা পরমেশ্বরেই মিশে যায় এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে।[৬] স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বিশ্বাসকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন- 'প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসই সত্য।'[৭] হিন্দুধর্মে প্রত্যেক ধর্মকেই সমান অবস্থান দেওয়া হয়েছে।

অন্য কথায় অহিংসার সাধারণ ধারণা আমাদের অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে নির্দেশনা দেয়। একজনের কখনো অন্যের প্রতি সহিংস আচরণে বিশ্বাসী হওয়া উচিত না। ঠিক যখন আমি আমার ধর্মকে সঠিক মনে করি আমার অন্যধর্মকেও সঠিক বলে ভাবা উচিত। নীতিগতভাবে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে সহিংস হওয়াই অন্যায়।

৩.২.১ বৈষ্ণব মতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ : হিন্দুধর্মের প্রধান ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ত্রিধারা: সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা শিব। তন্মধ্যে পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণুকেই ভগবান বলা হয়। ভগবান বিষ্ণুর উপাসক গোষ্ঠী থেকে বৈষ্ণব মতবাদের উদ্ভব। এই সম্প্রদায়ে ভগবান বিষ্ণু ও তার অবতারগণ ঈশ্বররূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত– রামানুজাচার্য প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ, মাধবাচার্য প্রচারিত দ্বৈত মতবাদ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদ অভেদ বা গৌড়ীয় মতবাদ, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ এবং নিম্বার্ক প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ।[৮]

---

৬. *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ, শ্লোক সংখ্যা-১১

৭. মোঃ দিদারুল আলম, *স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী দার্শনিক*, ভারত বিচিত্রা, বাড়ি-২, রোড-১৪২, গুলশান-১, ঢাকা, ২০১৪ (জানুয়ারি সংখ্যা), পৃ. ০৮

৮. Klostermaier, K. K., *A concise encyclopediaof Hinduism,* (1998), p.24 (online article)

বর্তমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদ অভেদ বা গৌড়ীয় মতবাদ বেশ জনপ্রিয়। বেদ, উপনিষদ ও ভাগবত এমতের ধর্মগ্রন্থসমূহ।

৩.২.২ শৈব মতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ: এ মতে ভগবান শিবকেই একমাত্র সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে মনে করা হয়। শৈবরা শিবকে ভগবান মনে করে, শিবকেই তারা সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা মনে করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ শৈব দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এছাড়াও শিব পুরান, লিঙ্গ পুরান, স্কন্দ পুরান, অগ্নি পুরান ও বায়ু পুরান শৈবদের প্রধান গ্রন্থ। শৈবদের মধ্যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এ তিনটি শাখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

৩.২.৩ শাক্ত মতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ: এ মতে দেবী স্বয়ং পরব্রহ্ম। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ভগবানের মাতৃকা শক্তিই একমাত্র আরাধ্য।[১০] এর পুরুষ রূপই শিব। তাই শৈব সাধনার সাথে শাক্ত সাধনার বেশ মিল রয়েছে। ঈশ্বর পুরুষ আর যে প্রকৃতির আশ্রয়ে তিনি জগত সৃষ্টি করলেন তাই তাঁর হ্লাদিনি শক্তি। এই শক্তি জগতপ্রসবিনী, জগদ্ধাত্রী। তার আর এক নাম মহামায়া। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে একাধারে শিব ও শক্তিকে পূজা করা হয়। দেবী ভাগবত পুরাণ হলো এ মতের প্রধান পুরাণ। তন্ত্র সাধনা এ মতের অন্যতম একটি ধারা।

তবে বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত যে মতের মধ্যে যত মতানৈক্য থাক, কেউই সম্প্রীতি চর্চায় হিন্দুধর্মের মূল সাধনার চর্চার বাইরে গিয়ে কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি বরং সম্প্রীতিমূলক চিন্তা-চেতনারই বিকাশ ঘটিয়েছে। এসব বাদের মূল বিষয় হলো ভক্তিবাদ, যেখানে সবাইকে ভালোবাসা ও আপন করার শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৩.২.৫ বৈদিক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ: বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে মানুষের জীবনে তিন প্রকার বিঘ্ন আসে: আধ্যাত্মিক (শারীরিক ব্যাধি, মানসিক অস্থিরতা, অঙ্গহানি প্রভৃতি), আধিভৌতিক (সাপে কামড়ানো, বাঘে ধরা প্রভৃতি) ও আধিদৈবিক (বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতি)। এসব বিঘ্নরহিত উদ্বেগশূন্য আনন্দময় জীবনকেই বলা হচ্ছে শান্তি। বেদে, উপনিষদে বেশ কিছু শান্তি মন্ত্র রয়েছে।[১১]

---

[৯] স্বামী তত্ত্বানন্দ, *বৈষ্ণব বিভক্তি, শৈব বিভক্তি ও মাতৃ সাধনা*, ফিরমা কেএলএম প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৯৮৪

[১০] Subramunyaswami, *Merging with Siva: Hinduism’s Contemporary Metaphysics, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 2000,* p1211

[১১] Swami Devarupananda (Compiler), *Mantra Pushpam*, Ramakrishna Math, Khar, Mumbai, India, p. 6 and 206

যেমন:

ওঁ স্বস্তি নো ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ।
স্বস্তি নোস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। (ঋগ্বেদ, ১।৮৯।৮, ৬)

অর্থ: বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন। সকল জ্ঞানের আধার ও জগতের পূষক পূষা আমাদের মঙ্গল করুন,অহিংসার পালক তার্ক্ষ্য আমাদের মঙ্গল করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।। (ঈশোপনিষদ, শান্তিপাঠ)

অর্থ: পরব্রহ্ম পূর্ণ, নামরূপ ব্রহ্মও পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ উদগত হয়, পূর্ণের পূর্ণত্ব বিদ্যা সহায়ে গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বী নাবধীমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১)

অর্থ: আমাদের সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাদান করুন। উভয়কে সমভাবে বিদ্যার্জনের সামর্থ্য প্রদান করুন। আমাদেও অধীত বিদ্যা যেন সফল হয়, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

ওঁ অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃত্যং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।। (ঐতরেয় উপনিষদ, শান্তিপাঠ)

অর্থ: অসত্য থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।

হিন্দু শাস্ত্র পুরোহিত দর্পন অনুসারে শান্তিমন্ত্রে বলা হয়েছে:

ওঁ সর্বেসাম স্বস্তি ভবতু। সর্বেসাম শান্তি ভবতু। সর্বেসাম পূর্ণম ভবতু। সর্বেসাম মঙ্গলম ভবতু। সর্বে ভবন্তু সুখীনাঃ। সর্বে সান্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু। মা কশ্চিদ দুঃখ-ভাগবেত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থ: সর্বত্র স্বস্তি, শান্তি ও সম্পদের পূর্ণতা আসুক। সকলের মঙ্গল হোক, রোগের নিরাময় হোক, সব জায়গায় প্রশান্তি বিরাজ করুক এবং সকলের সকল দুঃখ দূর হোক। ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

হিন্দুধর্মের যে লক্ষণসমূহ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে তাতে এক সম্প্রীতিমূলক ধর্মের চেহারা প্রতীয়মান হয়। বাণীগুলো সকলের জন্য প্রণীত। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়[১২] বলা হয়েছে,

> ‘অহিংসা সত্যমেস্তয়ং শৌচং সংযমমেব চ
> এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্ ।।’(৬/৩২)

অর্থাৎ হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া- এই পাঁচটি হল ধর্মের লক্ষণ। অহিংস আচরণ তখনই সম্ভব যখন আমরা সমদর্শী হব অর্থাৎ সকল মানুষকে নিজের মত করে দেখব।

মনুসংহিতা[১৩] অনুসারে ধর্ম কতকগুলো গুণেরসমষ্টিমাত্র। এখানে বলা হয়েছে-

> ‘ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমাক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।।’ (৬/৯২)

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, আত্মসংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেন- ‘আমি যে জগতের লোক সেখানে কোন ভেদ নেই, সেখানে সবই সমান সুন্দর।’[১৪] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, ‘যত মত তত পথ।... যাদের সংকীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়। আর যারা ঈশ্বরানুরাগী কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে। তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।’[১৫] আর শ্রীশ্রীঠাকুর তো বলেছেন, ‘ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষগণ একেরেই বার্তাবাহী।’[১৬] আর ‘ওঁ শান্তি’ মন্ত্রে জগতের সকলের শান্তি কামনা করা হয় এ ধর্মে।

---

[১২] স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ (অনুবাদ), *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, বেলুড়, কলিকাতা, ১৯৮৫, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক-৩২, পৃ ১৮৯

[১৩] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, বুক চয়েস, ঢাকা, ২০০৪, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক-৯২, পৃ ২০১

[১৪] মন্টু চক্রবর্তী, *মহাযোগী শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবনী ও বাণী*, অর্পিতা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০। পৃ. ৭০

[১৫] শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৫৬

[১৬] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, জীবন-দীপ্তি (১ম খণ্ড) সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭।, পৃ.৮

৩.৩ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

অন্যান্য ধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্ম মূল ধারনাগত পার্থক্য এই যে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধ মতবাদ কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি তাই বলা যায় একটি নীতি দর্শন বা একটি নৈতিক জীবনধারা। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের (সিদ্ধার্থ গৌতম) জীবন ঐতিহাসিকভাবে সুলিপিবদ্ধ নয়, মনে করা হয় তিনি খ্রী.পূ. ৫৬০ অব্দে উত্তর ভারতে জন্মগ্রহন করেন। যখন তিনি বড় হলেন, তিনি মানুষের দুঃখের চিত্র তার সামনে আসে। যেহেতু তিনি একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, তাই তিনি এই দুঃখ ও ব্যাথার কারণ অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি তখন মানব জীবনের এই দুঃখ ও ব্যাথা নিরসনের লক্ষ্য গ্রহন করেন। দীর্ঘদিনের গভীর উপলব্ধি ও ধ্যানের ফলে, তিনি কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যেহেতু তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল মানুষের দুঃখ দূর করা, তাই তিনি এই সত্যের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন যে মানুষের উচিত সকল চাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করা কারণ এই চাওয়াগুলোই মানুষকে অশান্তি বা সহিংসতাসহ বিভিন্ন পাপের পথে পরিচালিত করে। তিনি মানব জীবন পরিচালনার জন্য যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা নিম্নরূপ:

> ‘একজনের অবশ্যই সকল চাওয়া এবং সকল প্রকার কামনা, যন্ত্রণা ও নৃশংসতা পরিত্যাগ করতে হবে। একজন অবশ্যই কোন জীবিত সত্তার ক্ষতি করবে না। একজন অবশ্যই সকল প্রকার হত্যা থেকে বিরত থাকবে। একজন তেমন পেশায় যুক্ত থাকবে যা অন্যেরও উপকার করবে এবং কারও ক্ষতি করবে না।’[১৭]

নীতিগতভাবে বৌদ্ধধর্মে সহিংসতার কোন স্থান নেই। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি আত্ম-সংশোধন প্রক্রিয়া যা অন্যেও বিরুদ্ধে আক্রমন করার চেয়ে নিজেকে কঠোর নিয়মে সংশোধনকেই প্রাধান্য দেয়। এটা বলা যায় যে বৌদ্ধদর্শনে সহিংসতা বলে কিছুই নেই। আদর্শগতভাবে সহিংসতার সাথে বৌদ্ধমতের কোন সম্পর্ক নেই।

বৌদ্ধধর্ম আজ থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান এ তিনভাগে বিভক্ত।[১৮] তন্মধ্যে থেরবাদ সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা, যা হীনযান বলে পরিচিত ছিল। তা থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে মহাযান তৈরী

---

[১৭] www.factsanddetails.com

[১৮] www.libertyholidays.com

হয়। আর বজ্রযান হল তন্ত্রভিত্তিক তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম। এভাগগুলোর মধ্যে বেশ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ধর্মের ও ভগবান বুদ্ধের অবদান অপরিসীম।

আমরা এখন ধর্মপদ থেকে কিছু পদ উল্লেখের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মে শান্তি ও সম্প্রীতির রূপ নিয়ে আলোকপাত করব।

> ‘আমাকে আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে জয় করিল কিংবা আমার [সম্পত্তি] হরণ করিল,– যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে তাহাদের শত্রুতার উপশম হয় না। জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম।’[১৯]

> ‘যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াও ধর্মানুকূল জীবন গঠন করেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিহারপূর্বক প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া ঐহিক বা পারত্রিক কিছুতেই আকৃষ্ট হন না, তিনিই প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।’[২০]

> ‘যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয়, অশ্রুমুখে রোদন করিয়া যে কাজের ফল ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম না করাই ভাল। যাহা করিয়া পরে অনুতাপ করিতে হয় না, যে কাজের ফল সানন্দে ও প্রসন্নমনে ভোগ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কর্মই করা ভাল।’[২১]

> ‘পরের বিচ্যুতির প্রতি কিংবা পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে না; নিজের কৃত ও অকৃত কার্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।’[২২]

> ‘যেমন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন পুষ্প গন্ধবিহীন হইলে নিরর্থক হয়, সেইরূপ সুভাষিত বাক্য ও কার্যে পরিণত না করিলে নিষ্ফল হয়। যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প সুগন্ধ হইলে সার্থক হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়। যেমন পুষ্পরাশি হইতে নানাবিধ মাল্য প্রস্তুত করা যায়, তদ্রূপ যে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারও বহুবিধ সৎকর্ম করা উচিত।’[২৩]

---

১৯. ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধম্মপদ,* বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা, ভারত, পৃ. ২
২০. ঐ. ঐ. পৃ. ৮
২১. ঐ. ঐ. পৃ. ২৬
২২. ঐ. ঐ. পৃ. ২০
২৩. ঐ. ঐ. পৃ. ২০-২১

‘যিনি তোমার ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্য ভর্ৎসনা করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধিপ্রদর্শকের ন্যায় দেখিবে। যে ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তাহার মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না।’[২৪]

‘পাপী মিত্রের সংসর্গ করিবে না, নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করিবে না; কল্যাণমিত্রদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে।’[২৫]

‘অর্থহীন সহস্র বাক্য অপেক্ষা একটিমাত্র সার্থক বাক্য-যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে- তাহাই শ্রেয়। অর্থহীন পদযুক্ত সহস্র গাথা অপেক্ষা একটি গাথাই শ্রেয়-যাহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে। অর্থহীন শত গাথা অপেক্ষা একটি ধর্মপদও শ্রেয়-উহা শুনিয়া লোকে শান্তিলাভ করে।’[২৬]

‘(জ্ঞান ও বয়ো) বৃদ্ধের প্রতি সতত অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনকারীর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল- এই চতুর্ব্বিধ সম্পদ বৃদ্ধি হয়।’[২৭]

‘যে ব্যক্তি দুঃশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা সচ্চরিত্র ধ্যানী ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিন বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি অলস ও হীনবীর্য্য হইয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়পরাক্রম ও বীর্যপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি (পঞ্চস্কন্ধের) উদয়বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা উদয়বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ। অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শীর একদিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম দর্শন না করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি ঐ ধর্ম দর্শন করিয়াছেন তাঁহার একদিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।’[২৮]

---

২৪. ঐ. ঐ. পৃ. ২৯
২৫. ঐ. ঐ. পৃ. ৩০
২৬. ঐ. ঐ. পৃ. ৩৭-৩৮
২৭. ঐ. ঐ. পৃ. ৪০
২৮. ঐ. ঐ. পৃ. ৪১-৪২

অতএব বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও অহিংসবাদ একই সুতোয় গাঁথা। বৌদ্ধধর্মের কথা মানেই বুদ্ধের বা জ্ঞানের কথা, ধর্মের বা সত্যের কথা, সংঘের বা মানবজাতির সকলের কথা। এই বুদ্ধের দর্শন।

৩.৪ ইহুদীধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

আরব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করা ধর্মমতসমূহের মধ্যে ইহুদী ধর্ম অন্যতম। প্রেরিত পুরুষ মোসেস বা মূসার অনুসারী এই ধর্ম একেশ্বরবাদী। তারা সৃষ্টিকর্তাকে জেহোবা বলে অভিহিত করে। প্রেরিত পুরুষ ইব্রাহিমের প্রপৌত্র জ্যাকব বা ইসরাঈল, যার উত্তরপুরুষগণ বনি ইসরাঈল বলে পরিচিত। ইসরাঈলের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে অন্যতম একজন ইয়াহুদা যার সন্তানগণ ইহুদী নামে পরিচিত হয়।[২৯] ইসরাঈলী বা ইহুদী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মিশরীয় রাজা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন প্রেরিত পুরুষ মোশী বা ইসলামের নবী মূসা। প্রেরিত পুরুষ ডেভিডও এই জাতিতেই (ইসলাম ধর্মে দাউদ) আবির্ভূত হয়েছেন। এ ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ পবিত্র তোরা যা খৃষ্টানধর্মে পবিত্র পুরাতন নিয়ম বা ইসলাম ধর্মে তাওরাত শরীফ নামে পরিচিত। এটি হিব্রু ভাষায় প্রণীত।

ইহুদী ধর্ম একত্ববাদী। ইহুদীরা প্রচণ্ড কর্মবাদী, কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা রয়েছে। ইহুদীরা পুনরুত্থানবাদী। ইহুদীরা সৃষ্টির সেবাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিবাহ এ ধর্মে বাধ্যতামূলক। তারা জাতিগত স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষায় খুবই সতর্ক। তারা ধর্মপরায়ন। নিয়মিত প্রার্থনায় বিশ্বাসী। তাদের উপাসনালয়ের নাম সিনাগগ। ইহুদীদের মধ্যেও বেশ কিছু আন্তঃশাখা রয়েছে, যেমনঃ ক্যাবালিস্ট, হাসিদিম। তা সত্বেও মানবকল্যানে ইহুদী ধর্ম ও এ ধর্মের অনুসারীদের অনেক অবদান রয়েছে। যেগুলোর পিছনে তাদের ধর্মগ্রন্থের সঠিক অনুসরণের অবদান রয়েছে। পবিত্র তোরাহ-এর তেমন কিছু বাণীর বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হল।

ইহুদীধর্মের ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের পুরোনো। ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, যখন ইসরায়েলীরা মিশর ছেড়ে সিনাই মরুভূমিতে পৌঁছাল, ঈশ্বর তাদের দশটি মৌলিক আজ্ঞা দিলেন

---

[২৯] *'Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.'* পবিত্র তোরাহ, যুডাস, ২০:১৩

যা তাদের সামজিক অস্তিত্বকে পরিচালনা করত। ইহুদীদের প্রতি জেহোবার দশটি অবশ্য পালনীয় আজ্ঞাসমূহ[৩০] হলঃ

১. একমাত্র জেহোবার উপাসনা করা
২. মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করা
৩. আত্মীয়গণের প্রতি সদাচার করা
৪. অনাথদের প্রতি সদাচার করা
৫. অভাবীর প্রত সদাচার করা
৬. সবাইকে সত্যের পথে আহ্বান করা
৭. নিয়মিত উপাসনা করা
৮. দান করা
৯. হত্যা না করা
১০. দেশান্তকরণ নিষিদ্ধ

তার মধ্যে একটি হল- হত্যা করো না। এসব আজ্ঞাসমূহ ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত বা বহির্ভূত সকল প্রকার সহিংসতাকে নিষেধ করে। এটা ছিল ঈশ্বর কর্তৃক মসীহের প্রতি ঐশবাণী। ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে এই নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতির একটি শাশ্বত নির্দেশ। তোরাহ গ্রন্থে অন্য একটি নিষেধাজ্ঞাও একই অর্থ বহন করে। এটি এমন একটি নৈতিক শিক্ষা ধারণ করে যা সকল ধর্মেই একই রকম তবে তা ভিন্ন রকমে হতে পারে। তোরাহর বাণীটি হল-

যা তোমার জন্য ঘৃণার (বা কষ্টদায়ক), অন্যের জন্য তেমন করো না।[৩১]

শান্তি নিয়ে আলোচনায় এই শিক্ষা একদম মৌলিক। আমরা অবশ্যই এমন কাউকে খুঁজে পাব না যে সহিংসতার শিকার হতে চায়। সহিংসতা সবার জন্যই জঘন্য। এই বাস্তবতা আবশ্যক যে মানুষের অন্যের প্রতি সহিংসতামূলক কুকর্মসমূহও ঘৃণা করা উচিত। কোন পরিস্থিতিতেই অন্যের প্রতি সহিংস কর্মকান্ড করা উচিত নয়। নিঃসন্দেহভাবে এই নিষেধাজ্ঞাটি ব্যবহারিকভাবে সর্বক্ষেত্রে একই। এটি শুধু কোন একক ব্যক্তিকে বলা নয় বরং জাতিগোষ্ঠীসমূহের উদ্দেশ্যেও বলা। একটি ব্যক্তিগত আচরণের মানদণ্ড হিসেবে একটি সামাজিক আচরণের মানদণ্ডও বটে।

---

[৩০] *পবিত্র তোরাহ, লেভিটিকাস, ১৯:১৭*

[৩১] *ঐ.ঐ., ইসাইয়া, ২:৪*

তোরাহর এই বাণীটিকে উদ্ধৃত করে অনেক ইহুদী পণ্ডিতের অভিমত এরকম যে পবিত্র তোরাহ-এর মূলকথাই এই, বাকী সব ধারা বর্ণনা।

> "এই অতি আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবীতে মানুষ তাদের অস্ত্র চালনা করবে শস্যক্ষেত্রে এবং তাদের বল্লমসমূহ চালনা করবে ঝোঁপঝাড় ছাটাই করার কাজে। জাতিসমূহ জাতিসমূহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে না।"[৩২]

তোরাহর এই বাণী দেখায় যে, ইহুদী ধর্ম অনুসারে আদর্শ মানব সমাজ হচ্ছে সেইস্থান যেখানে মানুষ তাদের অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করবে, যেখানে যুদ্ধ হবে না, যেখানে সহিংসতা নয় শান্তির ভিত্তিতে মানুষের জীবন গঠিত হবে। শুধুমাত্র মনে হত্যা না করার নেতিবাচক সতর্কীকরণ নয় বরং শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক কাজে মানবশক্তি ও সামর্থ্যকে প্রবাহিত করা জরুরী।

একইভাবে অন্য একটি বাণীতে ঈশ্বরের আশীষ বর্ষিত হয়েছে এভাবে-

> "নেকড়ে মেষশাবকের সাথে বাস করতে পারে, চিতা ছাগের সাথে শয়ন করতে পারে, গরুর বাছুর এবং সিংহ এবং খুব বাচ্চা প্রাণীও একসাথে থাকতে পারে এবং একটি ছোট বালক তাদের পরিচালনা করতে পারে। গরু ভাল্লুকের সাথে খেতে পারে, তাদের শাবকেরাও একত্রে শয়ন করতে পারে, এবং সিংহ ষাড়ের মত খড় খেতে পারে। গোখরোর গর্তের মুখে বাচ্চা খেলতে পারে এবং ছোট শিশু তার হাত কেউটের বাসায় রাখতে পারে। তারা কখনোই আমার পবিত্র সন্তানের কোন ক্ষতি বা ধ্বংস করবে না, যেমন জল সমুদ্রকে পূর্ণ করতে পারে, তেমন পৃথিবীও ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানের আধার হবে।"[৩৩]

এই উক্তিটিতে আমাদের রূপক ভাষায় বোজানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী কেমন হবে। এটি এমন একটি সমাজ যেখানে দুর্বল ও সবল পাশাপাশি অবস্থান করবে কিন্তু কেউ কারো ক্ষতি করবে না কিংবা যেখানে সবাই তথাকথিত ভিআইপির মত সকলসুবিধা ভোগ করবে। এটি সেই সমাজ যেখানে মানুষ অন্যের নিকট থেকে ক্ষতির ভয়মুক্ত হয়ে শান্তিতে বসবাস করবে, যেখানে মানুষ তাকে অন্যের মাঝে খুঁজে পাবে সহিংসতায় নয়, শান্তিতে।

---

৩২. *ঐ.ঐ., ইসাইয়া ৬৫:২৫*

৩৩. *Tanakh: the Jewes Bible* (Numbers 6:26), Varda Books, Skokie, Illinois, USA, 2009. *'The Lord lift up His countenance upon thee, and give thee peace.'*

পবিত্র তোরাহ গ্রন্থে শান্তি সম্পর্কিত আরও কিছু বাণী আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে:

> "ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমাকে রক্ষা করুন। ঈশ্বর তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন এবং তোমাকে অনুগ্রহ করুন। ঈশ্বর তোমার প্রতি আপন মুখ উত্তোলন করুন ও তোমাকে শান্তি দান করুন।"[৩৪] "দেখ, আমি তাহাকে আমার শান্তিকর নিয়ম দিয়াছি।"[৩৫] "এবং আমি ভূমির উপর শান্তি স্থাপন করব।"[৩৬]
>
> "যারা নীতিবান অথচ অসৎ, সহিংসতা ভালবাসেন মহান ঈশ্বর পরীক্ষা নেন, তিনি তাদের তীব্রভাবে ঘৃণা করেন।"[৩৭] "পাপ থেকে ফিরে এসো এবং পুণ্য কর; শান্তি অন্বেষণ কর এবং শান্তির লক্ষ্যে অটুট থাক।"[৩৮]
>
> "বোকা শাসকের চিৎকারের চেয়ে জ্ঞানীর নীরব বাক্যে অধিকতর কর্ণপাত করতে হয়। যুদ্ধের অস্ত্রের চেয়ে জ্ঞান শ্রেয়, কিন্তু একজন পাপী অপেক্ষাকৃত ভাল নষ্ট করে থাকে।"[৩৯] তাহারা আপন আপন খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িবে ও আপন আপন বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে; একজাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর খড়্গ তুলিবে না, তাহারা আর যুদ্ধযাত্রা শিখিবে না।"[৪০] "শান্তি, দূরেও শান্তি এবং কাছেও।"[৪১]

৩.৫ খ্রীষ্ট বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

যীশুখ্রীষ্ট প্রায় দুহাজার বছর আগে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। আজ যেকোন ধর্মের চেয়ে তার অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যীশুখ্রীস্টের শিক্ষা পবিত্র নতুন নিয়মে সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

[৩৪] *ঐ.ঐ.*, (Numbers 25:12), *" Behold, I give unto him My covenant of peace."*

[৩৫] *ঐ.ঐ.*, (Leviticus 26:6), *" And I will give peace in the land."*

[৩৬] *ঐ.ঐ.*, (Psalms 11:5), *'The Lord trieth the righteous; But the wicked and him that loveth violence His soul hateth.'*

[৩৭] *ঐ.ঐ.*, (Psalms 34:15), *"Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it."*

[৩৮] *ঐ.ঐ.*, (Ecclesiastes 9:17-18), *" The quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good."*

[৩৯] *ঐ.ঐ.*, (Isaiah 2:4 & Micah 4:3), *"They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore."*

[৪০] *ঐ.ঐ.*, (Isaiah 57:19), *"Peace, peace to the distant and the close"*

[৪১] *ঐ.ঐ.*, (Isaiah 57:19), *"Peace, peace to the distant and the close"*

এটি শেখায় যে প্রভু যীশু ঈশ্বরের প্রার্থনা, মানবপ্রেম, মানবসেবা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, বাস্তববাদের উত্থান, অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার যদি কেউ তেমন নাও করে এরকম আরও অনেক কিছু। যুদ্ধ ও সহিংসতার সাথে অসম্পৃক্ত এসমস্ত গুণাবলী মূল্যবোধের একটি সমুন্নত সেট তৈরী করে। এবং এসমস্ত মূল্যবোধসমূহ সমাজে দমনের মাধ্যমে নয় বরং প্রত্যয়ের সাথে তৈরী হয়। খ্রীষ্টানধর্মও আজ রোমান ক্যাথলিক, পাশ্চাত্য-অর্থডক্স, প্রাচ্য-অর্থডক্স, প্রটেস্ট্যান্ট, ব্যাপ্টিস্ট, সেভেনথ্ ডে, এডভেনটিস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। এ সত্বেও এধর্মের প্রত্যেকটি শাখাই শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কথাই বলেছে। পবিত্র নতুন নিয়মে প্রভু যীশুর শিক্ষা আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যে শান্তি তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সবকিছুর বিনিময়েও তিনি শান্তি স্থাপনের নির্দেশনা দিয়েছেন। যীশু তার বাণীতে বলেছেনঃ

> শান্তিস্থাপনকারীরাই আশীর্বাদপুষ্ট, যাদের বলা হয় ঈশ্বরের পুত্র।[৪২]

এটি দেখায় যে যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে সবচেয়ে আশীর্বাদপুষ্ট কর্ম হল বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, পারিবারিক জীবনে শান্তি স্থাপন করা, সমাজ জীবনে শান্তি স্থাপন করা, জাতীয় জীবনে শান্তি স্থাপন করা ও বৈশ্বিক জীবনে শান্তি স্থাপন করা। প্রভু যীশুর নিচের বাণীটি সম্ভবত এই শান্তিপূর্ণ বিশ্বের উপলব্ধিঃ

> তোমাদের রাজ্য এসেছে- তুমি তাই করবে যা স্বর্গে করা হয়।[৪৩]

পবিত্র নতুন নিয়মের এই বাণীতে বলা হয়েছে যে যাকে বলা হচ্ছে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাকে শান্তির রাজ্যও বলা যেতে পারে। প্রভু যীশুর শিক্ষা ভালোবাসা ও ভালো ব্যবহারকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে সংযুক্ত করে। এটি পবিত্র বাইবেলে তাঁর একটি বাণীতে বলা হয়েছেঃ

> কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যারা শোনঃ তোমার শুক্রদের ভালবাস এবং যে তোমাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য ভাল কর্ম কর।[৪৪]

এটির অর্থ এই যে তোমার প্রত্যেককেই ভালোবাসা উচিত এমনকি তোমার শত্রুকেও। তোমার প্রত্যেকের প্রতি শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করা উচিত এমনকি যে শারিরীকভাবে অক্ষম তার প্রতি।

---

[৪২] প্রেমের বাণী, পবিত্র নতুন নিয়ম, মথি, ৫: ৯ , *'Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.'*

[৪৩] ঐ. ঐ., মথি ৬:১০ *'Your kingdom come - Your will be done on earth as it is in heaven.'*

[৪৪] ঐ. ঐ., মথি ৫:৪৩ *'But I say to you who hear: Love your enemies and do good to those who hate you.'*

একমাত্র ভালো ব্যবহার যা প্রতীকীভাবে প্রকাশ করা উচিত:

> ‘যে তোমার এক গালে চড় মারে তাকে অন্য গালটি পেতে দাও। যে তোমার কোটটি নিয়ে নিয়েছে তাকে তোমার পাজামাটি দিতেও কুণ্ঠা করোনা। আর, যে তোমার দ্রব্য নিয়েছে তার নিকট তা ফেরত চেয়োনা।’[৪৫]

৩.৬ ইসলামধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

‘ইসলাম’ শব্দটির অর্থের মধ্যেই শান্তি আছে। ইসলাম শব্দটি এসেছে সিলম শব্দ থেকে যার অর্থ শান্তি। আর তাই ইসলাম অর্থ শান্তির ধর্ম। হাদিস ‘সহিহ আল-বুখারী’ অনুসারে নবী বলেছেন যে শান্তি হল ইসলামের অংশ। যেমন নবী বলতে বলা হয়েছে যে একজন মুসলিম সেই যার কথায় ও হাতে জনগন নিরাপদে বাস করতে পারে। অন্যকথায়, মুসলিম প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যে তার কথা ও কর্ম দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতিসাধন করেনা।

ইসলাম ধর্ম এক আল্লাহ ও এক কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন সময়ে এধর্মে বিভিন্ন ধরণের সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে। যেমন- শিয়া (খারেজী), ইবাদিয়া, ইসমাইলিয়া, আগাখান (বাতেনিয়া), সুন্নী (ওয়াহাবী), কাদিয়ানী (আহমাদীয়া), হানাফী, সুফী ইত্যাদি। কিন্তু শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পবিত্র আল-কোরানে স্রষ্টার যে বিভিন্ন নাম রয়েছে তার মধ্যে একটি হল আস-সালাম বা শান্তির উৎস। তাই বলা যায় স্রষ্টাই শান্তি। একইভাবে সহীহ আল-বুখারীতে নবী বলছেন স্রষ্টা শান্তির মধ্যেই অবস্থান করেন। ইসলাম অনুসারে স্বর্গ হল মানুষের আরাধ্য শীর্ষস্থান এবং পবিত্র কোরআনে[৪৬] স্বর্গকে বলছে ‘দার-উস-সালাম’ বা শান্তির গৃহ। (ওয়াল্লা-হু ইয়াদ‘উদ্ইলা-দা-রিছ্ ছালা-মি ওয়া ইয়াহদী মাইঁ ইয়াশাূউ ইলা-সিরা-তিম মুছতাকীম। অর্থ আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।) অন্যক্ষেত্রে কোরআন[৪৭] বলছে স্বর্গের বাসিন্দারা একে অপরকে সম্বোধন করবে ‘শান্তি! শান্তি!’

---

৪৫. প্রেমের বাণী, পবিত্র নতুন নিয়ম, মথি ৫: ৩৯-৪০, *‘To him who strikes you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods, do not ask them back.’*

৪৬. কোরআন শরীফ : সূরা ইউনূস ১০:২৫

৪৭. ঐ. ঐ.: সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:২৬

কোরআন নিঃসন্দেহচিত্তে একটি শান্তির পুস্তক। এটি কোন সহিংসতা বা যুদ্ধের পুস্তক নয়। কোরআনের সমগ্র আয়াতসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তির সাথে সম্পর্কিত। কোরআনের সর্বাগ্রে বলা হয়েছে- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অর্থ পরমকরুনাময় দয়ালু স্রষ্টার নামে। অন্যকথায় স্রষ্টা তাঁর কৃপাস্বরূপ এই পুস্তক আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং এই পুস্তক হল তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ। কোরআন[৪৮] আমাদের বলে 'সমন্বয়ই শ্রেষ্ঠ'। অর্থাৎ ফলাফলের বিচারে সমন্বয় হল সবচেয়ে ভাল অপশন। প্রকৃতিগতভাবেই স্রষ্টা চিন্তা করেন যে সমন্বয়ই আমাদের সাফল্য ও অর্জনের পথে নিয়ে যায় যা সাধারণতঃ সহিংসতার দ্বারা অসম্ভব।

পরমকরুণাময়ের অনুসারী তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খেরা কথা বলতে থাকে তারা তখন বলে 'শান্তি হোক'।[৪৯] যারা পবিত্র কোরাণকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে মানে অর্থাৎ কোরাণের বাণী মেনে প্রকৃত বিশ্বাসী হয়েছে তারা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে শান্তিকামী হবে। যেভাবে যাই হোক না কেন কোনোভাবেই তারা সহিংসতার পথে যেতে পারে না। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য এই যে শান্তিই আইন। ইসলামী শিক্ষা ও মহানবীর ব্যবহারিক জীবনের গোটা পরিসর এটাই সাক্ষ্য দেয়।

পশ্চিমা রাষ্ট্রসমুহের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ধর্মভিত্তিক সমাজে বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ভিন্ন। মূলত এটি রাষ্ট্রের সাথে কোন ধর্মীয় অসম্পৃক্ততাকেই বোঝায়। জনসাধারণ কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধানের অধীন থাকে না। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহ ভিত্তিক আইনে এর রূপ ভিন্ন। এ নিয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতানৈক্য আছে, যারা মনে করেন না যে জনসাধারণের মাঝে ধর্মীয় প্রভাব বন্ধ করা উচিত। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষতাই শরীয়াহ আইনের প্রধান পোষক হতে পারে।[৫০] পশ্চিমা রাষ্ট্রসমুহের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ধর্মভিত্তিক সমাজে বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ভিন্ন।

---

[৪৮] *কোরআন শরীফ, সূরা ৪:১২৮*

[৪৯] *ঐ. ঐ., সূরা আল-ফুরকান ২৫: ৬৩*

[৫০] Naim, Abd Allah Ahmad, *Islam and Secularism state: negotiating the future of Sharia,* Cambridge: Havard University Press, 2008

৩.৬.১ মদীনা সনদ (ইসলামের অলিখিত সংবিধান): ৬২২ সালে ইসলামের নবীজী মহর্মদ মক্কা ছেড়ে মদীনায় যান। ঐ বছর থেকে হিজরী সাল গণনা শুরু হয় এবং মদীনা সনদ তৈরী হয় যা মদীনা চুক্তি নামেও পরিচিত। তৎকালীন ইসলামের অনুসারীদের সাথে কোরায়েশ, ইয়াথ্রিব প্রভৃতি গোত্রসমূহের সাথে সম্প্রীতির একটি দলিল এটি। ইসলামের সাথে ইহুদী ও পাগানদের মধ্যেকার চুক্তি এটি। এখানে সমসাময়িক নয়টি গোত্রকে সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা ছিল যদিও তার মূলে ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ। ইয়াথ্রিব গোত্রেই আটটি ইহুদী গোত্র ছিল। এছাড়াও বানু-আস-শুতিবাহ্ নামে আরেকটি ইহুদী গোত্রও ছিল। এ চুক্তি অনুসারে অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার সশস্ত্র যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়। এর ফলে মদীনায় একটি অসাম্প্রদায়িক কিংবা সর্বসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সে আমলের ইবনে ইসহাকের সিরাহ রাসুলাল্লাহ গ্রন্থে এচুক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।[৫১]

মদীনার অমুসলিমদের অধিকারসমূহঃ

১. ঈশ্বরের নিশ্চয়তা সকলের জন্য সমান।

২. অমুসলিম সদস্যদের একই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। তাদের স্বায়ত্বশাসন ও ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. অমুসলিমরাও দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে ও যুদ্ধখরচ বহন করবে। সেক্ষেত্রে মুসলিমদের সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে না।

৪. মুসলিমদের ধর্মীয় যুদ্ধে অংশ নিতে অমুসলিমরা বাধ্য থাকবে না।

৩.৬.২ বিদায় হজ্বের ভাষণ: ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে **১০**ম হিজরীতে আরাফাতের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত এই ভাষণই তাঁর শেষ ভাষণ। ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধ অনুযায়ী মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে এই ভাষণে চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা ছিল, কারণ এই ভাষণ চলাকালে সূরা মায়িদাহ-এর ৩নং আয়াত অবতীর্ণ হয়: ‘আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকারীকে সুসম্পন্ন করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।’ ভাষণটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন হাদিস, তাফসীর, জীবনী ও

---

[৫১] Ahmad, Barakat, *Muhammad and the Jews,* Vikas Publishing House, 1979

ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের ১৬২৩, ১৬২৬, ৬৩৬১; সহিহ মুসলিম শরীফে ৯৮; তিরমিজি শরীফের ১৬২৮, ২০৪৬, ২০৮৫; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বর্ণিত মসনুদ-এর ১৯৭৭৮ নং হাদিসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সহিহ মুসলিম অনুসারে বর্ণিত যে, 'নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত চিরতরে হারাম ঘোষিত হল।...সাবধান, মানুষের আমানত প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। হে মানব সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ একজন, তোমাদের সকলের পিতা হযরত আদম। আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোন মর্যাদা নেই।...তোমরা আমির বা নেতার আনুগত্য করো যদিও তিনি হন হাবশী কৃতদাস।...সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। জেনে রেখো, তোমাদের পূববর্তীগণ এই বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।'[৫২]

তিরমিজ শরীফে বলা হয়েছে- মহানবী আরাফাতের ময়দানে হজ্বব্রতকারীদের লক্ষ্য করে বিশেষ বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন-"বনি ইস্রাইলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার ইসলাম ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, কিন্তু একটি মাত্র দল ছাড়া অবশিষ্ট জাহান্নামে যাবে।" তখন সাহাবারা বললেন- উহারা কোন দল? নবীজী বললেন- আমি এবং আমার সাহাবা যে তরীকা অবলম্বী। ইহাই মাত্র একটি নাজী (বেহেস্তী) দল।[৫৩]

এ প্রসঙ্গে আমরা কোরআন ও হাদিসের আরও কতিপয় বাণীর উল্লেখ করতে পারি: [৫৪]

ক) তোমরা ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতবিরোধ করিও না।
খ) নিশ্চয় আমি মোশাকে কিতাব দিয়াছি কিন্তু পরে উহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত করা হইয়াছে।
গ) পূর্ণ মুসলিম সেই, পুরুষ বা নারী যার জবান ও হাত থেকে অন্যান্য পুরুষ বা নারী নিরাপদে থাকে।(বুখারি, মুসলিম,মিশকাত)
ঘ) মুসলিম সে যে নিজের জন্য যা কল্যাণকর মনে করে অন্যের জন্যও তা কল্যাণকর মনে করে।"(আহমাদ, মিশকাত)
ঙ) সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

---

৫২. www.sunnah.com , *Sahih Muslim,* Kitab al-Hajj, Hadith 159

৫৩. www.sunnah.com , *Tidmiji Sarif,* Hadith

৫৪. আল-কোরআন, সূরা-আস-সূরা,৪২:১৩ ও আল-কোরআন, সূরা ফসিলত, ৪১:৪৫;

৩.৬.৪ নবীজীর যুদ্ধনীতিঃ বিভিন্ন যুদ্ধের সময় নবীজী যেসব নীতি অনুসরণ করতেন তাতে বোঝা যায় যে তিনি অন্যদের প্রতি এমনকি তার শত্রুর প্রতিও কতটা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তার যুদ্ধ ছিল প্রতিরোধমূলক। তরবারি ব্যবহারের চেয়ে ক্ষমাই ছিল তার যুদ্ধের মূলনীতি।[৫৫] তার যুদ্ধনীতির মধ্যে ছিলঃ

ক. গাছ কেটো না
খ. কোন শিশুকে হত্যা করো না
গ. বৃদ্ধকে হত্যা করো না
ঘ. কোন মন্দির বা গীর্জা ধ্বংস করো না
ঙ. কোন ইমারত ধ্বংস করো না
চ. আত্মসমর্পনকারীকে হত্যা করো না
ছ. পলায়নকারীকে হত্যা করো না
জ. কোন নারীকে হত্যা করো না
ঝ. অসুস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করো না
ঞ. কোন পুরোহিত বা ধর্মযাজককে হত্যা করো না
ট. মৃতব্যক্তির দেহকে বিকৃত করো না
ঠ. খাবার ভিন্ন অন্য কারণে পশু হত্যা করো না
ণ. বন্দীর সাথে ভাল আচরণ কর ও খেতে দাও
ত. ইসলাম গ্রহনে কাউকে বাধ্য করো না

৩.৬.৫ সুফীবাদঃ সুফীবাদ হল ইসলামী আধ্যাত্মবাদ, ইসলামের অন্তর্নিহিত রূপ। এটি ইসলামের আধ্যাত্মিক তাপসদের মরমীবাদ। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে জড়জগত থেকে মুক্তি পাওয়া। সুফীবাদের সমর্থকদের সুফী বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুফ শব্দের সাথে তাসাওউফ শব্দের মিল পাওয়া যায়, যার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। সুফীদের সুফীবাদ পরিপূর্ণ আরাধনা বা আত্মসমর্পণকে সমর্থন করে, যাকে ইহসান বলে। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, ‘ইহসান হল এমনভাবে আল্লাহর আরাধনা করা যে, তুমি তাকে দেখছো, অথবা তুমি তাকে না দেখলেও নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।’[৫৬]

সুফীগণ কট্টর রীতিনীতির বিরোধী। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সন্ন্যাসবাদ এবং আরাধনার পর আল্লাহর নামজপ যাকে যিকির বলা হয়। বুখারী ৫২ ও মুসলিম ১৫৯৯ হাদিসে বর্ণিত আছে, ‘সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়- এটা হচ্ছে হৃদপিণ্ড।’[৫৭]

---

[৫৫] www.kalerkontho.com/print-edition/islamic-life/2016/07/29/386809

[৫৬] Bin Jamil Zeno, Muhammad, *The piller of Islam and Iman,* Darussalam, (1996) p-19

[৫৭] Carl W Ernst, *Tasawwuf (Sufism),* Encyclopedia of Isalm and the Muslim World

তাই সার্বক্ষণিক আল্লাহর নাম-জপের মাধ্যমে হৃদপিন্ডকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনই সুফিবাদের উদ্দেশ্য। সুফীবাদে হযরত মুহাম্মদকেই প্রধান আদর্শ হিসেবে গণ্য করলেও হযরত আলীকে সুফীবাদের জনক বলে মনে করা হয়। সুফীগণ আলীকে প্রথম সুফী বলে মনে করেন। কারণ হাদিসে বর্ণিত আছে, 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা।'[৫৮]

তবে তরিকা বা বর্গের খাতিরে সুফিবাদের বেশ কয়েকটি ধারা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে চিশতিয়া, মাদারিয়া, মেভলেভি, মুরিদিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দি, নিমাতুল্লাহি, সেনুসি, শাযিলিয়া, মাইজভান্ডারী, আহমাদীয়া প্রভৃতি ধারার নাম উল্লেখযোগ্য। আফগানিস্তানের ক্ষুদ্র শহর চিশতে গড়ে ওঠা চিশতিয়া তরিকার মূল কথা হল ভালবাসা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা। মইনুদ্দিন চিশতি এই তরিকার অন্যতম একজন সুফী। ভারতের উত্তর প্রদেশে সুফী সাধক জিন্দা শাহ মাদারের নামে গড়ে ওঠে মাদারিয়া তরিকা। তিনি ইরানী সুফী সাধক বায়েজীদ বোস্তামীর শিষ্য ছিলেন। প্রচলিত প্রথা ভাঙা, বাহ্যিক ধর্মীয় অনুশীলনের উপর শিথিলতা ও আত্মজিকিরের উপর এই তরিকা গুরুত্ব দেয়। প্রখ্যাত সুফী, কবি, আইনবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক জালালউদ্দিন রুমীর মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ১৩শ শতাব্দীতে তুরস্কে গড়ে তোলে এই তরিকা। সেনেগালে গড়ে ওঠা মুরিদিয়া তরিকা সেনেগাল ও গাম্বিয়ায় খুবই জনপ্রিয়। ইরানের আব্দুল কাদের জিলানীর নামে গড়ে ওঠা কাদেরিয়া সম্প্রদায় অন্যতম প্রাচীনতম একটি সুফী শাখা। এই তরিকা ইসলামের মূলনীতিগুলোকেই আধ্যাত্মিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করে। ইসলামের প্রধান সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে একটি হল নকশাবন্দি, আবু বকরকে মানার কারণে এর নাম পূর্বে সিদ্দিকীয়া ছিল। নীরবে জিকির করা এই তরিকার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম একটি তরিকা হল নিমাতুল্লাহি। ড. জাবেদ এই ধারার একজন সুফী। মাইজভান্ডারী বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সুফী তরিকা। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর বংশধর সৈয়দ আহমদ উল্লাহ এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। এর মূলকথা হল প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ। আর আহমাদীয়া মুসলিম জামাত হল মুসলিম পুণর্জাগরণ বা মসীহবাদী আন্দোলন, যা কাদিয়ানি আন্দোলন নামেও পরিচিত। মির্যা গোলাম আহমদ এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা, যাকে কাদিয়ানিরা ইমাম মনে করে।

---

[৫৮] Shaykh Tariq Knecht, *Journal of a Sufi Odyssey*, Tauba Press, 2018

৩.৭ শিখধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

শিখ মতবাদ ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা একটি মতবাদ। 'শিখ' শব্দটি সংস্কৃত 'শিষ্য' হতে নেওয়া। শিখেরা নিজেদের দশ গুরুর শিষ্য বলে স্বীকার করে। এর প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক। ১৪৬৯ সালের ১৩ নভেম্বর পাকিস্তানের লাহেরের তালবন্দী গ্রামে জন্ম তার। পিতার নাম কল্যাণ দাস ওরফে কালু মেহতা এবং মাতার নাম তৃপ্তা। অতি অল্প বয়সে তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। বিবাহিত ও সংসার জীবন শুরু করলেও আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার এবং অর্থহীন ব্যাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। নানকের সমসাময়িককালে পাঞ্জাবে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য বর্তমান ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিবাদান্ত ছিল। উভয় ধর্ম সমন্বয় করতে নানক তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেন।

তার থেকে শুরু করে আরো ন'জন গুরু- গুরু অঙ্গদ, গুরু অমর দাস, গুরু রাম দাস, গুরু অর্জুন, গুরু হর গোবিন্দ, গুরু হর রাই, গুরু হর কৃষাণ, গুরু তেগ বাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিং এ ধর্মের প্রসার করে। তবে গোবিন্দ সিংয়ের পর শিখেরা আর কোন গুরুকে স্বীকার করেনা। তারা দশম বা সর্বশেষ এবং চিরস্থায়ী গুরু মনে করে তাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীগুরুগ্রন্থসাহেব'-কে। পঞ্চম গুরু শ্রীগুরু অর্জুনদেব ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দে সংকলন করেন এই গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠা করেন শিখধর্মের প্রাণকেন্দ্র অমৃতসরের হরিমন্দির। যার মানবীয় সত্তা ঈশ্বরে সমর্পিত এবং যে ব্যক্তি দেহ ও মনে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন তিনিই শিখ।

শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একেশ্বরবাদী। শিখগন বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর এক, নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। তিনি স্রষ্টা, নিত্য, তার কোন শত্রু নেই, তিনি পরম দয়ালু। কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন না। এধর্মে পৌত্তলিকতা নেই, নেই জাতিভেদ ও কোন কুসংস্কার। শিখধর্ম অসাম্প্রদায়িকতা, মানবসেবা, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। প্রত্যেক শিখ পঞ্চ 'ক' ধারণ করেন। পঞ্চ 'ক' হলো- কেশ, কৃপাণ, কংহা, কারা ও কাচ্চা। এগুলো ঐক্য ও সমতার প্রতীক। এ ধর্মে সকল প্রকার মাদক ও মাদকজাতদ্রব্য নিষিদ্ধ। নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। শিখ উপাসনালয় গুরুদুয়ারা। প্রাত্যহিক উপাসনায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহন করতে পারে।[৫৯]

---

[৫৯] *বাংলাদেশে শিখ ধর্ম*, শিখ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১০। পৃ. ১

একেশ্বরবাদঃ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানদের মত শিখ মতবাদেও সমগ্র সৃষ্টির একজন স্রষ্টাকে মানা হয়, যিনি একমাত্র উপাস্য। সমগ্র মতবাদের মূলেও তিনি। এ বিশ্বব্রহ্মান্ড, সমগ্র জীবজগতের নিয়ন্তাপুরুষ। এর বিভিন্ন উদাহরণ আমরা গুরু গ্রন্থ সাহেবের বিভিন্ন উক্তিতে পাই।[৬০]

গুরু নানকদেবজী বলেন- 'শব্দ তাঁকে বর্ণনা করতে অপারগ।'

গুরু অমরদাসজী বলেন- 'এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি শাশ্বত, তিনি সর্বত্র বিরাজিত, তিনি স্রষ্টা, তিনি পরমসত্তা, তিনি নির্ভয়, তিনি শত্রুহীন, তিনি কালাতীত সত্তা, তিনি অবতীর্ণ হন না। তিনি স্বয়ং অস্তিত্বশীল, কেবল গুরুর কৃপা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।'

নামদেবজী বলেন- 'হিন্দু প্রার্থনা করে মন্দিরে, মুসলমান প্রার্থনা করে মসজিদে, কিন্তু নামদেব তাঁকেই প্রার্থনা করে যে মন্দিরেও থাকে না, মসজিদেও থাকে না।'

গুরু অর্জুনদেবজী বলেন- 'ঈশ্বর সকল দুঃখহরণকারী এবং সকল পাপমোচনকারী। ঈশ্বর বেদ থেকেও দূরবর্তী তিনি সকল পবিত্র গ্রন্থের অতীত।'

ধার্মিকঃ অন্যান্য মতবাদের মত শিখ মতবাদেও ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, যারা অন্তরে শুদ্ধ, পবিত্র, অকপট, প্রবৃত্তিবিমুখ তাদেরকে। এখানে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ করা হয়নি। এরকম কিছু উক্তি আমরা গুরু গ্রন্থ সাহেবের বিভিন্ন পর্বে দেখতে পাই।[৬১]

গুরু অমরদাসজী বলেন- 'সেই ব্যক্তি যার হৃদয় কলুষিত এবং তথাপি সে সাধু বলে অভিহিত করে, সে হল কপট এবং সে কখনো ঈশ্বরকে পাবে না। কপট ব্যক্তি যদি উপবাস পালন করে, সে ঈশ্বরকে লাভ করবে না ও সম্মানিতও হবে না।'

নানক বলেন- 'যে সমস্ত ব্যক্তি অন্তরে বিশুদ্ধ তারা গুরুর সাথে চিরকাল বাস করবেন।'

গুরু অর্জুনদেবজী বলেন- 'যা' হোক সাধুর পোশাক মানুষ পরতে পারে, (কিন্তু) সে তার অন্তরের অবিশুদ্ধি গোপন করতে পারে না।'

---

৬০. সুবোধ চন্দ্র দাস, *গুরু গ্রন্থসাহিব পরিক্রমা,* র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০। পৃ. ১২

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ-৭

সম্প্রীতি চিন্তা: অন্যান্য মতবাদের মত শিখ মতবাদেও সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। অন্যের প্রতি বা অন্যমতের প্রতি মনোভাব কেমন হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে আমরা গুরু গ্রন্থ সাহেবের বিভিন্ন পর্বের কিছু উক্তি লক্ষ্য করব।[৬২]

> গুরু অর্জুনদেবজী বলেন- 'সেই ব্যক্তি যার মন একমাত্র ঈশ্বরে নিমগ্ন, সে অন্যের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করে না। যদি তুমি অন্যের মন্দ চিন্তা কর, আমার বন্ধু অন্য কেহ তোমার মন্দ চিন্তা করবে না। কারো জন্য অনিষ্ট চিন্তা লালন করো না, কেননা প্রভু সকলের মধ্যেই বাস করেন। ভ্রাতা, অন্য ব্যক্তির জন্য মন্দ চিন্তা করো না, এভাবে তুমি চিরদিনের জন্য সুখে থাকবে। ভ্রাতা, তুমি অন্যের মন্দ চিন্তা করো না, এবং তাহলে তাহলে কোন মন্দ ইচ্ছা তোমার নিকটে আসবে না।'
>
> গুরু অমরদাসজী বলেন- 'অন্যের মন্দ বলা ভাল নয়, কেবল নীচ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইভাবে কথা বলে।'
>
> গুরু রামদাসজী বলেন-'যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি ঈর্ষায় পূর্ণ, সে কখনো শান্তি পাবে না। সেই ব্যক্তি যে অন্যের প্রতি মন্দ ইচ্ছা বহন করে কোন কল্যাণ তার নিকট সাধিত হয়।'

সন্ত কবীর: সন্ত কবীর শিখধর্মের কোনো গুরুর আসন না পেলেও এইধর্মের অন্যতম প্রধান একজন সন্ত হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয়।[৬৩] তার অনেক বাণীই সরাসরি 'গুরু গ্রন্থ সাহিব'-এ স্থান পেয়েছে। সন্ত বা সুফী ঘরানার সাধকেরা তাই মহাত্মা কবীরকে সর্বদা নিজেদের পূর্বসূরী মনে করে থাকেন। তবে শিখধর্মে তাঁর বাণী বা দোহাসমূহের পৃথক কদর লক্ষ্যণীয়। এপর্যায়ে সন্ত কবীরের ধর্মদর্শন নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

সন্ত কবীর মুসলমানের সন্তান কিংবা মতান্তরে মুসলমানের ঘরে পালিত সন্তান। তার পিতার নাম নূর ও মাতার নাম নীমা। প্রভু রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত রামানন্দ ছিলেন তার গুরু। কিন্তু কবীর গৃহস্থ-সন্ন্যাসী ছিলেন। চলিত হিন্দী ভাষায় তাঁর উপলব্ধিসমূহই তাঁর বাণী বা দোঁহা নামে পরিচিত। তিনি দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনওটাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না।

---

৬২. সুবোধ চন্দ্র দাস, *গুরু গ্রন্থসাহিব পরিক্রমা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০। পৃ. ১১২

৬৩. ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৭

তাঁর মতে-ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁর ব্রহ্ম কাল্পনিক ব্রহ্ম নন, তিনি একেবারে সত্য- সমস্ত জগৎ তাঁর রূপ। সব বৈচিত্র্যই সেই অপরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মকে নিরূপণ করতে হবে না, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হতে হবে। কোথাও যাওয়া বা আসার প্রয়োজন নেই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সাধনা।[৬৪]

শৈবমতের গোরক্ষনাথ, শিখমতের নানক কিংবা বৈষ্ণবমতের চৈতন্যদেব সবাই তাঁর সমসাময়িক সাধক। এসব সাধকের সাথে তাঁর মিলও পাওয়া যায়। শিখধর্মে তাঁর বাণীকে নানকের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈষ্ণবসাধনার সহজ ভক্তির সাথেও তাঁর মিল পাওয়া যায়। আগ্রায় গড়ে ওঠা সন্তমতের সাথেও তাঁর দর্শনের মিল দেখা যায়। সাধারনতঃ ভক্তি সাধনার দুই পরম্পরা ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহাসিকেরা দেখিয়ে থাকেন; একদিকে সগুণ ভক্তি পরম্পরা যার সংস্থাপকদের মধ্যে ধরা হয়, তুলসীদাস, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ, সুরদাস ইত্যাদিকে, অপরদিকে নির্গুণভক্তি পরম্পরা যার একজন মূল প্রবর্তকরূপে কবীরকে দেখা যায়।[৬৫]

তবে কবীরের নিজের মতে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিবাদে অকিঞ্চিৎকর বিভেদ: "সগুণকে সেবা করো নির্গুণ কা করো জ্ঞান। সগুণ নির্গুণতে পরে তহাঁ হমারা ধ্যান।" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের সেবা করো, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করো, আর সগুণ-নির্গুণের অতীত যা সেখানেই আমাদের ধ্যানের বিষয়। এখানেই তিনি দ্বৈত-অদ্বৈতকে এক করেছেন। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বিষয়টি ছিল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণমনস্কতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

তিনি বললেন- 'হিন্দু বলেন আমার রাম, মুসলমান বলেন আমার রহিম- পরস্পরে উভয়ে মারামারি করেন অথচ মর্মকথা কেহই বুঝিলেন না।... কেহ বা পিতল মূর্ত্তি পাষাণমূর্ত্তি পূজা করেন, তীর্থব্রতে কেহবা ভ্রান্ত রহিয়াছেন, কেহ কেহবা মাল্য ধারণ করেন, টুপী পরিধান করেন. ছাপা তিলক করেন, দোঁহা জপ করেন, ভজন গান করেন- কেবল জানেন না পরমাত্মাকে।...হিন্দুর দয়া মুসলমানের করুণা উভয়ের ঘর হইতে পলাইয়াছে। একজন বলি দেয়, অন্যজন জবাই করে- উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়েছে।'[৬৬]

---

৬৪. ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৩

৬৫. ঐ.ঐ., পৃ. ১২৭

৬৬. Prabhakar Machwe, *Kabir*, Delhi, 1968, Page:22-34

আবার তিনি বলেন- 'কেহ বলেন রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন আমার উপাস্য রহিম, কেহ বলেন প্রত্যাদেশই আমার চালক, এইরূপে সকলে নানা ভেখ ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছেন। কবীর বলেন, সত্য জ্ঞান ভিন্ন কখই সেই রহস্যের অন্ত পাইবে না।' তিনি আরও বলেন-'হায়রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী দেখিয়াছি। কবীর বলেন, হে সাধু, কোন পথে আমি যাই।'[৬৭]

৩.৮ বাহাইধর্মে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

বাহাই মতবাদ ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা একটি মতবাদ। এটিও একেশ্বরবাদী ধর্ম। এর প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহ। তাকে বর্তমানের প্রেরিতপুরুষ হিসেবে মানেন বাহা'ইরা। ১৮৪৪ সালে ২৩ শে মে ইরানের সিরাজনগরীতে তিনি জন্মগ্রহন করেন। দিল্লীতে অবস্থিত বাহাই পদ্মমন্দিরে সকল ধর্মের উপাসনা করার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।[৬৮]

বাহাই প্রার্থনায় বাহাউল্লাহ বলেন- 'হে আমার প্রভু, আমার প্রার্থনাকে জীবনদায়ী জলের ঝর্ণার মত কর, যা দ্বারা আমি তোমার সার্বভৌমত্ব যতদিন স্থায়ী থাকে ততদিন যেন জীবিত থাকতে পারি এবং তোমার জগতে তোমার নাম উল্লেখ করতে পারি।' আরও বলা হয়েছে-'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হে আমার প্রভু, তোমাকে জানিবার জন্য এবং তোমার উপাসনা করিবার জন্য তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি, এই মুহূর্তে, আমার শক্তিহীনতা ও তোমার সামর্থ্যের, আমার দরিদ্রতা ও তোমার সম্পদের সাক্ষ্য দিতেছি। তুমি প্রভু ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নাই, তুমি বিপদে সাহায্যকারী, স্বয়ং-সত্তাবিশিষ্ট।' বা'ব বলেন-'বল! সকলের জন্য সকল কিছুর উপর ঈশ্বরই যথেষ্ট এবং আকাশমন্ডলে বা ভূ-মন্ডলে এমন কিছুই নাই, যাহার জন্য ঈশ্বর যথেষ্ট নহেন। সত্য সত্যই, তিনি স্বয়ং জ্ঞানী, রক্ষাকারী, সর্বশক্তিমান।'

গুরু বাহাউল্লাহ ধর্মীয় সংঘর্ষসহ সকল প্রকার সংঘর্ষকে নিরুৎসাহিত করে। এই মতের লক্ষ্য এই যে, ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন নির্বাপিত কর এবং ঈশ্বরের ধর্ম ভালোবাসা ও একতার জন্য; একে শত্রুতা বা অনৈক্যের কারণ করে তুলো না। বাহা'ই প্রার্থনায় আছে, 'ঈশ্বর করুন, যেন সমগ্র বিশ্ব একতার আলোকে, সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়।'

---

৬৭. ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৩

৬৮. কাজী ম্যাক, *বাহাইজম-এক ইরানী নবীর উত্থান(১ম সংস্করণ)*, বইপিয়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০

বাহা'উল্লাহ বলেন-'হে আমার ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর! তোমার সেবকগণের অন্তরসমূহ একতাবদ্ধ কর, এবং তাহাদের নিকট তোমার মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর, তাহারা তোমার আদেশাবলী অনুসরণ করুক এবং তোমার বিধান পালন করুক। হে ঈশ্বর, তাহাদের উদ্যমে তাহাদিগকে সাহায্য কর, এবং তোমার সেবা করিতে তাহাদিগকে শক্তি দান কর। হে ঈশ্বর! তাহাদিগকে নিজেদের হস্তে ছাড়িয়া দিও না, বরং জ্ঞানের আলোকে তাহাদের পদক্ষেপগুলি পরিচালিত কর এবং তোমার ভালবাসা দ্বারা তাহাদের অন্তর উৎসাহিত কর। সত্য সত্যই, তুমি তাহাদের সাহায্যকারী ও তাহাদের পরম প্রভু।'

আব্দুল বাহা বলেন-'মানব জাতির মধ্যে একতার পতাকা উন্নীত কর। হে প্রভু! হে ঈশ্বও মহান শান্তি প্রতিষ্ঠিত কর। হে প্রভু, সমস্ত মানব হৃদয়কে মিলিত করে এক করে দাও।....... তোমার করুনাময় অনুগ্রহের সতর্কতায় তাহাদিগকে সমস্ত বিদ্বেষ, ঘৃণা ও পরশ্রীকাতরতা হইতে মুক্ত কর, তোমার ধর্মের দূর্ভেদ্য আশ্রয়ে শরণ দাও এবং তাহাদের মনের সমস্ত সন্দিগ্ধ মনোভাব দূর কর।'

৩.৯ ধর্মীয় প্রতীকসমূহের তাৎপর্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ[৬৯]

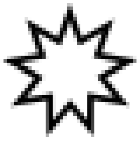 **নবতারকা**	**বাহাই মতবাদ**	বাহাই মতবাদের প্রতীক নয়টি কোণসমৃদ্ধ তারকা, যা বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্যের প্রতি বাহাই বিশ্বাসকে নির্দেশ করে। এ নীতি অনুসারে, এক বিশ্ব পরিবারে মানবতা সৃষ্টি কর এবং পুরো পৃথিবীকে একটি বাসগৃহ তৈরী কর।
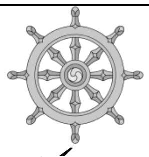 **ধর্মচক্র**	**বৌদ্ধ মতবাদ**	বৌদ্ধ মতবাদের প্রতীক আটটি হাতলসমৃদ্ধ ধর্মচক্র, যা বিশ্বে শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব বা বেঁচে থাকার পথের প্রতি বৌদ্ধ বিশ্বাসকে নির্দেশ করে। এই আটটি পথ হল নির্বাণের পথ।
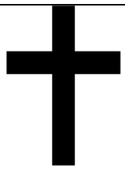 **ক্রুশ**	**খ্রীষ্ট মতবাদ**	খ্রীষ্ট মতবাদের প্রতীক হল পবিত্র ক্রুশ, যা মানবজাতি ও পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য খ্রীষ্টের আত্মত্যাগকে নির্দেশ করে। এটি সবাইকে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে শান্তির ভিত্তিস্থাপনের শিক্ষা দেয়। সবাইকে পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একত্বের শিক্ষাও দেয়।

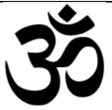 **ওম**	**হিন্দু বা সনাতন মতবাদ**	অ+উ+ম = ওঁ বা ওম। এর দ্বারা নিরাকার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। মূলতঃ শান্তিস্থাপনে ঈশ্বরের প্রধান তিনটি শক্তি সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় একত্রে যে শব্দ তৈরী করে, তা এই ওম। সৃষ্টির প্রথম শব্দ এই ওঁ। যেহেতু সকল জীবের উৎপত্তি এক ব্রহ্ম থেকে, তাই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে স্বস্তিবচনে বলা হয়ে থাকে- ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।
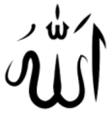 **আল্লাহ**	**ইসলাম মতবাদ**	আরবী হরফে লেখা আল্লাহ-একেশ্বরবাদের প্রতীক। এক আল্লাহ থেকেই জগতের উদ্ভব, আর সেই একেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় সব কিছুর মালিক তিনি। এখানেও সমগ্র মানবজাতির মূল উৎসকে বোঝানো হয়েছে।
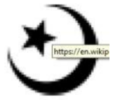 **চাঁদ-তারা**	**ইসলাম মতবাদ (মতান্তরে)**	চাঁদ-তারার ব্যবহার মূলত চান্দ্রমাসের উপর ইসলামের নিয়মাবদ্ধ ধর্মজীবনকে প্রতিফলিত করে, যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন-ধারণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আর নিয়মাবদ্ধ জীবনই শান্তি আনতে পারে। ১৮৪৪ সালের অটোমান সাম্রাজ্য থেকে ইসলামের প্রতীক হিসেবে চাঁদ-তারাকে ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন মসজিদে ইসলামের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৪০ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও এই প্রতীক গ্রহণ করে এবং ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রীয় মুসলিম জাতির প্রতীক হিসেবেও এই চাঁদ-তারাই ব্যবহৃত হয়েছে।
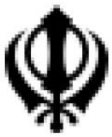 **খান্ডা**	**শিখ মতবাদ**	শিখ মতবাদে খান্ডা প্রতীক দ্বারা ঈশ্বরের একত্ব বোঝানো হয়েছে। যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

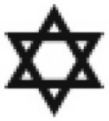 ‘ডেভিডের ষড়-তারকা’	**ইহুদী মতবাদ**	‘ডেভিডের ষড়-তারকা’ ১৭শ শতাব্দীতে ভিয়েনাতে প্রথম ইহুদীধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়। ইহুদী মতবাদের প্রতীক ‘তারকামধ্যের চাই’ দ্বারা শান্তি ও সম্প্রীতিকে বোঝানো হয়েছে, যা জীবন ও সৌভাগ্যের সংহতিকে প্রকাশ করেছে।
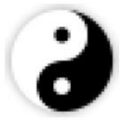 **ঈন ও ঈয়াং**	**তাও মতবাদ**	তাও মতবাদ চীনের একটি মতবাদ। এই মতবাদকে দেখাতে দুটি বিপরীত রং-এর ‘ঈন ও ঈয়াং’ প্রতীকে দুইটি বিপরীত সত্তার মিলনকে দেখায়, অর্থাৎ পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই শুভ ও অশুভ দুই-ই আছে। আবার এদুইয়ের উৎস একই। একটি বস্তু, অপরটি প্রাণ। একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। কিন্তু এই উভয় মিলেই শক্তির উদ্ভব। অর্থাৎ বিষয়ের মধ্যবর্তী সম-বিপরীত সত্তাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।
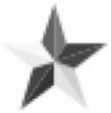 **পাঁচ রং তারকা**	**দ্রুজ মতবাদ**	দ্রুজ মতবাদ তাদের ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে সবুজ, লাল, হলুদ, নূল ও সাদা- এই পাঁচ রংয়ের তারকাকে ব্যবহার করে। এগুলো যথাক্রমে বিশ্বজনীন মন/বুদ্ধি, বিশ্বজনীন আত্মা, শব্দ বা স্পন্দন, সামগ্রিক কারণ ও সামগ্রিক ফলাফলকে বোঝায়।
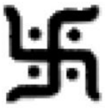 **স্বস্তিকা**	**হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ**	স্বস্তিকা চিহ্ন পবিত্রতা, শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক। যা ইউরেশিয়ার আর্যদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পরবর্তীতে এটি হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিভিন্ন আঙ্গিকে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি রোমান বাইজানটাইন ও খ্রীষ্টান চিত্রকর্মেও এ চিহ্ন দেখা যায়। ইউরোপেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পূর্ব পর্যন্ত আর্যদের মঙ্গলের ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে এ চিহ্নের বহুল প্রচলন ছিল, যদিও জার্মানীতে নাৎসীবাহিনী এই চিহ্ন জার্মানী জাতিগত চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে অনেক সহিংসতা করেছে।

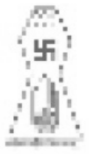 **স্বস্তিকা ও অহিংসা**	**জৈন মতবাদ**	১৯৭৪ সালে সমগ্র জৈন জাতি জৈন মতবাদের প্রতীক হিসেবে স্বস্তিকা ও তার নিচে হাতের সাথে অহিংসা লিখিত ধর্মচক্র চিহ্নিত প্রতীককে তাদের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্বস্তিকা চিহ্ন দ্বারা অস্তিত্বের চারটি স্তরকে বোঝানো হয়েছে: স্বর্গীয় স্তর, মনুষ্য স্তর, প্রাণী স্তর ও উদ্ভিদ স্তর। এ দ্বারা আত্মার চারটি বৈশিষ্ট্যকেও বোঝানো হয়ে থাকে: অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধারণা, অনন্ত সুখ ও অনন্ত শক্তি। স্বস্তিকার উপরের বিন্দুসমূহ সেই বিশুদ্ধ স্তর এবং তার ত্রিধারাকে বোঝায় যেটাকে স্বাধীনতা বা মুক্তির স্তরও বলা হয়ে থাকে। আর, অহিংস চিহ্ন দ্বারা নিরন্তর সংসারে অহিংসার চর্চার মাধ্যমে শান্তির পথকে বোঝানো হয়েছে।
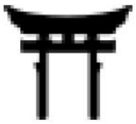 **টরী**	**সিন্টো মতবাদ**	সিন্টো মতবাদের প্রতীক হিসেবে ‘ঐতিহ্যবাহী জাপানী প্রবেশদ্বার’ বা ‘টরী’ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও সিন্টোরা এটিকে তাদের ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে না, বরং কেবল একটি ধর্মীয় প্রবেশদ্বারই মনে করে যা আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করায়, যেখানে আমরা মানবকল্যাণের ও শান্তির চর্চা করি।
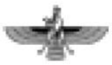 **উরুহার**	**জরথ্রুষ্ট মতবাদ**	পারস্যে গড়ে উঠেছিল বলে একে পারসী মতবাদও বলা হয়। ফরুহার এই ধর্মের প্রতীক যেখানে একজন দেবদূতকে দেখানো হয় যিনি একজন অভিভাবক দেবদূত। আর জরথ্রুষ্টবাদের মূলনীতিসমূহই এ প্রতীকের অর্থ বহন করে: শুভচিন্তা, শুভবচন ও শুভকর্ম।

---

৬৯. Baer, Hans A. (1998). William H. Swatos Jr (ed.). *"Symbols", in Encyclopedia of Religion and Society* (http://hirr.hartsem.edu/ency/Symbols.htm). Walnut Creek, CA, USA: Hartford Seminary, AltaMira Press. p. 504. ISBN 0761989560. Retrieved 31 October 2008.

৩.১০ বিভিন্ন মনীষীদের মতে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্মসহ প্রচলিত ধর্মমতের বিভিন্ন মতবাদ বা সম্প্রদায় প্রবক্তা ছাড়াও এমন কিছু সন্ত বা সাধুপুরুষ কিংবা মনীষী রয়েছেন যাদের দর্শন ও আচরণ মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে তুলে সম্প্রীতির পথে পরিচালিত করেছে। এ তালিকায় যেমন রয়েছেন কবি-সাহিত্যিক-গায়ক বা রাজনৈতিকগণ, তেমনি রয়েছেন সন্ত বা সাধুপুরুষ, ভক্তিমার্গ বা সুফীদর্শনের মানুষ। এ অংশে আমরা এরকম কতিপয় চরিত্রের সাথে পরিচিত হব, যেমনঃ ফকির লালন সাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লালন ফকির (সাঁই)[৭০, ৭১]

লালন ফকির বা লালন সাঁই ছিলেন একজন মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক বাউল সাধক। তার রচিত বাউল গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে বাউল গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাকে ‘বাউল সম্রাট’ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। তার গানের বাণী, সুর ও দর্শন পরবর্তী অনেক খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছে, তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অ্যালেন্স জিন্সবার্গ, কাঙাল হরিনাথ, মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ অন্যতম। আনুমানিক ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহনকারী এই মরমী সাধকের জন্মস্থান, পিতা-মাতা প্রভৃতি নিয়ে বহু মতানৈক্য থাকলেও তার জীবনে তার গুরু সিরাজ সাইয়ের ব্যাপক প্রভাব নিয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। তিনি যে কোন্ ধর্মমতের বা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন তা এখনও কেউ স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না। মূলতঃ তিনি তার গানের মধ্যে যে দর্শন তুলে ধরেছেন তা সিরাজ সাইয়েরই অসাম্প্রদয়িক দর্শন, যা একই সাথে অহিংস বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব ভক্তিবাদী সহজিয়া বা কর্তাভজা সম্প্রদায় কিংবা সুফীবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দর্শনের মূল কথা হল মনের মানুষের অন্বেষণ বা আত্মানুসন্ধান, যা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। তাই লালনের দর্শন সকল ধর্মের মূল দর্শনকেই সমর্থন করে। ধর্মীয় বিভেদ বিশেষতঃ জাতিগত বিভেদকে তিনি প্রচন্ড ঘৃণা করতেন।

---

[৭০] সুধীর চক্রবর্তী, *লালন(৩য় সংস্করণ)*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ০২

[৭১] আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ পৃ. ৩৫

এই মানবতাবাদী, শান্তিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক দর্শন তার প্রতিটি গানে ফুটে উঠেছে। নিচে তার কতিপয় উল্লেখ করা হল-[৭২, ৭৩]

"মানুষ ছাড়া খ্যাপা রে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।"

"এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানজাতি গোত্র নাহি রবে।"

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম না নজরে।"

"আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে
কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে আমার মনের ঘোর গেল না।"

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়।"

"আসবার কালে কি জাত ছিলে এসে তুমি কি জাত নিলে,
কি জাত হবে যাবার কালে সে কথা ভেবে বল না।"

"মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে"

"সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে, পাবিরে অমূল্যনিধি বর্তমানে।
ভজ মানুষের চরণদুটি নিত্য বস্তু হবে খাঁটি
মরিলে সব হবে মাটি ত্বরায় এই ভেদ লও জেনে।"

"সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকিতে দ্বীনের সাধন কেন জানলে না।"

"পাবে সামান্যে কি তার দেখা বেদে নাই যার রূপরেখা।"

"আপন ঘরের খবর লে না, অনায়াসে দেখতে পাবি কোনখানে সাইর বারামখানা।"

"নবী না চিনলে সে কি খোদার ভেদ পায়
চিনিতে বলেছেন খোদে সেই দয়াময়।"

---

৭২. শারমিন খান, *লালন গীতি সমগ্র(২য় সংস্করণ)*, বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ০১-০৪

৭৩. লালন সাঁইজি, *লালন সাঁইজির নির্বাচিত ভাবসঙ্গীত*, সাহিত্যকোষ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ০১-০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৭৪]

বিশ্বব্যাপী বুকে বাংলা সাহিত্যকে সব থেকে বেশি সমাদৃত করতে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত একমাত্র কবিও তিনিই। ১৮৬১ সালে কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্যবাহী ঠাকুরবাড়ির জমিদার পরিবারে তার জন্ম। বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু নতুন অঙ্গন সৃষ্টি করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটা অঙ্গনেই যিনি সফলভাবে বিচরণ করেছেন। কোন বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য না দিলেও সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারকৃত রূপ একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মে তার আস্থার প্রমান পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলিসহ তার বিভিন্ন কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় তিনি সেই এক অদ্বিতীয় অনাদি-অনন্ত-অসীমের গুণগান করেছেন বারংবার। নিজের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সেই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি বা প্রাকৃতিকভাবে আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি মনুষ্যত্বকেই মানুষের একমাত্র ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়-"স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম। কোন মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্যে সাধনা করতে হ'ত না।... সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় এবং অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি।" তথাকথিত ধর্মমতসমূহের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নামে যে সংকীর্ণতা বা বিদ্বেষ রয়েছে সেসব নিয়ে তিনি বলেছেন- "যে ধর্মের নামে বিদ্বেষ সঞ্চিত করে, ঈশ্বরের অর্ঘ্য থেকে সে হয় বঞ্চিত।" আবার বলেছেন- "ধর্ম যারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গন্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে।"

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।"
"হে ধর্মরাজ ধর্মবিকার নাশি, ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।"[৭৫]

---

[৭৪] কাজল বন্দোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ: ধর্মভাবনা*, মূর্ধণ্য, ঢাকা, ২০১২, (২য় সংস্করণ)

[৭৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পরিশেষ*, বিশ্বভারতী, ভারত, ১৯২৬, পৃ. ০১-০৪

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)

বিংশ শতকেও বিশ্বখ্যাত হিন্দু সংস্কারক মহাত্মা গান্ধীর মত মহান উদাহরণ রয়েছে যিনি অহিংস নীতির আলোকে ভাগবত গীতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সম্পূর্ণ এই নীতিতে ভিত্তি করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তাকে ভারতের জাতির জনক বলা হয়। ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর ভারতের পোরবন্দরে (বর্তমান গুজরাট) জন্মগ্রহনকারী গান্ধী কর্মজীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধী ছিলেন ইতিবাচকভাবে অহিংস ব্যাখ্যাকারী প্রথম ব্যক্তি এবং তা সামাজিক বিধি-নিষেধের বিবেচনায়।[৭৬]

তাঁর লেখা 'আমার ধর্ম'[৭৮] বইটিতে দেখা যায় যে তিনি হিন্দুধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে স্বীকার করলেও সকল ধর্মমতকেই তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং এ বিশ্বাস করেন যে সকল ধর্মই ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর মতে ধর্ম ছাড়া কোন মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। তবে নৈতিক আধারচ্যুত হলে আর আমরা ধর্মাশ্রয়ী থাকতে পারি না। ধর্ম জীবনের সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত থাকবে। তিনি তাঁর জীবনে ব্রহ্মচর্য পালনকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-সংযম করা যায় এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর ভাষায়-

> "We must ever fail to percieve Him through the sences because He is beyond them. We can feel Him if we will but withdraw ourselves from the senses."

মহাত্মা গান্ধী একজন শান্তিবাদী, যিনি তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্বারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি বলেছেন, 'আমার ধর্ম কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালবাসা এবং অহিংসা।...হ্যাঁ, আমি তাই (একজন হিন্দু)। এছাড়াও আমি একজন খ্রিস্টান, একজন মুসলিম, একজন বৌদ্ধ এবং একজন ইহুদী।' তিনি আরও বলেছেন, 'গীতার প্রতি নিষ্ঠাবান কোন লোক হিন্দু ও মুসলমান ভেদাভেদ করবে না। গীতাকে প্রতিপাদিত ভক্তি ও ধর্ম ও প্রেমের মার্গে মানুষকে ঘৃণার কোন জায়গা নেই।'(ইয়ং ইন্ডিয়া, সেপ্টেম্বর, ১৯২৭)

---

৭৬. *The Encyclopaedia Britannica,* 15th Edition, 1984.

৭৭. মহাত্মা গান্ধী, *আমার ধর্ম*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

কাজী নজরুল ইসলাম

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ১৮৯৯ সালে জন্ম কাজী নজরুল ইসলামের। অতি বাল্যবয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন বলে বিংশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা-সাহিত্য জগতে তার অবদান অনেক। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ধর্ম-দর্শন চর্চায় কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রভাব ছিল না, বরং সকল ধর্মের সার্বজনীন মূল্যের প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় আস্থা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠায় তার প্রবন্ধ, কবিতা ও গান কিংবা ভাষণ বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক অনন্য কবি যিনি একই সাথে ভক্তিগীতি (শ্যামাসঙ্গীত, কৃষ্ণভজন, রামগান প্রভৃতি) রচনা করেছেন, আবার ইসলামী সঙ্গীত (গজল-হামদ-নাত) রচনা করেছেন।

তার রচিত ইসলামী সঙ্গীতের বাণী একজন খাঁটি ইসলামী দার্শনিকের ন্যায় গভীর, আবার তার রচিত অন্যান্য ভক্তিগীতি বা শ্যামা সঙ্গীতের বাণীসমূহও এত গভীর যে নিঃসন্দেহে তিনি একজন হিন্দু দার্শনিক। প্রকৃতপক্ষে তিনি উপমহাদেশে প্রচলিত এই উভয় ধর্মকেই নিজের জীবনে ধারণ করেছেন। তার ভাষায়, ‘সুন্দরের ধ্যান, তর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহন করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেবিছ বলেই কবি।’ (প্রতিভাষণ:১৯২৯)[৭৮]

১৯৪১ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’-এর রজত জয়ন্তীতে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন- ‘আমি বিদ্রোহ করেছি ধর্মের নামে ভন্ডামি ও কুসংস্কারের বিরূদ্ধে। কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।’ তাঁর ‘হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধে অসাম্প্রদায়িক স্বচ্ছধারা স্পষ্ট হয়েছে। সাম্য-মানবতার কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলাম সর্বাধিক পরিচিত। তার বিভিন্ন কবিতায় তিনি বিভিন্নভাবে এসব তুলে ধরেছেন-

> ‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ,
> কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
> হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
> কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র।’[৭৯]

---

[৭৮] খিলখিল কাজী, *কাজী নজরুল ইসলামের বাছাইকৃত প্রবন্ধ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৩

[৭৯] কাজী নজরুল ইসলাম, *সর্বহারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭

‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমনি হিন্দু তাহার প্রাণ।’
‘হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা
এক বাগানে দুটি তরু দেবদারু আর কদম-চারা।’
‘মিথ্যা শুনিনি ভাই-
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনও মন্দির-কাবা নাই।’
‘গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।’
‘মানুষেরে ঘৃণা করি-
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!
‘পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!’[৮০]

ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায় কবি নজরুল ইসলাম তার চার পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মুহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ। এখানেও তিনি উভয় ধর্মের প্রাধান্য রেখেছেন, রেখেছেন তৎসম ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রণ।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষতঃ বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে প্রকৃত ইসলামকে অনেকাংশে বিকৃত করা হয়েছে, তৈরী হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। সে প্রসঙ্গে তিনি অকপটে তার অভিভাষণে বলেছেন ‘গোঁড়ামি ও কুসংস্কার’ অংশে বলেছেন- “মাওলানা মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের-জাতির-ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায় না। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই ‘মনে মনে শাহ ফরীদ, বগল মে ইট’।”[৮১] সার্বিকভাবে বলা যায় যে নজরুল-জীবন ও নজরুল-সৃষ্টি এ দুয়ের প্রাণ যে সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের সুতায় বাঁধা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না; একে বলা যায় নজরুলের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সাধনা, এই-ই নজরুল-দর্শন।

---

[৮০] কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭

[৮১] খিলখিল কাজী, *কাজী নজরুল ইসলামের বাছাইকৃত প্রবন্ধ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক জনদরদী রাজনৈতিক নেতা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের আদর্শে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবাদ ছিল মূখ্য বিষয়। তিনি জন্মগতভাবে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও তিনি সর্বদা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে সমগ্র বাঙালিকে নিয়ে চিন্তা কওে গেছেন। ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী ও সৌদী বাদশাহ ফয়সাল তাকে বাংলাদেশের নাম বদলে ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ করতে বলেন। তিনি উত্তরে বলেন, 'এটা সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ সবার দেশ। মুসলমান, অমুসলমান সবারই দেশ।'

তিনি সৌদী বাদশাহকে আরও বলেন, 'সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহ তো শুধু আল-মুসলিমিন না, তিনি রাব্বুল আল-আমিন। সবার স্রষ্টা। ক্ষমা করবেন, আপনার দেশের নাম তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি আরাবিয়া' নয়। বরং মরহুম বাদশাহ ইবনে সৌদের নামে 'কিংডম অব সৌদি আরাবিয়া'। কই আমরা কেউ তো এ নামে আপত্তি করিনি।'[৮২]

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সি অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষনে[৮৩] বঙ্গবন্ধু বলেন- 'যে মানুষকে ভালবাসে সে সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যারা এখানে মুসলমান আছেন তারা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামিন। রাব্বুল মুসলিমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক সব মানুষ তার কাছে সমান।...যারা বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও।...আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনো দিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না করতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেওয়া হবে না।'

---

[৮২] হাসান মোরশেদ, *বঙ্গবন্ধুর নীতিনৈতিকতা*, চৈতন্য, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৯, পৃ.১১১

[৮৩] নূহ-উল-আলম লেনিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৫

তিনি আরও সংযুক্ত করেন, ‘পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।’

এছাড়াও বিভিন্ন মনীষীদের রচনায় মানবতাবাদের কথা, বিশ্বশান্তির কথা, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা ফুটে ওঠে।[৮৪] যেমনঃ

ক) বাংলা সাহিত্যের একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রাবন্ধিক আবুল ফজল বলেন- “ধর্ম আর ধর্মবিশ্বাসের বেলায় মানুষ এত বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে যে সে বিনা দ্বিধায় মনে করে যে, তার নিজের ধর্ম আর তার ধর্মমতই অভ্রান্ত।”

খ) উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ বলেন, “মানুষের জন্য যাহা কল্যাণকর তাহাই ধর্ম। যে ধর্ম পালন করিতে গিয়া মানুষের অকল্যাণ করিতে হয়, তাহা ধর্মের কুসংস্কার মাত্র। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।”

গ) মধ্যযুগের বাঙালি কবি বড়ু চন্ডীদাস বলে গেছেন, “শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”

ঘ) বাংলা সাহিত্যে ছন্দের জাদুকর নামে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার ‘অভ্র আবীর’ কাব্যগ্রন্থে ‘জাতির পাঁতি’ কবিতায় বলেছেন, “জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি; একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের সাথী।”

ঙ) শিবদাস বন্দোপাধ্যায়ের লেখা মানবতার একটি গান ভুপেন হাজারিকা গেয়েছেন, “মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ কি পেতে পারে না।”

---

[৮৪] http://bani.com.bd

৩.১১ বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

শান্তিবাদী ওয়েবসাইট ‘পিস ইনসাইট’ এর মতে বিশ্বব্যাপী ২২২৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা কোনও না কোনোভাবে শান্তিস্থাপনের সাথে জড়িত। তাদের মতে বাংলাদেশে এই সংখ্যা ৫৩। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই আন্তর্জাতিক বা স্থানীয়ভাবে কাজ করে চলেছে । তার মধ্যে কয়েকটি সংগঠন নিয়ে আলোকপাত করা হল:

১. **জাতিসংঘ (UN)**- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে এরকম প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর গড়ে ওঠা জাতিসংঘ বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের প্রত্যেকটা স্বাধীন দেশই এর সদস্য। বর্তমান সদস্যদেশ সংখ্যা ১৯৩। এটিও একটি সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে তৈরী হয় । জাতিসংঘ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বিশ্বের প্রত্যেক দেশ একত্রিত হতে পারে, তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে ও তার সমাধান খুঁজতে পারে। বছরের পর বছর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রীতি ও অহিংসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সালে জর্ডানের রাজা ২য় আব্দুল্লাহ ফেব্রুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহকে ‘বিশ্ব আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ’ হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং প্রতিবছর পালন হয়ে থাকে।[৮৫]

২. ইউনাইটেড রিলিজিয়ন ইনিশিয়েটিভ (URI) - আমেরিকাভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিমূলক সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। সকল বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে পার্থক্যহীন সম্প্রদায় তৈরী এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি জুড়ে মানুষকে শান্তি ও ন্যায়বিচারের সেবায় সংযুক্ত করার নিমিত্তে ২০০০ সালের ২৬শে জুন একটি সনদে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সংগঠনটি। এটি বিশ্বব্যাপী একটি তৃণমূল আন্তঃধর্মীয় নেটওয়ার্ক যা বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো টিকিয়ে রাখা, বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংঘাতের অহিংস সমাধান

---

[৮৫] http://un.org

এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিচারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে বিশ্বের ১১৩টি দেশে এ সংগঠনের ১০৭৪টি সহযোগিতা বৃত্ত (একাত্ম সহযোগী সংগঠন) কাজ করছে। বাংলাদেশেও এ সংগঠনের ৩৭টি সহযোগিতা বৃত্ত রয়েছে।[৮৬]

৩. রিলিজিয়নস ফর পিস (RFP) - ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত রিলিজিয়নস ফর পিস বা শান্তির জন্য ধর্ম এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য সকল ধর্ম কাজ করে থাকে। বিশ্বের যেকোন আলোচিত ঘটনায় বহুধর্মীয় মতামতকে কার্যকরভাবে প্রাধান্য দিতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটি বিশ্বাস করে আকাঙ্খিত লক্ষ্য ও উত্থিত সমস্যার সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভব যখন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে কাজ করে। শান্তিপূর্ণ, সঠিক ও অন্তর্মূখী সমাজ, লিঙ্গ-সাম্য, পরিবেশ, চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, আন্তঃধর্মীয় পড়াশুনা এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব- এ ছয়টি বিষয়কে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিশ্বে প্রচলিত প্রায় ১০০টিরও বেশী ধর্মীয় নেতৃত্ব এর সাথে যুক্ত। জাপান, কেনিয়া, পেরু, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ৫টি আন্তর্জাতিক অফিসসহ গোটা পৃথিবীতে ৬টি এলাকায় বাংলাদেশসহ মোট ৯০টি দেশে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৮৭]

৪. ইউনিভার্সাল পিস ফাউন্ডেশন (UFP) - ইউনিভার্সাল পিস ফাউন্ডেশন বা বিশ্বশান্তি ফাউন্ডেশন শ্রদ্ধেয় সুং মিয়ুং মুন ও তার স্ত্রী ড. হ্যাক জা হ্যান মুন কর্তৃক ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'-সহ অন্যান্য নীতিমালাকে সমর্থন করে। তাদের নেতৃত্বে শান্তিস্থাপনে জাতিসংঘ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্বে প্রায় ৫০০০০ এর অধিক ব্যক্তিকে শান্তিদূত করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বে ১৫৯টি দেশে এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধি রয়েছে ও কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে।[৮৮]

৫. আন্তঃজাতিগত ও ধর্মীয় সংহতি চক্র (IRCCs) - ২০০৩ সালে সিংগাপুরের সকল ধর্মীয় ও জাতিগত বিশ্বাসের প্রধানগণ একত্রিত হয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এ প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে। বিচ্ছিন্নতা নয় বরং অবদানের জন্য বিভিন্নতা ও সকলের

---

[৮৬] http://uri.org

[৮৭] http://www.rfp.org

[৮৮] http://www.ufp.org

জন্য বৈচিত্র্যময় ভবিষ্যত- এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মের মানুষকে তারা একত্রিত করে কাজ করে চলেছে।[৮৯]

৬. আইরিনিস শান্তি ডেটাবেজ (irenees.net) - আইরিনিস শান্তি ডেটাবেজ মূলত একটি তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট যার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের বিনিময়কে বর্ধিত করা ও শান্তির শিল্পিত রূপ কিভাবে তৈরী হয় তা জানা। ওয়েবসাইটটির বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'চার্লস লিওপোর্ড মায়ার ফাউন্ডেশন ফর দা প্রোগ্রেস অব হিউম্যানকাইন্ড' (FPH)। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ফাউন্ডেশন এর শান্তিপ্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এই ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করে, যেখানে শান্তিস্থাপন বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী লেখাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আইরিনিস এর আহ্বান হল নিবিড়ভাবে শান্তিকে বোঝা এবং তার জন্য যা প্রয়োজন তা করা। আইরিনিস শান্তি ডেটাবেজ একটি অন্যতম সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার যেখানে যেকোনো বিষয়কেই যুক্তিসম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়। শান্তির প্রতি এর প্রতিপাদ্যই হল শান্তি কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয় বরং এটি সাম্য, সামাজিক ন্যায় ও উন্নতির অন্বেষণের একটি পদ্ধতিও বটে।[৯০]

৭. ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (IFI) - ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া বা ভারতীয় আন্তঃধর্মীয় ফাউন্ডেশন বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দর্শন ধারণ করে। ২০১০ সালে ভারতের দিল্লীতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মদন গোপাল ভার্মার গড়ে তোলা এই ফাউন্ডেশনটির সকল কার্যক্রম এর মূল লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টিকে মূখ্য করে চলে। এর কার্যক্রমে রয়েছে আলোচনা সভা, সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক, গবেষণা, প্রকাশনা, বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থযাত্রা প্রভৃতি। সকল কার্যক্রমেই বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। 'চলো এক লক্ষ্যে একত্রে কাজ করি; এক উদ্দেশ্যে কথা বলি; আমাদের মনকে একত্রিত করি; বিভিন্ন দিক থেকে ভাল চিন্তা আসুক; বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করি; সেই প্রকৃত সাধু যে সবাইকে স্বাভাবিক মনে করে; সব দিকেই আমার বন্ধু হোক।' এসবই এ প্রতিষ্ঠানের স্লোগান।[৯১]

---

[৮৯] http://ircc.sg

[৯০] http://irenees.net

[৯১] http://interfaithfoundationindia.com

৮. ইন্টারফেইথ কোয়ালিশন ফর পিস (ICP) - ইন্টারফেইথ কোয়ালিশন ফর পিস বা আন্তঃধর্মীয় শান্তি জোটও ২০০৬ সালে ভারতে দিল্লীতে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য একটি সকল বিশ্বাসের মানুষকে নিয়ে ভালোবাসা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সাধারণ ভাগ্যে পৌঁছানো। যেখানে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও বিশ্বাসই শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও সহানুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সেখানে এসকল বিশ্বাসের অনুসারীদের সেই সাধারণ ভাগ্যে পৌঁছানোটাই গুরুত্বপূর্ণ। এলক্ষ্য পূরণে তারা এক ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করে, সকল মতের ও তাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের অধিকারকে তুলে ধরে, সাম্য-ন্যায়-শান্তি-পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটায় এবং সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে সম্প্রসারিত করার ভিতর দিয়ে ভারতবাসী এমনকি গোটা বিশ্বের সকল গোষ্ঠী ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে থাকে।[৯২]

৯. হিউম্যান ফ্রেন্ডস অরগাইনেশন (HFO) - হিউম্যান ফ্রেন্ডস অরগানাইজেশন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১৮নং ধারা অনুসারে ধর্মীয় স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে। ২০০৩ সালে পাকিস্তানের লাহোরে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় স্বাধীনতার উন্নতি ঘটানো, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সমঝোতা, সহিষ্ণুতা, সাম্য এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা।[৯৩]

১০. দি ব্যাঙ্গালোর ইনিশিয়েটিভ ফর রিলিজিয়াস ডায়ালগ (BIRD) - দি ব্যাঙ্গালোর ইনিশিয়েটিভ ফর রিলিজিয়াস ডায়ালগ বা ধর্মীয় আলোচনার জন্য ব্যাঙ্গালোর প্রচেষ্টা ভারতের ব্যাঙ্গালোরে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান। এটি বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে দুরত্ব কমানোর লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। ২০০১ সালে পি এন বেঞ্জামিন এবং ধর্মরাম বিদ্যাক্ষেত্রের বিশ্বধর্ম চর্চাকেন্দ্রের পরিচালক ফাদার ম্যাথিউ চন্দ্রকুনেল কর্তৃক এই শুভ উদ্যোগের সূত্রপাত হয়।[৯৪]

---

৯২. http://www.icpindia.org

৯৩. http://hfopk.org

৯৪. http://birdindia.org

৩.১২ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বা মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত সকল ধর্মই কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মভিত্তিক মতবাদ ছাড়াও অন্যান্য নাস্তিক মতবাদ বা কেবল বিজ্ঞানচর্চাভিত্তিক গোষ্ঠীসমূহও মানবকল্যাণের নিমিত্তে অর্থাৎ শান্তি ও সম্প্রীতির নিমিত্তেই কাজ করে চলেছে। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সাধু-সন্ত, সুফী সাধক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, দার্শনিকসহ বিবিধ রকমের মনীষীগণও বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান করেছেন ও করে চলেছেন। আর এ বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংগঠন, আয়োজন হচ্ছে সভা-সেমিনারের, চলছে গবেষণা। তবুও বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষিতই থেকে যাচ্ছে সবসময়।

৪র্থ অধ্যায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শন

৪.১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

> "অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে / নুয়াইয়ো শির কহিও কথা
> কূল দিতে তারে সেধ প্রাণপনে / লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যাথা।"[১]

শিশুর অন্নপ্রাশনের দিন এমন ছন্দে-ছড়ায় আশীর্বাদ করলেন বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম সাধ্বী মহীয়সী মাতা মনোমোহিনী দেবী। আর এগুলোর আদ্যাক্ষর নিয়ে শিশুর নাম রাখলেন 'অ-নু-কূ-ল = অনুকূল'। শিশুটিও তাঁর শৈশব থেকে আমৃত্যু এ বাণীকেই মেনে নিল তাঁর জীবনের মটো হিসেবে। ১৮৮৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র) শুক্রবার প্রাতে শুক্লপক্ষে শুভ তালনবমী তিথিতে অধুনা বাংলাদেশের পাবনা শহরের অদূরে হিমাইতপুরের নির্জন পল্লীতে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ও মনোমোহিনী দেবীর কোল আলো করে তাঁর পূণ্য আবির্ভাব।[২] অলৌকিকভাবে বার মাসে জন্মেছিলেন, তাও আবার সবার অগোচরে। জন্মের পূর্বেই মনোমোহিনীদেবীকে এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মহাপুরুষের জননী হতে চলেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বভাবতই অনুকূল। সবার কাছে প্রিয় সে। তাই বোধ হয় খেলার সাথীরা তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকত। মাতৃভক্ত অনুকূল কোনদিনও মায়ের অবাধ্য হননি। একটিবারের জন্যেও না। তাই তাঁর বলা- মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত। পড়াশোনার জীবনের অবর্ণনীয় কষ্ট করেছেন। তবুও কোনও দিন কাউকে ফেরাননি খালি হাতে। নিজের এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফি গরীব বন্ধুকে দিয়েছেন, নিজে পরীক্ষা দেননি। শুরচ করলেন ডাক্তারী জীবন। কোনদিন কারও নিকট থেকে চিকিৎসা বাবদ কোন ফি নিতেন না। অসহায় রোগীদের ঔষধ কেনার টাকাটাও পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। ডাক্তারীতে তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল, 'ধন্বন্তরী' উপাধীও পেলেন। এই ডাক্তারী থেকেই তিনি উপলব্ধি করলেন জীবনের নতুন এক দর্শন। তাঁর ডাক্তারীতে মানুষের দেহের রোগ সারে বটে, মনের রোগ তো সারে না।

---

১. ব্রজগোপাল দত্তরায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (১ম খণ্ড)*, তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২, পৃ. ২১

২. ঐ. ঐ., পৃ. ১৫

মানুষের মনের মধ্যে যে অসৎ প্রবৃত্তি, অশুভ চিন্তা এবং দুর্নীতিপ্রবণতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে, এর কি কোন অবসান নেই। এলাকার যত চোর-গুন্ডা-বদমায়েশ, সব যোগ দিল তাঁর কীর্ত্তনের দলে। মায়ের কাছে নালিশ আসে যে অনুকূল কুসঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের সহজ উত্তর- 'মা, দেখিস্ কিশোরীর পাল্লা ভারী হলে আমি কিশোরীর দিকে ঝুঁকবো, আর আমার পাল্লা ভারী হলে কিশোরী আমার দিকে ঝুঁকবে।'

কীর্ত্তনের ভিতর ভাবসমাধি হত অনুকূলচন্দ্রের। শরীরে প্রাণ থাকত না, অথচ অনর্গল বাংলা, ইংরেজী, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনেক ঐশী বাণী বলতেন। যার ৭২ দিবসের বাণী সংকলিত আছে 'পুণ্যপুঁথি'তে। সবাই বুঝতে শুরু করলেন যে ইনি স্বাভাবিক কেউ নন। অনুকূলচন্দ্র ক্রমেই শ্রীশ্রীঠাকুর নামে পরিচিত হতে লাগলেন। দেখালেন ধর্মের এক নতুন দিক, যা শাশ্বত, সাত্বত ও চিরন্তন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, যৌক্তিক ও মানবহিতৈষী রূপটি ছিল, যেন তার পুনরুত্থান হল। তিনি বললেন-'ধর্ম হল বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞান।'[৩] ছন্দে-ছড়ায় বললেন-' বাঁচতে নরের যা যা লাগে, তাই নিয়েই তো ধর্ম জাগে।' কিংবা, 'ধর্মে জীবন বাঁচে-বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে।'[৪] মাত্র বাইশ বছর বয়সে একরাত্রিতে লেখা ছোট পুস্তিকা 'সত্যানুসরণে' তিনি বললেন-'ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই। মত বহু হতে পাওে, এমন-কি যত মানুষ তত মত হতে পারে , কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও-সবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের- একটাকেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব।'[৫] তাঁর মতে-'যত মত, তত একই পথ।' এ যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতির নতুন বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ সব মতই সাধনার সত্য পথ এবং তা একই পথ।

১৯২৫ সালে গড়ে তুললেন মানুষ গড়ার কারখানা নামে খ্যাত সংগঠন- 'সৎসঙ্গ'[৬]। অনুকূল হোসিয়ারী, ষ্টীম লন্ড্রী, বিশ্ব বিজ্ঞান কেন্দ্র, কলাভবন, কেমিক্যাল ওয়ার্কস, রঙ্গমঞ্চ ও সভাগৃহ, তপোবন বিদ্যালয়, পাবলিশিং হাউস, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, কুটির শিল্প, দাতব্য চিকিৎসালয়,

---

[৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭, পৃ.৪৭

[৫] ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ২৭৬

[৬] ঐ. ঐ., *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ১৩

ডাকঘর ও ব্যাংক, ফিলানথ্রপীসহ বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ শুরু হল হিমাইতপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়। মানুষের কোলাহল বাড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের সাথে বিখ্যাত জনেরাও তাঁর সংস্পর্শে এল। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পন্ডিত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, নেতাজী সুভাষ বসুর পিতা-মাতা (শ্রীজানকী নাথ বসু ও শ্রীমতি প্রভাবতী দেবী) প্রমুখ তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষ বোস, শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন।[৭] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সত্যানুসরণ' ও 'নানা প্রসঙ্গে(৪র্থ খন্ড)' পড়ে বিস্মিত হয়েছেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সান্নিধ্যে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর সাহিত্যিকের মূল দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে বলেছিলেন-'সমাজ পঁচে গিয়েছে সত্য কিন্তু তাই বলে আমরা যদি দুঃখের চিত্র, হতাশার ছবি, বিকৃত মনস্তত্ত্বেও অভিব্যক্তি তুলে ধরি তবে কারো কোন উপকারই আমরা করতে পারি না। সাহিত্যিকের দায়িত্ব গঠনমূলক চিত্র তুলে ধরা, যার ফলে তারা হতাশার মধ্যেও আলো ও দুঃখের মধ্যেও পায় শান্তির ইঙ্গিত। বাস্তববাদের সঙ্গে যদি আদর্শবাদের সমন্বয় না থাকে তবে কোন সুফলই হবে না। আদর্শ চরিত্র রূপায়ন করলে তা থেকে মানুষ পাবে উদ্দীপনা; বাস্তব অসুবিধা এবং ভাগ্যবিপর্যয়কে প্রতিহত করে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। সাহিত্যিক যদি পাঠকের মনে ভরসার সৃষ্টি করতে না পারে, কল্যাণের ইঙ্গিত দিতে না পারে তবে সে সাহিত্যের মূল্য কতটুকু?'[৮] আশ্রম থেকে ফিরে অনুপ্রাণিত শরৎচন্দ্র লিখলেন তার প্রথম মিলনাত্মক উপন্যাস 'বিপ্রদাস'। আসলেন কথা সাহিত্যিক বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ। কবি বন্দে আলী মিয়া তো তাঁর শিষ্য এবং আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'সৎসঙ্গী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত। জাদুসম্রাট পি সি সরকার ও ডা. বিধান চন্দ্র রায়ও তাঁর অনুগত ছিলেন। খলিলুর রহমান, এডমন্ড যোশেপ স্পেন্সার, রে আর্চার হাউজারম্যান, ইউজিন এক্সম্যানসহ বিভিন্ন অন্যমতাবলম্বীও তাকে ধরে প্রকৃত মুসলমান কিংবা প্রকৃত খৃষ্টান হওয়ার দিশা পেয়েছেন।[৯] শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মান্তরিতকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বরং যার যার পথে তাকে অগ্রসর করানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

---

[৭] ব্রজগোপাল দত্তরায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (২য় খণ্ড)*, তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২, পৃ. ৩০

[৮] ঐ. ঐ., পৃ. ২৫৬

[৯] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)। পৃ. ১৩

তাই হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও এন সি চ্যাটার্জ্জী তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের বলেন-‘দেশের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান ভারসাম্য তৈরী করুন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি গঠন করুন। যদি দেশকে বাঁচাতে চান।’[১০] তাঁর ধারণাই সঠিক হল। শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরী হল সবখানে। তিনি হিমাইতপুরে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন।

এই সাজানো সংসার নিমেষেই ত্যাগ করে হঠাৎ ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রওনা হলেন সাওতাঁল পরগনার (বর্তমান ভারতের ঝাড়খন্ড) দেওঘরে।[১১] সৎসঙ্গ এক নতুন মোড় নিল। দেওঘর হয়ে উঠল সৎসঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হল, সেই বিষবাষ্প সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই। তাঁর স্বপ্নের বাংলা ভেঙ্গে গেল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার হিমাইতপুরের যাবতীয় সম্পদ অধিগ্রহন করে এবং ১৯৫৯ সালে সেখানে বাংলাদেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।[১২]

দেওঘরে নতুন করে আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সবসময় বলতেন -‘ব্যয় আমার ভালবাসা, আর আয় আমার মানুষ।’ আবারও তাঁকে ঘিরে মানুষের মধুচক্র শুরু হল দেওঘরের বুকে। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ থেকে বের হতে থাকে তাঁর বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের বই। বিজ্ঞান, দর্শন, আদর্শ, নীতি, সুবিবাহ ও জনন নীতি, পরিবার, সমাজনীতি, রাজনীতিসহ তাঁর সাহিত্য সম্ভার সুবিশাল। সংক্ষেপে বললে তাঁর পদ্য বা ছড়াবাণীর সংখ্যা ৮৭৪৯ টি, গদ্যবাণীর সংখ্যা ১১,১৬৪ টি, চিঠি সাহিত্য ১৮০ টি, ইংরেজী বাণী ২৭৫৮ টি এবং আলোচনামূলক প্রশ্নোত্তর সমৃদ্ধ বই (৭টি বই মোট ৪০ খন্ডে)।[১৩]

এছাড়া তিনি বেশ কিছু গান এবং ‘দেবযানী’ নামে একটি নাটকও রচনা করেন। এর প্রায় সমগ্র গ্রন্থই অনুলিখিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে চলার সাথী, পথের কড়ি, সম্বিতী, শাশ্বতী, আদর্শ বিনায়ক, আর্য্য প্রতিমোক্ষ, বিজ্ঞান বিভূতি, সমাজ সন্দীপনা, বিধান বিনায়ক, দর্শন বিধায়না,

---

[১০] ব্রজগোপাল দত্তরায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (২য় খণ্ড)*, তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২, পৃ. ৩০

[১১] রে আর্চার হাউজারম্যান, *ওশান ইন এটি কাপ*, সৎসঙ্গ চার্চ, কলকাতা, ২০১৬ । পৃ. ৩

[১২] *বাংলাপিডিয়া-বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ২০১২, http://bn.banglapedia.org/index.php?title= মানসিক _হাসপাতাল

[১৩] ড. দূর্গাশঙ্কর চট্টোপধ্যায়, *শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী সাহিত্য*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)। পৃ. ১৩

নারীর নীতি, নারীর পথে, ইসলাম প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে, নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, চর্য্যাসুক্ত, অনুশ্রুতি, তাঁর চিঠি, The Messege, Magna Dicta উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া তার বিভিন্ন দিক নিয়ে অন্য লেখকদের লেখা প্রায় অর্ধশতাধিক বই বিদ্যমান। গড়ে ওঠে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই কর্মযজ্ঞ চলছে বিশাল এলাকাজুড়ে যা 'সৎসঙ্গ নগর' নামে সুপরিচিত। এখানেই ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারীর (বাংলা ১৩৭৬ সালের ১২ই মাঘ) ব্রাহ্মমুহুর্তে সেই একই শুক্লানবমী তিথিতে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।[১৪] বাংলাদেশে শতাধিক এবং ভারত, নেপাল, মায়ানমার, আমেরিকা, আরব আমিরাত, ব্রিটেনসহ পৃথিবীর প্রায় ত্রিশটি দেশে প্রায় সহস্রাধিক মন্দির ও সৎসঙ্গ কেন্দ্র রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি সবার একাত্মতায় প্রায় ১২ কোটি মানুষ এখন সৎসঙ্গের আদর্শের অনুসারী। যদিও শ্রীশ্রীঠাকুরের শান্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয়, ভাইব্রোমিটার, গঙ্গা-দারোয়া প্রকল্প, দাতব্য হাসপাতাল, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশসহ অনেক স্বপ্ন আমরা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বিজ্ঞান কেন্দ্র, মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনেলজি, সৎসঙ্গ প্রেস, সৎসঙ্গ হোসিয়ারী, সৎসঙ্গ ব্যাংক (সুদ ছাড়া) প্রভৃতি অনেক কিছুই ধরে রাখতে পারিনি। তবুও তাঁকে নিয়ে চলছে গবেষণা। গবেষণাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাদর্শন, সাহিত্যচিন্তা, জীবনবাদী ছড়াসাহিত্য, সমাজচিন্তাসহ বিভিন্ন দিকের উপর ইতোমধ্যে অনেকেই গবেষণা করেছেন। কিন্তু এখনো তাকে নিয়ে গবেষণার প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে, বিশেষতঃ সর্বমত-সমন্বয়ের যে জীবনবাদী ও যুগোপযোগী আদর্শ তিনি জন্য রেখে গেছেন, তা প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়িত করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একায়িত হয়ে ওঠা সম্ভবপর। বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর এই সার্বজনীন, সর্ব্বপরিপূরণী, মানবতাবাদী ও সমন্বয়ী অথচ বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাদর্শ হতে পারে বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সমস্যাসঙ্কুল অস্থিতিশীল মানবজাতির জন্য এক বিস্ময়কর সমাধানী পথনির্দেশ।

---

[১৪] পরেশ ভোরা, *মহাজীবন (অখণ্ড)*, তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২, পৃ. ৩৩২

৪.২ পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মদর্শন

‘ধর্মো ধারয়তে সর্বম্ অস্তিবৃদ্ধিপ্রসাধনে
যেনাত্মনস্তথান্যেষাং বর্দ্ধনং প্রীতিতর্পণে।’[১৫]

সংস্কৃতে এভাবে ধর্মের সংজ্ঞায়ন করলেন পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। অর্থাৎ যা’ এই জগতের বাঁচা-বাড়ার কল্পে অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্বের স্থিতি ও অসীম প্রগতির লক্ষ্যে সবকিছুকে ধারণ ক’রে আছে তাই ধর্ম। সত্যানুসরণে বলেছেন-‘যা’র উপর যা’ কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ।’[১৬] এখানে বোঝাতে চাইছেন যে, ধর্ম হচ্ছে সেই ভিত্তি যার উপর এই মহাবিশ্বের যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে আর এর এই মরকোচ যিনি জানেন তিনিই পরমপুরুষ। আবার অন্যত্র বলেছেন- ‘সত্তা সচ্চিদানন্দময়, অসৎ-নিরোধী স্বতঃই, সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা’ তা’ই ধর্ম; ধর্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে...’[১৭]। এখানে তিনি ধর্ম বলতে বস্তুর সাত্ত্বত যে ধর্ম সেই সত্তাকেই ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবী সমস্ত সত্তাই সবসময় সচ্চিদানন্দময় ও অসৎ-নিরোধী থাকতে চায়। প্রত্যেক সত্তার মধ্যে সে জীবই হোক আর জড়ই হোক, সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা, চিৎ অর্থাৎ সাড়াপ্রবন থাকা এবং আনন্দ অর্থাৎ বর্দ্ধনশীলতা এই তিনটি মৌলিক গুণ রয়েছে। আবার প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তা বিদ্যমান, আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তো বটেই। আর তাই, এই সত্তা সবসময় অসৎ-নিরোধীও বটে অর্থাৎ তার এই অস্তিত্বের সাথে যেসব বিরোধ উপস্থিত হয়, সামর্থ্যানুপাতিক ও সময়ানুপাতিক হারে তার উপযুক্ত নিরোধও করে থাকে সে। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, আর্য্য-দ্রাবিড়, বাঙালি-পাঞ্জাবি, নর্ডিক-নিগ্রো, সমতল-পাহাড়ী কিংবা কোন প্রকারের ভেদ নেই। সত্তার ধর্ম সবারই এক। সবাই বাঁচতে চায় এবং বাড়তে চায় অর্থাৎ ক্রমশঃ উন্নতি চায়। এযে ধর্মের শাশ্বত রূপ। এধর্ম হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কিংবা অন্য সবার এক। তিনি আরও স্পষ্ট করলেন-‘হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল। বরং ও-সবগুলি মত।’[১৮]

---

১৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. জ

১৬. ঐ. ঐ., *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)। পৃ. ২৭

১৭. ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. *ঞ*

১৮. ঐ. ঐ., *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)। পৃ. ১৩

অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মমতসমূহকে তিনি একক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। বরং ওগুলো একই ধর্মের ভিন্ন মত ছাড়া আর কিছুই নয়। যার প্রত্যেকটি মতই সত্তার এই চিরন্তন বাঁচা-বাড়াকে সমুন্নত রাখতে প্রয়াসী হয়েছে। তাই এসব মতবাদের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছু ভিন্ন প্রকাশ থাকলেও বাঁচা-বাড়ার মূল লওয়াজিমা সবখানে একই।

আর এখানেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মচেতনার এক বাস্তবধর্মী রূপ প্রতিফলিত হয়। তথাকথিত আচারধর্মী ধর্মচর্চার বাইরে এসে ধর্মের এক বাস্তবসমত রূপকে যিনি ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা আস্তিক তো বটেই, তথাকথিত নাস্তিকদের বা বস্তুবাদীদের মতকেও একইসূত্রে গেঁথে ফেলে। যে তার নিজের অস্তিত্বকে বা জীবনকে ভালবাসে সেই তো আস্তিক, সে আদর্শ হিসেবে কাউকে স্বীকার না করুক অস্তিত্বকে আর অস্বীকার করতে পারেনা। আর নাস্তিক শব্দের ধাতুগত রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, যা অসম্ভব। আর এই অস্তিত্বকে পালন-পোষণ করার জন্য যা' যা' প্রয়োজন তাই ধর্ম। তাঁর ভাষায়-

‘ঈশ্বরে তুই নাই বা মানিস্ অস্তিত্বকে বুঝিস তো?
পালন-পোষণ অস্তিত্বে গড়া ধর্ম বলে তাকেই তো।’[১৯]

আবার শুধু ভাবালুতাপূর্ণ ধর্মপালন আছে, অথচ আমার ও আমার পারিপার্শ্বিকের কল্যাণ হচ্ছে না, তাও অসম্ভব। তিনি বললেন-‘ধর্মের একটা নিশানা আছে- পূজা-আচ্চা করি, ভগবানকে ভালবাসি, অথচ আমার দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা বাড়ছে না, সপারিপার্শ্বিক আমি উচ্ছল হয়ে উঠছি না- এতে বুঝতে হবে, আমার চলার গণ্ডগোল আছে। কেউ ঐশ্বর্য্য চাক্ বা না চাক্- ইষ্টপ্রাণ (ধর্মপ্রাণ) হয়ে চলার পথে ঐশ্বর্য্য তাকে আলিঙ্গন করবেই। সেবা-সম্ভূত প্রকৃত ঐশ্বর্য্য হলো একটা নিদর্শন যে সে ধর্মকে যথাযথ আচরণ করছে।’[২০] অর্থাৎ আমি যত ধর্মই করি না কেন যদি আমার উন্নতি না হয় সব দিক দিয়ে তাহলে আমার ধর্মপালন বৃথা। আবার যেসব ঐশ্বর্য্য আমার সেবা করবে তা কোন মতাদর্শ বা মহাপুরুষকে ভাঙিয়ে কিংবা মানুষকে ঠকিয়ে বা বোকা বানিয়ে নয়, বরং আমার যোগ্যতা বর্দ্ধিত করে সেই যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে উপার্জ্জিত অর্জন, তা আমি চাই বা না চাই। নতুবা আমার ধর্মপালন হয়নি।

---

১৯. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ২৪

২০. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ.৩৮

সাধারণতঃ ধর্মপালন বলতে আমরা দুর্বলচিত্ত মানুষের কিছু অপারগ অবলম্বনকেই বুঝে থাকি। ধর্মের সাথে অনেকে ভয়ের সম্পর্ক দেখান। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন প্রকৃতপক্ষে ধর্মরাজ্যে ঢুকতে গেলে এই দুর্বলতাকেই আগে পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁর কথায়-'সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সাহসী হতে হবে। বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ঐ দুর্বলতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার; ঐ রক্তশোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক vampire-কে। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে অকপট হও, সাহসী হও। তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক-ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর যতদিন তোমার মন-মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না।'[২১] এসম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন-'বাঁচাবাড়ার অন্তরায় যা, তাকে নিকেশ করে, পরিবার-পরিবেশসহ জীবনের পথে, বাড়তির পথে এগিয়ে যাওয়াই ধর্ম। নির্বীর্য্যতা ধর্ম নয়, জীবনের তপস্যাই হলো অন্তরায়কে অতিক্রম করে অমৃতের পথে এগিয়ে চলা। তাই ধর্মের সঙ্গে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, স্বার্থান্ধতা, রোগ, ব্যাধি, অসাফল্য, আলস্য, দুর্বলতা ও প্রবৃত্তি-অভিভূতির কোন সঙ্গতি নেইকো।'[২২] অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত মানুষের ধর্মজগতে কোন স্থান নেই। আর এই দুর্বলতা হল নিজের সক্ষমতার অক্ষমতা। সবসময় নেতিবাচক যে ধারণা মানুষকে পিছিয়ে রাখে, এগোতে দেয় না তার অভীষ্ট ঈপ্সিত লক্ষ্যে, সেই দুর্বলচিত্তকে সবল করার আহ্বান। আর তার প্রথম ধাপ হল মন ও মুখ এক করা। অর্থাৎ নিজের কথা বা বচনকে শক্তিশালী করে তোলে, যা উন্নত রাষ্ট্রসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান সোপান। আর এক্ষেত্রে এটা না হলেই মনের মধ্যে কপটতা প্রবেশ করে। তাই অকপট হওয়াই দুর্বলতাকে কাটানো। আর তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন আমার ব্যক্তিচরিত্রের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব না। আর আমার ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকারও হয়নি। এ কোন ধর্মরাজ্য! এতো বাস্তবসমত কর্মরাজ্যের কথা! তিনি বলেছেন-

'কর্মের মাঝে ধর্মকে যে ফুটিয়ে তুলতে পারল না
ধর্মে কর্মে আনল বিভেদ পদে পদেই লাঞ্ছনা।'[২৩]

---

[২১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)। পৃ. ২৭

[২২] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ.৬৫

[২৩] ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ২২

তিনি তাঁর গড়ে তোলা সৎসঙ্গ আশ্রমে (হিমাইতপুর, পাবনা ও দেওঘর, ঝাড়খন্ড) কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি বা কখনো তা' করার ইচ্ছাও তেমনভাবে পোষণ করেননি। তাইতো মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বোষ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখ তাঁর পরিভ্রমনে এসে কেবল কর্মযজ্ঞই দেখেছেন। আর তিনিও এই কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চা দ্বারা বাস্তব আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাই তাঁর বাণীতে আছে,

“যথাযথ শ্রমের সাথে জ্ঞানের যেথা আহরণ
সুধীগণ আশ্রম বলে করেন তারে সম্বোধন।”[২৪]

আবার ধর্মক্ষেত্রে এইসব কর্মযজ্ঞের উপযোগিতা নিয়ে একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়- ‘আপনাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এত কর্মপ্রতিষ্ঠানের আয়োজন কেন?’ উত্তরে তিনি বলেন-‘ধর্ম যদি হয় সপরিবেশ বাঁচাবাড়া, তাহলে বাঁচাবাড়ার জন্য যেসব কর্মের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা তো আপনাকে করতেই হবে। সকলকে দিয়ে সব কাজ হয় না, যার যেমন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার, সে তেমনমত কাজ পারে ভাল। তাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কাজের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কাজগুলি যত সুষ্ঠু, দক্ষ ও ক্ষিপ্রভাবে করতে শেখে মানুষ, তত তার ability-ও (যোগ্যতাও) বাড়ে, character-ও (চরিত্রও) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, আবার, environment (পরিবেশ)-এরও service (সেবা) হয় তাকে দিয়ে। তাহলেই দেখুন- এতরকমের কর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কেন? বাঁচতে যদি চান ধর্মকে মানতেই হবে। আর শুধু মানা নয়, আচরণ করতে হবে।’[২৫] তাঁর মতে প্রকৃত ধার্মিক যে, সে কখনো বাস্তববর্জিত বা জীবন সম্বন্ধে উদাসীন তো হবেই না বরং অন্যের থেকেও সতর্ক চলনে চলতে অভ্যস্ত হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আজকাল আমাদের দেশে ধারণা হয়েছে, ধার্মিক যে হবে, সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে থাকবে উদাসীন, বিষয়-ব্যাপারের মধ্যে সে থাকবেই না, ওদিকে সে নজরই দেবে না। এ ধারণা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক। মরণপন্থী হওয়া যদি ধর্ম হয়, তাহলে এই চলন ঠিক হতে পারে। কিন্তু ধর্ম মানে যদি হয় উচ্ছল জীবন, উদাত্ত অভ্যুদয়, তাহলে সে ধর্মের মধ্যে এমনতর নির্বীর্য্যতা ও মূঢ়তার কোন স্থান নেইকো।’[২৬]

---

[২৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ২২

[২৫] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ.২২

[২৬] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ৩৫

ধার্মিক ব্যক্তি কেবল জীবন নিয়েই চিন্তা করেন না, বরং সবাইকে নিয়ে জীবনের আহ্বানে সংযুক্ত করাই তাঁর কাজ। এই বাস্তববোধ না ফুটে উঠলে তার মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ ফোটে না। তাই ধর্মচর্চার নামে যেসকল বাস্তবতা বিবর্জিত কেবল পরলোকমুখী অধর্মচর্চা হচ্ছে তা' তিনি তার কথায় স্পষ্ট করেছেন, 'গতানুগতিক ধর্মবোধের মধ্যে অনেকখানি অধর্ম আছে, অনেকখানি জড়তা আছে, জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে পরলোকমুখী হয়ে চলার বুদ্ধি আছে।'[২৭] অর্থাৎ কি হিন্দুধর্ম, কি ইসলামধর্ম, কি বৌদ্ধধর্ম, কি খৃষ্টানধর্ম কিংবা অন্যান্য ধর্ম; সবখানেই যে বাস্তবতাবর্জিত পরলোকমুখীনতা বা স্বর্গের লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু আচার-পালন করা তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন তিনি। সেগুলোকে বলেছেন ধর্মেও মধ্যে অধর্ম। অর্থাৎ প্রেরিতেরা বা প্রবক্তারা এমন কথা বলেননি, বরং যা' বলেছেন তা' ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। এ যেন ধর্মের এক নতুন বাস্তবসম্মত শাশ্বত রূপ। আর এই ধর্ম তো নাস্তিক-আস্তিক, হিন্দু-মুসলমান, বাংলা-ভারত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবার জন্য এক; এ হলো উন্নতির ধর্ম, বাস্তবতার ধর্ম, কর্মযজ্ঞের ধর্ম, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয়ের ধর্ম। কে না চায় এই ধর্ম ! প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্রকে এমনিভাবে কর্মের আয়োজনযজ্ঞে নিয়ে যাওয়াই তো সমগ্র আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোর লক্ষ্য। অর্থাৎ এই ধর্ম তো সবাই পালন করে চলেছে।

জীবনের পূজারী ছিলেন তিনি। নব-নব জীবনের কল্যাণমুখী চলনে মানুষকে অবিরতভাবে অভ্যস্ত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর ইষ্টার্থে অর্থাৎ মঙ্গলার্থে এই করাই তো প্রকৃত ধর্ম। অর্থাৎ মঙ্গলার্থে কর্মই ধর্ম। তিনি বলেছেন—'আমি জন্মেছি একটা অন্তহীন উৎসাহ নিয়ে। উৎসাহের সঙ্গে নিত্য নব-নব জীবন-বর্দ্ধনী সম্ভাবনাময় প্রচেষ্টায় বাস্তবভাবে রত থাকা- আমি বুঝি, এই হলো জীবনের আরাম, এই হলো জীবনের উপভোগ। ইষ্টার্থে অমনতর করাই ধর্ম। তাই ধর্মের সঙ্গে আলস্য বা জড়তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমাদের দেশে কেমন করে যেন ধর্মের মধ্যে তামসিকতা এসে ঢুকে পড়েছে। তাই আমি কর্মের উপর এত জোর দিই। আর আমি বিশ্বাস করি, তোমরা যদি এমন হও, তোমাদের ভিতর দিয়ে প্রকৃত ধর্মের জাগরণ হবে সর্বত্র।'[২৮]

---

[২৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ.৪৮

[২৮] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ১৯২

তাইতো এপ্রসঙ্গে তার কাছে যখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনামূলক প্রশ্ন করা হয় যে- ইউরোপ-আমেরিকা তো আমাদের চেয়ে বেশি কর্মশীল, তারা কি আমাদের চেয়ে বেশি ধার্মিক? তার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন— 'আমার তো তাই মনে হয়।'[২৯]

অর্থাৎ যেখানে উন্নতি আছে সেখানে ধর্মের বৈশিষ্ট্য আছেই। কিন্তু এই উন্নতিকে সাত্ত্বত ও শাশ্বত পন্থায় বিহিত চলনে ক্রমাগতিতে নিয়ে চলতে গেলে প্রয়োজন হয় একজন জীয়ন্ত আদর্শের। এই জায়গায় ফাঁক তৈরী হওয়ায় এত উন্নতির পরও শান্তির দেখা মেলে না অনেক সময়। ব্যক্তি-দম্পত্তি-গৃহ-সমাজ এমনকি রাষ্ট্রজীবনে এক অস্থিরতা যেন নিত্যসঙ্গী। এত টাকা, এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য; তবুও অভাব-দৈন্য-ক্লেশ থেকে মুক্তি মিলছে না। কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে। আর তাই দেখা যাচ্ছে ধর্মকে ঘিরে একদল যেমন অলীক স্বর্গের আশায় দিন গুণছে, অন্যদল বিশ্রামহীন কর্মের বিস্ফারণে জীবনের উপভোগ হারিয়ে স্বর্গের মধ্যেও নরক তৈরী করছে। এর একটা সমন্বয় প্রয়োজন। আর তা হল বাস্তব ধর্মচর্চা। যে ধর্মচর্চা আস্তিক-নাস্তিক, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবার জন্যই সমান। যেখানে কেউ ছোট কেউ বড় থাকবে না বরং যে ছোট সে বড় হবে আর যে বড় সে আরও বড় হবে। একটা উন্নতিমূখর ধারা গোটা পৃথিবীই হয়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য। মানুষে-মানুষে হিংসা-দ্বন্দ্ব নিপাত যাবে, প্রীতির বাঁধনে পরস্পরের মিলিত আদর্শকেন্দ্রিক চলন সবাইকে একায়িত সূত্রে বেঁধে ফেলবে। আর তাই তো ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য, বাকী প্রচলিত সব রূপই তার বিকৃত রূপ। তাইতো তার বলা—'ধর্ম বলতে আমি যে সর্বতোমুখী সঙ্গতিশীল কেন্দ্রানুগ কর্মময় সার্থক জীবনের কথা বলি, তা অনেকের মাথায় ধরে না। ভাবে, আমাকে দিয়ে পরকালের পথ করে নেবে। কিন্তু পরিবার, দেশ, সমাজ, জাতি ও জগৎকে যে আদর্শ-অনুযায়ী ভিতরে-বাইরে সব দিক দিয়ে গড়ে তুলে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে দুনিয়াটাকেই স্বর্গ করে তুলবে, সে কথা আর ভাবে না।'[৩০]

জীবন ও ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে ধর্মই ব্যাপক। ধর্মের মধ্যেই জীবনের অবস্থান। তাই কোনটি মূখ্য-'জীবনের জন্য ধর্ম' না 'ধর্মের জন্যই জীবন'। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বলতেন—'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্মঃ। তাই ধর্মের মধ্যে জীবন

---

[২৯]. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *নানা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ০৯

[৩০]. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ১২৩

তো আছেই, তদুপরি আছে বৃদ্ধি। তাই জীবন এবং ধর্ম এ দুইয়ের মধ্যে ধর্মই ব্যাপক। তাই আমি তো বুঝি, ধর্মের জন্যই জীবন। ধর্ম বলতে বাঁচাবাড়া বাদ দিয়ে যদি অন্য-কিছু বোঝায়, সে ধর্মের সাথে জীবনের সম্বন্ধ কতটুকু, তা বুঝতে পারি না।'[৩১]

আর এই যে বাঁচা-বাড়ার নীতি, প্রত্যেক অবতার-মহাপুরুষেরা যাঁর-যাঁর রকমে তার তার সময়ে এই একই নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন পৃথিবীতে। তাই তার নিকট সকল ধর্মই এক, আর কোনও ধর্মের সাথে কোনও ধর্মের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ তিনি খুঁজে পান না, বরং বিরোধের এক সমাধানী সূত্র দিয়েছেন। তিনি বলেন—'ধর্ম মানে বাঁচাবাড়ার নীতি। এই নীতি বিভিন্ন অবতার-মহাপুরুষদের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নেই, কারণ, সবাই একপন্থী। বর্ত্তমানে এমন যদি কোন আদর্শ থাকেন, যাঁর মধ্যে সবারই বৈশিষ্ট্যসম্মত পরিপূরণ আছে, তাহ'লে তাঁর ছত্রছায়াতলেই সবাই মিলিত হ'তে পারেন- স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে।'[৩২] আবার, এই বিষয়টাকে তিনি আরেকটু ব্যাখ্যা করে পরিষ্কার করলেন যে অন্যকে সঠিকভাবে বাঁচতে বাড়তে সহায়তা করার পাশাপাশি নিজের বাঁচা-বাড়াকে অক্ষুন্ন রাখাই ধর্ম। কেবল নিজের বাঁচা-বাড়ার চিন্তা করলে একসময় তা-ও টেকে না। তাঁর ভাষায়— 'ধর্মবোধের মূল কথা হচ্ছে, অন্যের বাঁচাবাড়ার সহায়তা করা, ওটা না করলে নিজের বাঁচাবাড়াই টিকবে না।'[৩৩] আর তাই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মূল কথাই হল—

'অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে।'[৩৪]

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে ধর্ম মানে সপারিপার্শ্বিক বাঁচা-বাড়া। ধর্মের প্রকৃত অর্থও তাই। শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেই তাকে ধর্ম বলে না। পরিবেশ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষভাবে বলেন- 'পরিবেশ আমাদের জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। এই পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা যে-দিন থেকে উদাসীন হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমরা অনেকখানি ধর্মভ্রষ্ট হয়েছি। তাই, আমরা আজ

---

[৩১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ১৫৪

[৩২] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ২১

[৩৩] ঐ.ঐ. । পৃ. ২৩১

[৩৪] ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫। পৃ. ২৮২

মনে করি, ব্যক্তিগতভাবে জপধ্যান করলেই ধর্ম্ম করা হ'লো, তার সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র, বা বিশ্বের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী? কিন্তু সর্ব্বতোভাবে বাঁচাবাড়াই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে-ধর্ম্ম পরিবেশকে বাদ দিয়ে কিছুতেই হবে না। আর, ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনবৃদ্ধির যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে সে-ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই।'[৩৫]

৪.৩ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্মাচরণ ও প্রকৃত ধার্মিক

একজন ধার্মিকের চলন কেমন হওয়া উচিত? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে ধার্মিক বলা যায়? ধার্মিকের প্রধান দিক কোনটি? শ্রীশ্রীঠাকুর এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই বলতেন যে ধর্মবীর হওয়া মানে কর্মবীর হওয়া। অর্থাৎ শুধুমাত্র কিছু মন্ত্র-তন্ত্র, প্রার্থনা বা নামায পড়েই ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়। আমার চিন্তার সাথে আমার কর্মপ্রয়াস চাই। চাই চরিত্র গঠন। সেটাই আসল ধর্ম। আর সেই আদর্শ চরিত্রই মানুষকে ধর্মমূখী করে তোলে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—'মানুষের সেবা করতে সর্বাগ্রে নিজের চরিত্র গঠন করা দরকার। একটা তরতরে ইষ্টপ্রাণ সুনিয়ন্ত্রিত কর্মঠ কৃতী জীবনের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরার চাইতে বড় সেবা আর হয় না।একেই কয় ধার্মিক চলন।এই ধার্মিক চলন যেখানে পরিবেশেও সেখানে ধর্ম সেজে ওঠে।'[৩৬]

বার বার তিনি করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। করা বাদ দিয়ে যে ধর্মজগতে কোন ফাঁকি বা ফন্দী করে কিছু পাওয়া যায় না সে বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ নিজের জন্য, দশের জন্য, দেশের জন্য প্রতি প্রত্যেকের যে দায়িত্ব আছে তা পালন না করে ধর্ম করে কোন লাভ নেই। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলেছেন— 'আল্লাহ আমাদের দুটি হাত দিয়েছেন শুধুমাত্র ফরিয়াদ করার জন্য নয়, বরং তা দ্বারা কাজ করে প্রাপ্য অর্জন করার জন্য।'[৩৭]

শ্রীশ্রীঠাকুর সেটাকে আরও ব্যাপ্ত করে বললেন কর্ম ছাড়া ধর্ম ঈশ্বরের সাথে ফাঁকি দেওয়া। ঈশ্বরের রাজ্যে আলস্যেও কোন স্থান নেই। ঈশ্বরকে সদাজাগ্রত বলা হয়, অর্থাৎ তিনি সবসময় কর্মময়। কথায় বলে- যেমন কর্ম তেমন ফল। অর্থাৎ আমার কর্মই আমার ফলাফল নির্ধারণ করে। কেবল কিছু তথাকথিত আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম থাকেনা। ধর্ম থাকে সেসবের বাস্তবমুখী

---

৩৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে(৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২(৫ম সং), পৃ. ৬

৩৬. *ঐ. ঐ.*, *আলোচনা প্রসঙ্গে(৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২(৫ম সং), পৃ. ৩

৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *রিক্তের বেদন*, অর্পিতা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২। পৃ. ২১

কল্যাণকর কর্মের ভিতর। এই কাজে ফাঁকি দিলে নিজেই নিজের গুণাবলী অর্জনের পথে ফাঁকিতে পড়ব। তিনি বললেন—' করণীয় সম্বন্ধে বোধ ও জ্ঞান কিন্তু সবার সমান নয়। যার জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ যতখানি, করণীয় সম্বন্ধে তার ধারণাও ততখানি। ... করণ ছাড়া ধরণ বা ধর্ম নেই। ধর্মরাজ্যে আলস্যের আসর নেই, ফাঁকিজুকির কারবার নেই। আছে continued, responsible, regulated, enthusiastic, active tenor (দায়িত্বপূর্ণ, উৎসাহদীপ্ত, অবিরাম, বিহিত কর্মমুখরতা), and that to feed and fulfill the Superior Beloved (এবং তা প্রেষ্ঠের ভরণ ও পূরণার্থে)।'[৩৮]

প্রকৃত ধার্মিক হিন্দু, প্রকৃত ধার্মিক মুসলমান, প্রকৃত ধার্মিক বৌদ্ধ, প্রকৃত ধার্মিক খৃষ্টান, প্রকৃত ধার্মিক শিখ কিংবা প্রকৃত ধার্মিক জৈন-পার্সী এদের মনে কোন পার্থক্য নেই। একজন হিন্দু প্রকৃত ধার্মিক হলে সে মনে-প্রাণে একজন মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি একজন মুসলমান প্রকৃত ধার্মিক হলে সে মনে-প্রাণে একজন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান হয়ে ওঠে, একইকথা একজন প্রকৃত ধার্মিক বৌদ্ধ-খৃষ্টান তথা অন্য মতাবলম্বীর জন্যও প্রযোজ্য। 'প্রকৃত ধার্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান-খৃষ্টান, প্রকৃত ধার্মিক প্রত্যেক মুসলমান-খৃষ্টানই হিন্দু'- একথার মানে কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'আমি তো আগেই বলেছি- ঈশ্বর এক, প্রেরিত পুরুষগণ এক বার্ত্তাবাহী এবং ধর্মও এক। ধর্ম মানে সেই আচার, সেই চিন্তা, সেই চলন যা'তে মানুষ সপরিবেশ সর্বতোমুখী বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে যায়- দেশকালপাত্রানুযায়ী স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে, তাহ'লে একের ধার্মিক চলনের সঙ্গে অপরের ধার্মিক চলনের কোন মূলগত বিরোধ থাকতে পারে না, যদিও বৈশিষ্টানুযায়ী উভয়ের চলন স্বতন্ত্র হ'তে পারে। সে হিসাবে ধার্মিক প্রত্যেকেই একপন্থী। তাছাড়া কোন প্রেরিতপুরুষের প্রতি যদি কেউ নিষ্ঠাসম্পন্ন হয়, একের ঐ নৈষ্ঠিক অনুসরণের ভিতর দিয়ে তার অন্যান্য প্রেরিতপুরুষগণকেও যুগপৎ অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে। যেমন আমি যদি রামকৃষ্ণদেবকে অনুসরণ ক'রে চলি, তাহ'লে তাঁর ভিতর দিয়েই আমার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহমদ, চৈতন্যদেব সকলকেই অনুসরণ করা হয়- কারণ এঁদের মূলনীতি এক।

---

[৩৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে(৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২(৫ম সংস্করণ), পৃ. ১৫৯

আর প্রত্যেক মহাপুরুষেরই নির্দেশ অন্যান্য মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে চলা। তাই আমি তাঁদের কাউকে যদি ভালবাসি, অন্য সকলকেও স্বভাবতঃই ভালবাসব তাঁরই বিভিন্ন মূর্ত্তি জেনে। আর তাঁদের অনুগামী যারা, তাদেরও ভালবাসব আপনজন ভেবে। এই-ই তো স্বাভাবিক।

তাহ'লে আর খাঁটি মুসলমান, খাঁটি হিন্দু, খাঁটি খ্রীষ্টানে ভেদ থাকে কোথায়? তবে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পন্থানুযায়ী খাঁটি হওয়া চাই এবং অন্য সকলকেও তাদের আদর্শ-অনুযায়ী খাঁটি হ'য়ে উঠতে সাহায্য করা চাই। তখন একগুরুর নিষ্ঠাবান শিষ্যদের মধ্যে যেমন ভাব জমে ওঠে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যেও তেমনি ভাবে জমে উঠবে। কেউ কাউকে পর ভাববে না, শত্রু ভাববে না বরং পরমাত্মীয় ব'লে জ্ঞান করবে। খলিলভাই তো মুসলমান, কিন্তু তাকে দেখলে কি তোমাদের পর মনে হয়? কিম্বা সেও কি তোমাদের পর মনে করে?

তাহ'লেই দেখ- বিধিমাফিক চললে একত্ব ও মিল হ'য়েই আছে। কিন্তু convert (ধর্মান্তরকরণ) ক'রে যে মিল করার প্রচেষ্টা, ওর মধ্যে গোল আছে। ধর্ম কখনও পরিপূরণী পিতৃকৃষ্টি ও পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করতে শেখায় না। এমনতর শিক্ষার ভিতর betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা)-এর বীজ লুকিয়ে থাকে। তাই তাতে কখনও মানুষের মঙ্গল হয় না। ধর্মের কাজই হ'লো মানুষকে স্ববৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আত্মস্থ করা, তার ব্যত্যয় যদি কোথাও হ'য়ে থাকে তা' দূরীভূত করা।[৩৯]

প্রকৃত ধার্মিকের উপর প্রশ্নের সুদীর্ঘ উত্তরে শ্রীশ্রীঠকুর বেশ কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন। এর সারমর্ম হতে পারে প্রকৃত বা খাঁটি মুসলমান, প্রকৃত বা খাঁটি হিন্দু কিংবা প্রকৃত বা খাঁটি খৃষ্টানের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। তফাৎ কেবল যারা প্রকৃত নয়, খাঁটি নয় তাদের মধ্যে। কারন তারা ধর্মের মূল বিষয়টিই ধরতে পারে না। কেবলমাত্র একটি মতকে বিকৃতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাই অন্যমতের মধ্যে নিজের সত্ত্বাকেই খুঁজে পায় না সারাজীবন ধরে। হয়তো তা' খোঁজার প্রয়োজনও মনে করে না। তাই তো লালন ফকির বলেছেন—

'মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হ'বি।'[৪০]

---

[৩৯] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২(৫ম সংস্করণ), পৃ. ৪

[৪০] শাহীনুর রেজা, *লালন সংগীত স্বরলিপি-১মখন্ড*, মম প্রকাশ, ঢাকা। পৃ-২০২

তখন মত বহু হলেও, পিতৃসংস্কার পৃথক হলেও, সকলের ধর্ম একটা, তাই ধর্মান্তরের প্রয়োজন হয়না। আর একমতে থেকেও সকল মতকে শ্রদ্ধা করার, ধারণ করার গুণ অর্জিত হয়। সকল প্রেরিতের মাঝে নিজের প্রেরিতকে খুঁজে পাওয়া যায়। সকল পবিত্র গ্রন্থে একই সাম্যের বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃত ধার্মিকের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীতে বললেন—

‘শান্তি দিবি, তৃপ্তি দিবি, দীপ্তি দিবি, সবার প্রাণে,
নিষ্ঠাবিপুল চর্য্যা দিবি কানায়-কানায় আকুল টানে।’ [৪১]

৪.৪ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক

জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন সার্থকতার সাথে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলেছেন। জ্ঞান ও বিশ্বাসের এই সম্পর্ককে তিনি সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মত বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্যে এটাই ফুটে উঠেছে যে— বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া।[৪২] বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে যেসব মনীষী ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য বলেই স্বীকার করেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মধ্যে অগ্রণী একজন। যেহেতু তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাঁচা-বাড়ার পথ। আর বিজ্ঞানও মানুষের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থেই কাজ করে থাকে। তাই যা ধর্ম তাই বিজ্ঞান। উপরন্তু বিজ্ঞান ধর্মের একটি অংশ বিশেষ। বাঁচা-বাড়ার যে ধর্মকে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানব জীবনের কোন কিছুই বাদ যায় না। তাই সেই পথে বিজ্ঞান কেবল একটি উপাদানমাত্র। আবার এই বিজ্ঞান যদি ধর্মদ না হয় তাহলে সে সাত্বত পন্থায় কাজ করতে পারেনা; অর্থাৎ মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়—ধর্ম মানে যা সত্তাকে ধরে রাখে, আবার বস্তুর বস্তুত্বকে যা ধরে রাখে তাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের আমাদের পালন-পোষণী করে বিনায়িত করা বা বাদ সেখানেই আসে ধর্মের প্রয়োজন।[৪৩]

---

[৪১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২(৫ম সংস্করণ), পৃ. ২৩

[৪২] Albert Einstein, *Ideas and Opinions* from *Science, Philosophy and Religion, A Symposium*, Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., NY, 1941, pp.41 - 49.

[৪৩] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২২শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২, পৃ. ১৯৫

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মকে বললেন বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের গবেষণা সকল ক্ষেত্রে একই তথ্য দেয়, তাই বিজ্ঞানকে প্রামাণ্য সত্য ধরা হয়। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে সকল শাস্ত্র ঘাটলে একই সুর পাওয়া যায়। ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিতপুরুষরাও একই সত্যের উদগাতা। সব জায়গায় একই কথা। তাই এটি বিজ্ঞান। তাঁর ভাষায়— 'ধর্ম জিনিসটাই এমন যে ধর্ম ছাড়া আর কিছুই ধর্ম হয়নি– তাই একে বলে বিজ্ঞান। বিলাতের কোকিল, সাহারার কোকিল, যেখানকার কোকিল হোক না কেন, কোকিল হলে ডাকে 'কু'-ই। ধর্ম সর্বত্র অভিন্ন এবং ধর্মেই সব। কেষ্টঠাকুরের (শ্রীকৃষ্ণ) মধ্যে দেখবেন, তিনি ধর্মের কথাই বলেছেন। রাজনীতির কথা আলাদা করে বলেন নি, ধর্মের সঙ্গেই রয়েছে রাজনীতি। ধর্মের প্রাণপুরুষ এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে যেখানে বিরাট মানবসঙ্ঘ দানা বেঁধে ওঠে–সেখানেই জেগে ওঠে রাজনীতি। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি– ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে আছে বুদ্ধ এবং সংঘ–তাই ধর্মের মধ্যেই আছে রাজনীতি। ধর্মের মধ্যে দুটো দিক আছেঃ একটা divine (ভাগবত অর্থাৎ সার্বজনীন) আর একটা discrete (বৈশিষ্ট্যসমত দেশকালপাত্রানুযায়ী)। divine যা তা চিরন্তন– সর্বদেশে সর্বকালে তা এক, তার পরিবর্তন নেই, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে discrete -এর পরিবর্তন হয়—যেমন মাদ্রাজে বেশী লঙ্কা খাওয়া প্রয়োজন। তাই বলে এখানে বেশী লঙ্কা খেতে গেলে আমাশা ধরে যাবে।এমন শীতপ্রধান স্থান আছে, যেখানে গাঁজা খাওয়াটা হয়তো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন, তাই সেখানে গাঁজা খাওয়াটাই ধর্ম। তাই বলে সর্বত্র সেটা খাটবে না। অনিবার্য্য প্রয়োজন হলে গোমাংস পর্য্যন্ত খাওয়ার বিধান আছে, কিন্তু প্রবৃত্তির বশে আমরা যদি সেইটে হরদম চালিয়ে দিই, তাহলে আমাদের অপকর্মের জন্য তো ধর্ম ও শাস্ত্র দোষী নয়। বিধি অমান্য করলে প্রকৃতির ফল ফলবেই। আমরা শাস্ত্র মানি কই? যেমন ধরুন, কোরাণে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে-'জীবের রক্তমাংস আল্লায় পৌছায় না।' কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ধর্মানুষ্টানের নাম করেই করা হয় এর ঠিক উল্টো। সত্যিকার হিন্দু, সত্যিকার মুসলমান, সত্যিকার খ্রিষ্টান—এদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকতে পারে না। যদি প্রভেদ থাকে তাহলে ধর্ম নেই- অন্তঃত কোথাও ধর্মের ব্যত্যয় বা বিশৃঙ্খলা আছে। এই আমি বুঝি সোজা কথা।'[৪৪]

---

[৪৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২, পৃ. ৯৫

অপরপক্ষে ধর্মের প্রতিটা বিষয়ই বিজ্ঞানভিত্তিক। কিন্তু প্রকৃত ধর্মবেত্তাপুরুষ না হলে তা বোঝার উপায় থাকে না। আবার কোন প্রেরিত হয়তো কোন বিধান দিয়ে গেলেন, কালের পরিক্রমায় সেই বিধানটি থাকলেও তার ব্যাখ্যা আর কেউ জানেনা অথবা তার মূলচর্চা বিকৃত হয়ে তা অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ধর্মের সবকিছুই বিজ্ঞানসম্মত, যদিও তার বিজ্ঞান অনেক সময় আমাদের সামনে ধরা পড়ে না। আর বিজ্ঞানের পথচলা তো অনন্ত, তাই অনেক কিছুই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে বা ঘটতে চলেছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয়নি। তাই বলে যে সেসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, তা নয়। ঠিক সেরকমভাবে ধর্মের নামে কিছু কুসংস্কার ও বিকৃত বিষয় ছাড়া ধর্মের প্রত্যেকটা বিষয়ই বিজ্ঞানভিত্তিক। কতিপয় ধর্মীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো অনেকেরই অজানা। যেমন-অলৌকিক বিষয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে যা ব্যাখ্যা করতে পারিনা, তাকে অলৌকিক ভাবি। কিন্তু অলৌকিক বলে কিছু নেই। যা'-কিছু অলৌকিক মনে করছি তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সেসবের ব্যাখ্যা খোঁজে ক'জন? বরং বিজ্ঞানমনস্ক যারা, তারা ধার্মিক ব্যক্তিদের অবৈজ্ঞানিক ভাবে; পক্ষান্তরে ধার্মিক যারা, তারা বিজ্ঞানমনস্কদের নাস্তিক ভাবে। বর্তমান সময়ের জন্য এটি এক মহাদ্বন্দ্ব, যা স্নায়ুযুদ্ধের মত। ফলে ধর্ম সম্পর্কে না জেনেই অনেকে যেমন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে, আবার বিজ্ঞানকে না মেনেও অনেকে অন্ধবিশ্বাসকে নিয়ে চলে। অথচ উভয়ই মানবকল্যাণের চিন্তা করছে, সে সংকীর্ণভাবেই হোক বা উদারভাবেই হোক। অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে বলা যায়, ধর্ম আর বিজ্ঞান বর্তমান সময়ে এক বিপরীতমুখী অবস্থানে অবস্থান করছে। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুর এ দুটিকেই পরস্পর সম্পর্কিত মনে করেন। বিভিন্ন মনীষীর মত শ্রীশ্রীঠাকুরেরও মত এই যে—'ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর জড়িত। ধর্মে যদি বিজ্ঞান না থাকে তবে তা অন্ধ। আবার বিজ্ঞানে যদি ধর্ম না থাকে তবে তা খোঁড়া।'[৪৫] তাঁর ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানের গবেষণা আরও সুদূরপ্রসারী হোক এবং তা' হোক এই বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকেই। কারণ এখানকার বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অনেক পুরানো। তাঁর মতে বৈদিক-পৌরানিক যুগেই শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানচর্চা। আজ যাদের ঋষি বলা হচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তার ভাষায়,'বস্তু-বিষয় সম্যক দর্শন দ্বারা তন্মননে মনের নিবৃত্তি যাঁদের হয়েছে-তাঁরাই ঋষি।'[৪৬]

---

[৪৫] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২২শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২, পৃ. ২৪০

[৪৬] ঐ. ঐ., *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫ (৩য় সংস্করণ)। পৃ. ১৩

এই বিজ্ঞানমনস্কতা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যাক, আর নতুন নতুন আবিষ্কার হোক এ লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'সৎসঙ্গ বিশ্ব-বিজ্ঞান কেন্দ্র।' কেবলমাত্র জনকল্যাণে ইষ্টার্থে সমর্পিত হয়ে উপমহাদেশের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী সি. ভি. রমনের গবেষণা সহকারীর পদের চাকরির মোহ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে সেখানে কাজ করতেন তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণিতে প্রথমস্থান অধিকারী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য(কেষ্টদা) ও তাঁর সহযোগী শ্যামাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়(গোপালদা)। তাঁরা সেসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশনা মত বেশকিছু বিষয় আবিষ্কারও করেন। যেমন: । এছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও বিভিন্নমুখী বিষয় এখনো গবেষণার আবশ্যক থেকে গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে গোপালদার মৃত্যুতে বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র নির্জীব হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ধর্মীয় উপাখ্যানে বহু অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষয়ের উল্লেখ আছে। যেমন: 'কিয়িমায়ে ছাহাদাৎ' নামক ইসলামী গ্রন্থে তিন প্রকার অলৌকিকতার কথা বলা হয়েছে। যথা- ১. যাদু (সাধারণ মানুষের মিথ্যা ধোঁকা), ২. কেরামত (বিভিন্ন সাধক পুরুষের অলৌকিক ঘটনা) ও ৩. মোয়াজেজা (প্রেরিত-পুরুষের অলৌকিক ঘটনা)। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুটি জগতের কল্যাণার্থে হয় এবং শ্রীরামচন্দ্রের পাষাণ উদ্ধার প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন প্রভৃতি, প্রভু যীশুর কিংবা হযরত মোহাম্মদের[৪৭] অন্ধত্বমোচন বা রোগমুক্তি প্রভৃতি, বীরভক্ত হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, সাধু পিতরের গামছাস্পর্শে রোগমুক্তি, গুরুনানকের মরদেহ বিলীন হওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী প্রত্যেকের জীবনেই বিভিন্নভাবে দেখা গিয়েছে, যা বিজ্ঞানের কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ এবং উত্তরহীন বা অযৌক্তিক। আবার ভাববাণী হওয়া বা ঐশবাণী বা ওহী নাজিল হওয়াও বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাত নয়। প্রসঙ্গক্রমে এপর্যায়ে বিভিন্ন প্রেরিতের জীবনে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া এরকমকিছু অলৌকিকভাবে বা অব্যাখ্যাত বিষয় নিয়ে তাঁর যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানে সন্নিবেশিত হল:

যুবক বয়সে একবার ভক্তজনসাথে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে গাড়োয়ান দুর্বল ঘোড়াকে বার বার চাবুক মারায় শ্রীশ্রীঠাকুর ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে বাকীটা পথ হেঁটে যান। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর স্নানের সময় দেখা যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পিঠে চাবুকের দাগ। কিন্তু

---

[৪৭] মাওলানা আহমদ সাইদ, বিশ্ব নবীর(দ:) তিনশত মো'জেযা, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১২৮।

ঘোড়ার পিঠে মারা চাবুকের দাগ ঠাকুরের পিঠে এল কি করে? বহুদিন পর তার কাছে তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র পূজ্যপাদ ড. প্রচেতা রঞ্জন চক্রবর্তী (কাজলদা) এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন— মেঘের ডাকের মত হয়। খুব sensitive (সংবেদনশীল) হলে ঐরকম হ'তে পারে। তখন এই body-টা (শরীরটা) সব-কিছুর সাথে identified (অভিন্ন) হয়ে ওঠে।'[৪৮]

৪.৫ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছ/কাফের

হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ বা কাফেরকে ঘৃণিত চোখে দেখা হয়ে থাকে। এই ম্লেচ্ছ বা কাফের কারা, ম্লেচ্ছ বা কাফের বলতে কোন বিশেষ জাতিকে বোঝায় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন- 'ম্লেচ্ছ মানে আমার মনে হয়, ধর্ম ও কৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রে চলে যারা। ম্লেচ্ছ সব জাতির মধ্যেই থাকতে পারে। ধার্মিক যে, সে যে জাতির মধ্যেই জন্মগ্রহন করুক না কেন, সে কখনও ম্লেচ্ছ নয়। ম্লেচ্ছত্বের প্রধান লক্ষণ হ'লো ঈশ্বরকে না মানা, প্রেরিতকে না মানা, কিম্বা প্রেরিতগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, পূর্বতন কাউকে মানলেও বর্তমান যিনি তাঁকে মান্য না করা বা তাঁতে আনত না হওয়া, পিতৃপুরুষ ও পিতৃপুরুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা ক'রে চলা, প্রতিলোম বিবাহ ও যৌনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। যে যত উচ্চকূলোদ্ভূতই হো'ক না কেন, এই সব কুলক্ষণ দেখলেই বুঝবে, সে ম্লেচ্ছাচারাক্রান্ত।[৪৯] অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বা কাফেরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রেরিতগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের পৃথক তৈরী করা বা ছোট-বড় করা। যে-কেউই হোকনা কেন, সে যদি বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অন্যমতকে স্বীকার না করে তবে সেই ম্লেচ্ছ বা কাফের। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মাচারের পাঁচটি নীতি বা পঞ্চবর্হিকে তুলে ধরেছেন, এগুলোকে যে অস্বীকার করবে সেই ম্লেচ্ছ বা কাফের। অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষগণ সর্বদা পরিপূরণী বাণী দেন, সাধু-সন্ত যারা তারাও একই প্রকৃতির হন; কিন্তু তাঁরই রূপ বিকৃত করে ম্লেচ্ছ বা কাফের যারা, তারা প্রেরিত বা তথাগতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভেদের বাণীই প্রচার করে।

---

[৪৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৯৯৫, পৃ. ৫২

[৪৯] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২, পৃ. ৯৫

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন,

‘পূরণ-বাণী গড়নপ্রবণ
সন্ত-সাধু-প্রেরিতদের,
যে জাত-জনের হো’ন না তিনি,
বিভেদ-বাণী ম্লেচ্ছদের।
তথাগতদের মধ্যে বিভেদ
করে যে-জন সে আর্য্যক্লেদ।[৫০]
প্রেরিতে যে প্রভেদ করে
অন্ধ তমোয় সাবাড় করে।[৫১]

অর্থাৎ প্রেরিতগণ সর্বদা পরিপূরণী বাণী প্রদান করেন, দ্বন্দ্বমূলক বাণী প্রদান করেন না, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কোন মতকে ভেঙ্গে ফেলতে প্রয়াসী হন না বরং গড়নপ্রবণ হন। আর সন্তগণ ও সাধুগণও তেমনি হন, তা তারা যে জাতে বা ধর্মে জন্মগ্রহন করুন না কেন। কিন্তু ম্লেচ্ছ যারা, কাফের যারা; তারা বিভেদের বাণী ছড়ান ও প্রেরিত বা তথাগতদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করেন। তাই তারা আর্য্য জাতির ময়লাস্বরূপ। আবার এই প্রেরিতদের মধ্যে যারা প্রভেদ করে তারা নিজেরাও অন্ধ-তমসায় আচ্ছন্ন থাকে আর সাধারণ মানুষদেরও অন্ধকার পথে টেনে নেয়। মানুষ প্রকৃত ধর্মের আলো পায় না।

আবার বললেন,

‘কৃষ্ণ-রসুল বিভেদ ক’রে বুদ্ধ-ঈশায় প্রভেদ গণিস্,
আরে ওরে ধর্মকসাই কুটিল দোজখ মনেই রাখিস্;
এক বাপেরই পাঁচটি ছেলে দেখলি না তুই চোখটি মেলে,
কাউকে বাপের করলি স্বীকার কাউকে বললি নয়,
কা’রে রে তুই দিলি ধিক্কার গাইলি কাহার জয়?[৫২]

---

৫০. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৮৯

৫১. ঐ. ঐ. পৃ.২৯২

৫২. ঐ. ঐ. পৃ. ২৮৯

এ বাণীটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আরও স্পষ্ট করে বললেন যে শ্রীকৃষ্ণ, হযরত মোহাম্মদ, শ্রীবুদ্ধ কিংবা প্রভু যীশুকে যারা পৃথক মনে করে তারাই ধর্মকসাই; অর্থাৎ ধর্মটাকে কেটে খান খান করে ফেলছে। তারাই কাফের, তাই তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে সবচেয়ে যন্ত্রণাময় দোজখ রয়েছে তাদের জন্য। কারণ তাদের অপরাধ তারা একই বাপের পাঁচটি ছেলের মধ্যে কাউকে পুত্র বলে স্বীকার করছেন কাউকে স্বীকার করছেন না। অর্থাৎ একই ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে যেসব বিভিন্ন প্রেরিত পাঠিয়েছেন, তাদের সবার উৎস এক; একই ধারার ভিন্ন প্রকাশমাত্র। তাদের কাউকে স্বীকার করে তার গুণগান করা আর অন্যদের অস্বীকার করা বা ধিক্কার জানানো মানে স্বয়ং আল্লা বা ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা। তাই এর জন্য দোজখ বা নরক অবশ্যম্ভাবী। এপ্রসঙ্গে আরো একটি বাণী উল্লেখ করা যায়:

ভরদুনিয়ায় প্রেরিতদের কা'রও ভক্তি-অছিলায়
অন্য প্রেরিত-নীতির দলন করতে যদি কেহ ধায়,
তা'রেই নিছক কাফের জানিস্ ধর্মদ্রোহের কারণ সেই;
তা'কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া অবজ্ঞা সে ঈশ্বরেই।[৫৩]

এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীতে কোন একটি মতের অনুসারী হয়ে, কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, কিংবা কারও ভক্ত দাবী করে যদি কেউ অন্যান্য প্রেরিতপুরুষের নীতিকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে তবে সে নিশ্চয়ই কাফের এবং দুনিয়াতে এসব ব্যক্তিই ধর্মদ্রোহ, বিরোধ কিংবা সংঘাতের সূচনা করে। আর এসব ব্যক্তিকে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় তারা ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে। আবার অন্যত্র আরো বিস্তৃতভাবে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এ প্রসঙ্গে:

একস্রষ্টা অদ্বিতীয় নাইকো যা'র মনে
প্রেরিতকে অস্বীকারে উপাসনা গণে;
পূর্বতনে প্রেরিতদের স্বীকারে নাই টান,
প্রেরিতে বিভেদ করাই যা'দের স্পর্দ্ধী অভিযান;
হত্যা করি' পূজে ঈশ্বর মাংসে উদর ভরে,
সেই প্রত্যয়ের নিছক টানে যা'রা জীবন ধরে;

---

[৫৩] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৯১

পূর্ব-পূরণ বর্ত্তমানে শ্লেষের গাথা গায়,
প্রেরিত-তীর্থ অবজ্ঞাতে দলতে থাকে পায়;
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি পড়শী-সেবা নেই,
ম্লেচ্ছ কাফের তা'রাই জানিস্ শয়তানসেবী সেই।[৫৪]

উপরোক্ত বাণীটিতে দেখা যায়, স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয় এই বিশ্বাস যার নেই, যে প্রেরিত পুরুষদের অস্বীকার করে উপাসনায় রত, যার পূবর্তন প্রেরিতপরুষদের প্রতি টান নেই, যার কাজই স্পর্দ্ধার সাথে প্রেরিতদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা, যারা ঈশ্বরের নামে ধর্মের নামে পশু বলি বা কোরবানি দেয় নিজেদের উদরপূর্তি করে এবং নিছক এসব টানেই জীবন ধারণ করে; পূর্ববর্তীদের পরিপূরণী যিনি বর্তমান প্রেরিত পুরুষ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, নিন্দা করে, প্রেরিত-তীর্থকে* অবজ্ঞা করে হেয় প্রতিপন্ন করতে বাকী রাখে না, যারা নিত্য যজন (নিজে ধর্মাচার পালন), যাজন (অন্যকে ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধকরণ), ইষ্টভৃতি (ইষ্টার্থে নিত্যদান) ও প্রতিবেশীর সেবাপরায়ন নয়, তারা শয়তানের উপাসক, তারাই ম্লেচ্ছ, তারাই কাফের। আবার বললেন-

'প্রেরিত-তীর্থ আরাধনায় দ্বন্দ্ব আনে ম্লেচ্ছ সেই,
বৃত্তিচতুর যুক্তি এদের যুক্ত করে নরকেই।'[৫৫]

তাই প্রেরিত-তীর্থ* অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষকে আরাধনার রকমে যারা দ্বন্দ্ব বা বিভেদ আনে, তাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিমুখী যুক্তি দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনে মানুষকে নরকগামী করে তারাই ম্লেচ্ছ বা কাফের। অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বা কাফের কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের ব্যক্তি নয়; বরং প্রত্যেক ধর্মের বা মতের মধ্যেই যারা শয়তানসেবী, দ্বন্দ্বসৃষ্টিকারী, বিরোধসৃষ্টিকারী, পরনিন্দাকারী, সেবাবিমুখ ও হিংসাপরায়নভাবে নিজেরা চলে এবং এটাকেই ধর্ম হিসেবে মানুষের মাঝে প্রচার করে তাদেরও বিভ্রান্ত করে, তারাই ম্লেচ্ছ বা কাফের।

---

৫৪. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৯৫

৫৫. ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৯৭

* শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছেন- 'যেখানে গমন করলে মানুষের সর্বপ্রকার গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয় তাই তীর্থ।' আর যাকে অর্থাৎ যে প্রেরিতকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থির মোচন হয় তিনিই তীর্থপতি বা প্রেরিত-তীর্থ। প্রেরিত-তীর্থ বলতে এখানে ঐ প্রেরিতকেই বোঝানো হয়েছে।

৪.৬ সৎসঙ্গ দর্শন

‘সৎসঙ্গ, সদগুরু আর সৎনাম’ এ তিনটি প্রপঞ্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। বিভিন্ন শাস্ত্রে এসব শব্দ ব্যবহৃত হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্মের গোঁড়ামী আর দ্বন্দ্বের মধ্যে যখন কবীর, নানক প্রমুখ সাধুব্যক্তির দ্বারা সন্তমতের সূত্রপাত হয়, গড়ে ওঠে শিখধর্ম; তখন এ প্রপঞ্চগুলো যেন নতুনভাবে এক মিলনের কথা, মানবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সবাইকে। আর তখনই আগ্রার দয়ালবাগে সূত্রপাত হয় স্বামীজি মহারাজ-এর ‘সৎসঙ্গ’ সংগঠনের। এর ধারাবাহিকতায় হুজুর মহারাজ এর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতা মনোমোহিনী দেবীর ‘সৎসঙ্গ’ বা ‘সন্তমত’-এর সাথে যুক্ত হওয়া।

সৎসঙ্গ বা সন্তমতের সাধনপদ্ধতি অনুসারে পশ্চিমদেশীয় মহাত্মা কবীর, গুরু নানক, তুলসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, দাদু সাহেব, দরিয়া সাহেব, কেশবদাসজী, চরণদাসজী, পল্টুসাহেব, স্বামীজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব, সরকার সাহেব, মৌলানা রুমী, কবি হাফিজ, সরদম শাহ, শমস্‌তব্‌রেজ প্রমুখ সবার একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। আর তা হলো ‘সুরতশব্দ-যোগ’। হিন্দী ‘সুরত’ শব্দের বাংলা হল আত্মা। অর্থাৎ আত্মাকে শব্দযোগের ভিতর দিয়ে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করাই ছিল এঁদের সাধনা। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিই এই সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, আর তার জন্য চাই- সদগুরু বা একজন আদর্শ, সৎনাম বা একটি শব্দ যা মনকে সর্বদা সেই পরমেশ্বরমুখী করে রাখে, আর সৎসঙ্গ বা সৎ-এ যুক্ত হয়ে যারা তদগতিসম্পন্ন তাদের সঙ্গ।[৫৬]

পরবর্তী সৎসঙ্গের ধারায় সরকার সাহেবের আদেশে মাতা মনোমোহিনীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। ‘সুরতশব্দ-যোগ’-এর এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তিনি তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলে দেশকালপাত্রপোযোগী করে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে বর্তমান সৎসঙ্গের বিজ্ঞানসম্মত ও সার্বজনীন অভিনব আদর্শ সাধনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। এ সাধনা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় বিভিন্ন মতের মানুষ তার কাছে একত্রিত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, “সৎ-এ সংযুক্তির সহিত তদগতি সম্পন্ন যারা তারাই সৎসঙ্গী, আর তাদের মিলনক্ষেত্রই হলো সৎসঙ্গ।”[৫৭]

---

[৫৬] ব্রজগোপাল দত্তরায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (১ম খণ্ড)*, তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২, পৃ. ২১

[৫৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৯৭

এখানে 'সৎ' অর্থ সেই অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব ও বিকাশময় সত্তার অর্থাৎ সেই আদি কারণের সঙ্গ, যাকে কেউ ব্রহ্ম বলছে, কেউ আল্লাহ বলছে, কেউ গড বলছে, কেউ আহুর মাজদা বলছে। আর একজন ব্রহ্মজ্ঞ সদগুরুর আদর্শ গ্রহনের মাধ্যমেই সেই সঙ্গ করা যায়।

মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৎসঙ্গ দর্শনে তিনটে স্তরকে তুলে ধরা হয়েছে। যথাঃ ১) আদর্শ, ২) অহং বা নিজ ও ৩) পারিপার্শ্বিক। প্রথমতঃ জীবনের একজন ব্রহ্মজ্ঞ আদর্শ বা সদগুরু থাকতে হবে, দ্বিতীয়তঃ নিজেকে সেই আদর্শমাফিক জগতের হিতার্থে প্রস্তুত করতে হবে এবং শেষতঃ পারিপার্শ্বিককেও আদর্শপ্রাণ করে তুলতে হবে। এরকমভাবেই আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ দম্পত্তি, আদর্শ গৃহ, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

সৎসঙ্গ দর্শন হল অখন্ড জীবন-দর্শন[৫৮], যা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জীবনের সাথে একই রকম সম্পর্কিত। প্রকৃত দর্শন কোন ধারণারঙ্গিল আত্মগত একদেশদর্শী সাম্যসঙ্গতিহারা ভাবালুতা নয়, বরং সত্যনিষ্ঠ মোহমুক্ত বাস্তব তথ্যের সার্থক বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সুবিন্যস্ত ও সমন্বয় করে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ইষ্টানুগ জীবনের পথ দেখায়। আর এজন্য যুগপ্রয়োজনে সঙ্কটকালে তত্ত্বপুরুষ আবির্ভূত হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের গতিপথ ও দিক নির্ধারণ করে দিয়ে যান। তাই তিনি দর্শনমূর্ত্তি। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাই সৎসঙ্গ-দর্শনের দর্শনমূর্ত্তি। বর্তমান সময়ের যুগজীবনের প্রতিটি বিষয়ের মর্মকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে তিনি মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ কি, কি তার চাহিদা ও ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে তার পরিপূরণ করার জন্য পথনির্দেশ দিয়েছেন।

মূল সমস্যা হল মানুষের ব্যক্তিসত্তা আজ প্রবৃত্তিমুখী দ্বন্দ্বে শতধা খন্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত। এই মানসিকতা নিয়ে সে নিজেও শান্তি পায় না, পরিবেশের সাথে তার সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করণীয়টা করতে পারে না। আর এই সামঞ্জস্যহীন বিশৃঙ্খলা তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। এর থেকেই তৈরী হয় বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- অন্নাভাব, দারিদ্র, বেকারত্ব, মালিক-শ্রমিক বিরোধ, উৎপাদন-বন্টন ত্রুটি, জাতীয় অনৈক্য, আন্তর্জাতিক অশান্তি ইত্যাদি। তাই প্রথমেই চাই ব্যক্তিজীবন গঠন, চরিত্র গঠন।

---

[৫৮] শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, *অখণ্ড জীবন-দর্শন*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৯(৫ম সংস্করণ) পৃ.২৮০

ভালোবাসার শক্তি ও প্রবণতা মানুষের জন্মগত সম্পদ। তবে এই শক্তি যে যেখানে সক্রিয়ভাবে ন্যস্ত করে, সে তেমন হয়ে ওঠে। ব্যক্তিজীবন গঠনের জন্য চাই একজন ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বপ্রেমী, সর্ব্বপূরয়মান কোন মানুষের প্রতি এই ভালোবাসার শক্তিকে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ তাঁর নিকট দীক্ষা বা সংকল্প গ্রহন করে তাঁর নীতি ও নির্দেশমাফিক জীবন পরিচালনা করা। এতে সে নিজেও বৈশিষ্ট্যমাফিক গড়ে উঠতে পারে এবং তার পরিবেশকেও গড়ে তুলতে পারে। এভাবেই একটা অখন্ড সংহতি গড়ে ওঠে। এ পথ হবে সার্বজনীন, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনতন্ত্র- এর ভিতর দিয়েই প্রকৃত বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতিময় বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী হবে।

অর্থাৎ আপূরয়মান বৈশিষ্ট্যপালী আদর্শ গ্রহন, তাঁতে অচ্যুত অনুরাগের সহিত ব্যক্তিজীবন গঠন এবং তা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া; এমনিভাবে পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বন্ধতায়, সহযোগিতায়, পোষণে, পূরণে, আদান-প্রদানে, প্রতিটি ব্যক্তিজীবন,পরিবারজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন তথা বৈশ্বিকজীবনের যুগপৎ সর্ব্বতোমুখী অভ্যুদয়ের পথ তৈরী হয়। আবার, এসবের পরিপন্থী যা' কিছু সেসবের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণও হতে হবে পরস্পর বদ্ধপরিকর। এই হল সৎসঙ্গের বাস্তব-দর্শন, কল্যাণকর আন্দোলনের দিব্যপ্রয়াস। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দর্শনমূর্ত্তি বাদ দিয়ে কেবল তাঁর দর্শন নিয়ে আলোচনায় ভ্রান্তি ও দুর্বলতা তৈরী হয়।

সৎসঙ্গের মূলকথা এই যে, সৃষ্টির আদিতে আছে এক অদ্বয়শক্তি।[৫৯] তা হল কারণশক্তি। এই কারণ থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের উদ্ভব হয়েছে। তাই স্থূলজীবনের কল্যাণের জন্য চাই কারণমুখীনতা। কারণ, সেই অসীমকে বাদ দিয়ে সসীমকে আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে, বুঝতে ও জানতে পারি না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই স্থূলরূপে কোন বস্তুর বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। তাই উভয়েই মানবকল্যাণের কথা বলে। ব্রহ্মজ্ঞান মানে বৃদ্ধির জ্ঞান। অর্থাৎ সেই এক কেন, কি কারণে, কিরূপে, কখন, কোথায়, কিভাবে কে বা কি হয়ে আছেন এবং কোন বিশেষের সংগঠন কি, বৈশিষ্ট্য বা গুণ কি কিংবা ক্রিয়া কি? একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় যে ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, কর্ম, ভক্তি, সেবা, ইহকাল, পরকাল সবই একসূত্রে গাঁথা। আর এর মূলের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চাই একজন নরমানুষকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন এবং তাঁতে দীক্ষিত হয়ে আত্মসমর্পন। তার প্রীত্যর্থে কর্ম করার ফলে আমরা অহং, কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারি। তখন কোন দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন, শোক-তাপ, সুখ-ঐশ্বর্য্য আমাদের গতি রোধ করতে

---

[৫৯] শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, *অখণ্ড জীবন-দর্শন*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৯(৫ম সংস্করণ) পৃ.২৮০

পারে না। এই উৎসমুখীনতা অকাট্য হলে মন্দের নিরসন হয়, আর উৎসের প্রতি অহেতুক উর্জ্জী অনুরাগের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মদর্শন হয় অর্থাৎ আমরা সেই কারণ-ঈশ্বরকে বা ইষ্টকে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করতে পারি। তখন জগতের প্রতি-প্রত্যেকের প্রতি একাত্মবোধ হয়, প্রত্যেকেই যে সেই পরমেশ্বরের সৃষ্টি বাস্তবে তা উপলব্ধি করতে পারি। নিজের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেও নিজেকে সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে তোলা যায়। তাছাড়া সবার সঙ্গে একাত্মবোধ সহজ হয়ে ওঠায় ব্যবহারিক জীবনেও তা প্রতিফলিত হয়। সবার প্রতি সমান ভালোবাসা তৈরী হয়। জীবনচলার সবক্ষেত্রে একমাত্র নীতিই হয়-

> "অপরের প্রতি কর সেই আচরণ
> নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন।"[৬০]

নিয়ত এই চর্চার ভিতর দিয়ে সপরিবেশ আমরা অন্তহীন, অখন্ড অমৃতময় জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারি। এই হল সৎসঙ্গ দর্শন-প্রদর্শিত জীবনদর্শনের বাস্তবরূপ, যার বাস্তবায়নে এক দিব্যসভ্যতার অভ্যুদয় সম্ভব; যে সভ্যতায় প্রত্যেকেই আদর্শকেন্দ্রিক জীবনচলনায় অনুশাসিত, তাই সেখানে প্রশাসনের প্রয়োজন নাও হতে পারে !!!

চুম্বকে সৎসঙ্গ-দর্শনের কয়েকটি মোকতা বিষয় হলঃ

১. আদর্শ ও দীক্ষা: যুগপুরুষোত্তমের দীক্ষা নিয়ে তাঁর আদর্শকে জীবনে মূখ্য করে তোলা
২. পঞ্চনীতি পালন ও ব্যক্তিজীবন গঠন: যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার পালন করে ব্যক্তিজীবনকে সুগঠিত করা
৩. সুবিবাহ-সুপ্রজননঃ সবর্ণ এবং অসবর্ণ-অনুলোম বিবাহ চারিয়ে এবং প্রতিলোম বিবাহকে নির্মুল করে পারিবারিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করা এবং সুসন্তানের আগমন ঘটানো
৪. বর্ণাশ্রমঃ বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে খাঁটি ও যোগ্য করে তোলা এবং সামাজিক সংহতিকে আরও মজবুত করা
৫. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ এই চার স্তম্ভকে শক্তিশালী করা ও তৎসহ স্বাস্থ্য ও সদাচার, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতির প্রসার
৬. আশ্রমধর্মঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এ চারটি স্তরকেই জীবনে ধারণ করা
৭. দশবিধ সংস্কার পালনঃ শাস্ত্রবিহিতভাবে দশবিধ সংস্কার চারিয়ে দেওয়া।

---

৬০. শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, *অখণ্ড জীবন-দর্শন*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৯(৫ম সংস্করণ) পৃ.২০

৪.৭ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে ধর্ম আর রিলিজিয়ন এক নয়। প্রচলিত রিলিজিয়ন বা ধর্মগুলোকে তিনি ধর্ম মানতে নারাজ। এসবগুলি তাঁর মতে মত। আবার এই প্রত্যেকটি মতই সত্য। তবে তা বিভিন্ন ভাবের, যেন একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ। আর তাই ধর্ম এক। তার ভাষায়, ‘যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ!’ অর্থাৎ যা’ দিয়ে নিজের ও অপরের জীবন ও বৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম। আর আদর্শ কেবলমাত্র কোন অমূর্ত্ত ভাব নয় বরং কোন ব্যক্তি-মানুষ যিনি নিজে সুকেন্দ্রিক অর্থাৎ ঈশ্বর-চেতনায় সম্ভুত। আর তিনি প্রত্যেকের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে পালন-পোষণ-সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং তাঁর সাথে পূর্ব্বতন ঋষি, মহাপুরুষ ও প্রেরিত বা অবতার-পুরুষদের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকবে না, বরং থাকবে পরিপূরণ। এরকম ব্যক্তি-আদর্শের উপর ভালোবাসার টানেই একজনের ব্যক্তিজীবন গঠন হয়। সে হয় প্রকৃত ধার্মিক। তার দৃষ্টিতে ধার্মিক চলন সবার একই, সে হোক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান। সব প্রেরিতই মানবজাতির জন্য আসেন, তাই প্রকৃত ধার্মিক যারা তাদের চলন একই হয়। আর ম্লেচ্ছ বা কাফের তারাই তাঁদের বাণীকে, পথকে, আদর্শকে বিকৃত করে এবং হেয় করে, বিদ্বেষ ছড়ায়, দলাদলি সৃষ্টি করে, মতভেদ তৈরী করে। তাই ম্লেচ্ছ আচারকে দূর করে মূর্ত্ত আদর্শে দীক্ষাগ্রহনের মাধ্যমে তাঁর নীতিগত চলনের মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিজীবন গঠন করে তাকে সমষ্টিজীবনে সম্প্রসারিত করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক জীবনে শান্তিস্থাপন সম্ভব। এই হল শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শনের সংক্ষিপ্ত রূপ। ধর্ম সংক্রান্ত তাঁর কতিপয় ছড়া-বাণী উদ্ধৃত হলঃ

অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে   ধর্ম বলে জানিস তাকে।
বাঁচা-বাড়ার মর্ম্ম যা’   ঠিকই জেনো ধর্ম্ম তা’।
বাঁচতে নরের যা’ যা’ লাগে
তাই নিয়েই তো ধর্ম্ম জাগে।
ধর্ম্মে সবাই বাঁচে বাড়ে   সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম নারে।
ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়   ধর্ম্ম জানিস একই হয়।[৬১]

---

[৬১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪(ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃ.২৮২

৫ম অধ্যায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে বিভিন্ন ধর্মদর্শনসমূহের অবস্থান

৫.১ অন্য ধর্মদর্শন সম্পর্কে অভিমত

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম বলতে পৃথক কোন সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করেননি, বরং এক শাশ্বত ধর্মকেই মানার শিক্ষা দিয়েছেন। যে ধর্ম সবার জন্য এক, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রিষ্টান, এমন কি গরু-ছাগল-মহিষ-বাঘ-কুমির-তিমি-মাছ-পাখি-কীট-পতঙ্গ কিংবা বৃক্ষরাজি এমনকি জড়বস্তুরও পর্যন্ত সেই এক। তবে চেতনার পার্থক্যের জন্য একেকজনের একেক রকম ধারা। তেমনি মানুষের একটি ধারা। এই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে যে বিধি তাই তার ধর্ম। আর তা সকল মানুষের জন্যই এক। এ বিশ্বজগতে প্রত্যেকটি বিষয়ই অন্য কোন একটি কীলককে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এবং নিত্য অবিরাম গতিতে চলছে। যেমন- চাঁদ পৃথিবীকে নিয়ে, পৃথিবী সূর্যকে নিয়ে, সূর্য এরকম আরও বড় কোন সূর্যকে নিয়ে। এসবের কেন্দ্রবিন্দু এক মহাশক্তি, যাকে ধর্মদর্শনের ব্যক্তি চিন্তায় ফেলে জগতের স্রষ্টা হিসেবে ধরা হয়। তিনি এই সমস্ত ধারার মূল। তার উপরই এই যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে, একে অপরকে ধারণ করে আছে, এই ধর্ম। আর তিনিই কীলক, কেন্দ্রপুরুষ, পরমপুরুষ। তাই তার ধর্ম কখনো পৃথক হয় না। আর তার প্রেরিত পুরুষেরাও পৃথক নন। তাদের আদর্শ এক, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে, অবস্থা ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভিন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় মাত্র। তাই জল, পানি, বারি কিংবা ওয়াটারের বৈশিষ্ট্য যেমন এক; ঈশ্বর, আল্লাহ, ব্রহ্ম, কিংবা গডের বৈশিষ্ট্য যেমন এক; প্রেরিত-অবতার-নবী-রসুল-পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য যেমন এক; তেমনি ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য এক— হিন্দুমত, মুসলমানমত, খ্রিষ্টমত, বৌদ্ধমত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ধর্ম একই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, ‘খোদা সকলের একজনই—খৃষ্টানের খোদা, আর্য্যদের খোদা, মুসলমানদের খোদা, বৌদ্ধের খোদা— এ আলাদা-আলাদা নয়দ আলাদা-আলাদা খোদা এসব আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নি। তাই তাঁকে যাঁরা অনুভব করতে পেরেছেন, সবারই এক কথা—তবে অবস্থাভেদে ঐ একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র!’[১]

---

[১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩, পৃ. ৩০

ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তি হল এরূপ- 'যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম কখনো বহু হয়না, আর তার কোন প্রকার নেই। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ওসবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই। ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের, একটাকেই নানাপ্রকারে একই রকম অনুভব। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য। তবে তা নানা প্রকারে হতে পারে।'[২]

হক সাহেবের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি সকল ধর্মের একই রকমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার আলোকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পঞ্চনীতি পালনের চর্চা বিদ্যমান, তা ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো।[৩]

ধর্মমত	**হিন্দুধর্ম**	**ইসলামধর্ম**	**খ্রিষ্টধর্ম**	**বৌদ্ধধর্ম**
১ম নীতি	দীক্ষা	কালেমা	বাপ্তিস্ম/অভিষেক	ত্রিশরণ
২য় নীতি	প্রার্থনা	ইামায	প্রার্থনা	বন্দনা
৩য় নীতি	উপবাস	রোযা	উপবাস	উপবাস
৪র্থ নীতি	তীর্থযাত্রা	হজ্ব	তীর্থভ্রমণ	তীর্থযাত্রা
৫ম নীতি	ইষ্টভৃতি/নিত্যদান	যাকাত	ধর্ম্মদান	দক্ষিণা

ছক ৫.১ : বিভিন্ন ধর্মে পঞ্চনীতির বিভিন্ন রূপ

৫.২ ইসলাম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

নিজে হিন্দুধর্মে জন্মগ্রহন করলেও ছোটবেলা থেকে পারিপার্শ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সাথে সর্বদা হৃদত্যাপূর্ণ ব্যবহার ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের। পাবনা ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার এই সম্পর্ক অটুট ছিল। কবি বন্দে আলী মিয়া, মাওলানা খলিলুর রহমান, লুৎফর রহমান প্রমুখ অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহনও করেছিলেন, উল্লেখ্য ইসলামধর্ম ত্যাগ করেননি। তন্মধ্যে মাওলানা খলিলুর রহমান ও তৎসহ শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইসলাম ধর্ম নিয়ে 'ইসলাম প্রসঙ্গে'[৪] নামে বিশেষ একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ১৯৪০ সালের অবিভক্ত বাংলার

---

[২] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ), পৃ. ১৫

[৩] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ১৯৫৯ (১ম সং), পৃ. ১৯১

[৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), ভূমিকা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রোষাণলে দেশ যখন উত্তপ্ত, সে বছরই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সমাধানী এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থের গবেষণাধর্মী অধ্যয়নে ইসলাম প্রসঙ্গে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বিশেষ করে তত্ত্বগতভাবে ইসলামের সাথে অন্যধর্মের বিভিন্ন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়সমূহকে তিনি যৌক্তিকভাবে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

খোদা ও রসুলের প্রতি তাঁর কোন এক স্মৃতিময় অভিব্যক্তি ছিল এরকম:

'খোদা! আমি তোমার অকিঞ্চিৎকর সন্তান—অজ্ঞান—তোমার বিধিকে অনুসরন ক'রে তোমাতে পৌঁছিবার অমৃত-মর্মরিত আলোকোজ্জ্বল রাজপথ ধ'রে নিখুঁতভাবে হয়তো চলতে পারি না—তাই ব'লে আমি যেন তোমা হ'তে কখনই বা কিছুতেই বিমুখ না হই। পূর্বপূরণীপ্রেরিত প্রবাহপ্রতীক পুরুষোত্তম হযরত! আমাকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনে দীপ্তিমান হ'য়ে প্রতি প্রেরিতোদিতবাদের পরমসার্থকতায় না-শরিক অভিগমনে, তোমার নতিতে নতিমান হ'য়ে পরমকারুণিক বিশ্ববিধাতাকে নতজানু আলুণ্ঠিত অভিবাদনে শেজদা করতে পারি।'[৫]

ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ বা পঞ্চনীতি মানতে হয়। এ নীতি সবার জন্য একই। শ্রীশ্রীঠাকুর সুন্দরভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এ স্তম্ভগুলোর সার্বজনীন প্রয়োগ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায়-

১. 'পূর্বতনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও নতি রাখিয়া ঈশ্বর ও যুগপুরুষোত্তম বা পয়গম্বরকে সর্বতোভাবে আপন অস্তিত্বের ভিত্তি ও উৎস বলিয়া স্বীকারই ঈমান ও তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠানুপাতিক নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিতকরণ-সম্বেগী থাকা, বলা ও করাই হচ্ছে আমার মনে হয় কলেমার তাৎপর্য্য।'[৬]

২. 'নিজেকে জীবন ও বৃদ্ধির পথে অটুট রাখতে হলেই চাই—অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টানুরক্তি নিয়ে ইষ্টেতে নিজেকে বেঁধে ফেলা, আর স্মরণের ভিতর-দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে জাগরূক করে, করায় তাঁরই চলনে চলা—আর, এই স্মরণের ভিতর দিয়ে করায় ঐ ইষ্টের চলনে চলার নামাযই হচ্ছে সহজ ও সুন্দর সাথীয়া।...তাই, মুসলমানদের নামাজ যেমন অবশ্য নিত্য-করণীয়, আর্য্যদের তেমনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণাদিও অবশ্য নিত্য-করণীয়।'[৭]

---

[৫] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ২৮

[৬] ঐ.ঐ., পৃ.৩১

[৭] ঐ.ঐ., পৃ.৩৪

৩. ‘আবার, মুসলমানদের ভিতর রোজা যেমন অবশ্য-করণীয়, আর্য্যদেরও উপবাস তেমনই অবশ্য-করণীয়। ইহার উদ্দেশ্য হচ্ছে—না খেয়ে বৃহৎ-উন্নতচিন্তাশীল হয়ে দিন কাটালে রোজ খাওয়ার দরুণ খাদ্যবস্তু এবং শরীরের দুষ্ট নিঃস্বাব হতে যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ শরীর-বিধানে মজুদ হয় সেগুলি ঐ অবসরে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে স্বস্থ করে তোলে।’[৮]

৪. ‘তারপর, হজ বলতে আমি এই বুঝি—তীর্থে যাওয়া—আর সেখানে যেয়ে তাই করা, যাতে নাকি সেই তীর্থে সার্থকতা লাভ করা যেতে পারে।’[৯]‘

৫. তারা (আমার পারিপার্শ্বিক) যদি দুঃস্থ, দুর্বল, বিপথগামী, ক্ষতিপরায়ণ, রুগ্ন, অসহায় হয়ে সর্বনাশে গা ঢেলে দেয়—তবে তা থেকে আমরা বাঁচব কি? তবেই তাদের ভিতরেও আমার ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাদের সুস্থ করতে হবে, সেবা, সহানুভূতি, ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে তাদিগকেও সর্বতোভাবে বিবর্দ্ধনশীল করে তুলতে হবে, নতুবা রক্ষা কোথায়? কারু কি রক্ষা আছে? আর, এই উদ্দেশ্যেই দয়াল রসুল মানুষের প্রতি আদেশ করেছেন—জাকাত দিতে তোমরা কখনই পশ্চাদপদ হয়ো না। আর্য্যদেরও ঐরকমেরই কঠোরভাবে দানের অনুজ্ঞা আর্য্য-দলিলে সন্নিবিষ্ট করা আছে।’[১০]

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে অন্য প্রেরিত না মানা, ভবিষ্যত প্রেরিতকে অস্বীকার করা, কিংবা হযরত মোহাম্মদকেই চিরদিনের জন্য শেষ প্রেরিত ভাবা এসব খোদার নিয়ম বহির্ভুত, তাই ইসলাম অনুসারে তা কাফেরের কাজ। ইসলামে পূর্ব্ববর্তীকে বা পরবর্তীদের স্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। তাই পূর্ব্ববর্তী বা পরবর্তীকে অস্বীকার করা কাফেরের কাজ। পরবর্তী যদি হাবসী কৃতদাসও হয় তাঁকে গ্রহণ করার কথা বলা আছে নবীর। পরবর্তী অনেক নবী আসার কথা আছে যাদের নাম দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ‘যাঁরাই প্রকৃত মহাপুরুষ বা প্রেরিত-পুরুষ—যে জাতিরই হোন, আর যে বর্ণেরই হোন আর ভগবানকে যা বলে, যে ভাষায়ই আত্মসমর্পন করুন না কেন—প্রত্যেকেই ইসলাম-ধর্মী। এঁদের যাঁরা মানে না বা অবমাননা করে,

---

৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ.৩৬

৯. ঐ.ঐ., পৃ.৩৮

১০. ঐ.ঐ., পৃ.৪০

তারা ইসলামকেই মানে না, ইসলামকেই অবমাননা করে,—আর হজরতের বাণী মোতাবেক এরাই অবিশ্বাসী বা কাফের।'[১১] অর্থাৎ কোরআন অনুসারে যে প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ করে এবং একজনকে ছোট করে আর একজনকে বড় করতে চায়- সেই কাফের। আর প্রকৃত ইসলাম কি, রসুল কী বলেছেন, আল্লাহকে প্রকৃত ভলোবাসার পথ কি এসব বুঝতে গেলে জীবন্ত রসুল বা কামেল পীর কাউকে না কাউকে মানতেই হয়। এজন্য ইসলামে মারেফতি সাধনার প্রবর্তন হল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে কোন প্রেরিত যখন আসেন তিনি তখনকার জন্য সর্বশেষ বার্তা নিয়ে অর্থাৎ শেষনবী হয়ে আসেন। হযরত মোহাম্মদও তাঁর সময়ের শেষনবী ছিলেন, কিন্তু চিরদিনের নয়। আরবীতে খতম বা খাতেম এর অনেকগুলো অর্থ আছে। এর এক অর্থ শেষ, আরেক অর্থ মণিস্বরূপ বা শীলমোহরও হয়। শেষের অর্থটাই প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ যত নবী এসেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে মণিস্বরূপ। নতুবা প্রথম অর্থটা স্বীকার করার অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, 'দুনিয়া রইলই, জগত চললই—মানুষের উপর শয়তানও তা'র প্রভাব বিস্তার করতে থেমে গেল না, খোদা কিন্তু থেমে গেলেন, তাঁর প্রেরিতকে আর পাঠালেন না, চলনের মুক্তি-প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বেলে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আর দেখলেন না, মানুষের প্রতি তাঁর যা করার তা তিনি শেষ করে ফেললেন, তিনি তাঁর বাণী পাঠালেন—এই দুনিয়ায় আমার আর কোন প্রেরিতের আবির্ভাব হবে না কিংবা শেষ হজরত রসুলের আলো ওখানেই শেষ হয়ে গেছে,— মানুষের বেদনায় তিনি আর কখনই তাঁর চেতনাসিক্ত স্থূলশরীর কর্ণপাতও করবেন না, এই স্থূল মায়ামুগ্ধ বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে যা অত্যন্ত আশাপ্রদ ও প্রয়োজনীয়—তাঁর যা করার তা একদম সব সাবাড়—এও কি হতে পারে?'[১২]

আবার শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়েছেন যে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করতে গেলে কোনো হিন্দুর-বৌদ্ধের-খ্রিষ্টের তার পিতৃপুরুষের কৃষ্টিকে অস্বীকার করতে হয় না। বরং পিতৃপুরুষের বংশগৌরব টিকিয়ে রাখার, তাকে যথাযথ সম্মান না করার ফল যে জাহান্নাম তার ইঙ্গিত নবীই দিয়েছেন। মহানবী তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন- পিতৃপুরুষ ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করা খারাপ।[১৩]

---

১১. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ.৩৪

১২. ঐ.ঐ., পৃ.৭৪

১৩. ঐ.ঐ., পৃ. ৭৫

শেষ বিচারের দিন বা রোজ-কিয়ামতের ব্যাখ্যায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে রোজ অর্থ বারবার বা প্রতিবার। কিয়ামত শব্দটি এসেছে কায়াম থেকে, অর্থ শরীর ধারণ করা। রোজ-কিয়ামত অর্থ পুনরায় শরীরে কায়াম হওয়া বা শরীর ধারণ করা, অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহন করা বা পুনর্জন্ম লাভ করা। আর শেষ বিচার হলো কৃতকর্ম অনুসারে বিচার করে সেইভাবের অনুসারে সে তার জন্মপরিবেশ পায়। এরকম প্রত্যেকেরই শেষ বিচার আছে তার তার মত করে, আর তা হয়েও চলেছে নিরন্তর। যার ফল ভোগের ক্ষেত্র এই পৃথিবী, কিংবা বিশ্বব্রহ্মান্ডের অন্য কোন পৃথিবী।[১৪]

ইসলামে আহার সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়েছেন যে নিরামিশ আহারই ইসলামের আহার। হযরত মোহাম্মদ আজীবন নিরামিশাষী ছিলেন। তাঁর মাংস খাবার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যখনই তাঁর খাদ্য-পানীয়ের বর্ণনা মেলে, দেখা যায় শুধুমাত্র খেজুর আর জল খাইয়াই তাঁর জীবন কেটেছে, মাঝে মাঝে রুটি জোগাড় হত। হজরত-ভক্ত খলিফারাও সাধারণতঃ রুটি, খেজুর ও জল দিয়েই তাদের জীবন-ধারণ করতেন। অথচ তাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য নবীর জন্য মাংস রান্না করলেও তিনি তা খেতেন না। আবার পরবর্তীতে বহু কামেলপীরদের জীবনেও আহারের ক্ষেত্রে একই রকম দেখা যায়। [১৫]

ইসলাম শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'আমি ইসলামের অর্থ যা শুনেছি, তা হচ্ছে—ঈশ্বরে আলিঙ্গন, ঈশ্বরে আত্মনিবেন, ঈশ্বরে আত্মসমর্পন। ইসলাম মানে যদি এই হয়—তো সবমতের, সব সম্প্রদায়েরই গুরুগণ প্রত্যেকেই ইসলাম-পন্থী। তাঁর হয়তো ইসলাম আখ্যা নাও থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম বলতে যা বুঝায় তার ভিতর দিয়েই তারা ঋষি, man of wisdom, man of love, man of power and peace… রসুলের নিকট আত্মনিবেদনই হচ্ছে বাস্তবিক আত্মনিবেদন–এই তো আমি বুঝি। রসুলকে যে মানে না অথচ আল্লায় বিশ্বাসী, আল্লায় আত্মনিবেদন করেছে–এ কথার তাৎপর্য্য কি তা তো আমি কিছু বুঝতে পারি না।[১৬]" আবু হুরায়েরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'তিনি বলেন—যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করে সে আল্লাহরই অবাধ্যাচরণ করে।' *

---

১৪. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ১৫

১৫. ঐ.ঐ., পৃ.৫৭

১৬. ঐ.ঐ., পৃ.৭৮

* বুখারী শরীফ ২৯৫৭, সহীহ মুসলিম ১৮৩৫

মুসলিমদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—তাদের নিকট অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। এর ব্যত্যয় যার নিকট ঘটে সে মুসলমান নয়। কারণ কোরানে ও হাদিসে এমন ইঙ্গিতই দেওয়া। নবীর জীবনেও এমন প্রেম-সম্পন্ন সহানুভূতি ছিল যাতে একটা পিঁপড়াও কষ্ট না পায়। এমনকি শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন অপ্রয়োজনে দয়াশীল, ক্ষমাশীল। জীবনে কখনো কাউকে অভিশাপ করেন নি।[১৭]

মুসলমান সম্পর্কিত কয়েকটি ছড়াটি শেষে উল্লেখ করা হল:

প্রেরিতে বিভেদ নাই যাহাদের রসুল ব'লে মানে,
উপকারীর স্বতঃই গোলাম মরেও যদি প্রাণে,
শান্তিবাদী শান্তি-সন্ত্রী দীপ্ত-পূরণপ্রীতি, সন্ধ্যা পাঁচে উপবাসে গায় ঈশ্বরের গীতি;
সব প্রেরিতের পূরণ-মতের সেবক-সাধক প্রাণ
পূর্বপুরুষ সূত্র-ছেঁড়া নয়কো ইতর টান;
একেশ্বরে হৃদয় ঢালা শান্ত মতিমান, জনসেবী জীবন উপাসক তা'রাই মুসলমান;
এমনতরও রেশও যেথায় নয়কো বিদ্যমান,
রসুল-প্রেমের মুখোসপরা শঠকপটী প্রাণ।[১৮]
একস্রষ্টা অদ্বিতীয় যে-জন মনে জানে,
প্রেরিত প্রতীক তাঁ'রই পথ গাঁথা যাহার প্রাণে;
পূর্বতন প্রেরিতদের স্বীকার-নতির টান, প্রেরিত বিভেদ করে নাকো এমনি মতিমান;
হত্যা করি' ঈশ্বরকে করলে নিবেদন,
সেই রক্ত-মাংস তাঁ'তে পৌঁছে না কখন;
প্রত্যয়টি এমনি যা'র হৃদয়েতে গাঁথা, পূর্ব-পূরক বর্তমানে নতিতে হেঁট মাথা;
তীর্থে হৃদয় দীপনভরা দীপ্ত অনুরাগ,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পড়শী-সেবী যাগ;
এমনতর প্রাণ যেখানে সৎ-উপাসক সেই, নতি চলে বিনয়-রাগে শ্রেষ্ঠ তাঁহাতেই।[১৯]

---

[১৭] মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, কাকলী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ.৭৭৩

[১৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ. ২৯৩

[১৯] ঐ. ঐ., পৃ.২৯৫

৫.৩ বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

‘বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক ব্যাপার। শূন্যবাদ নেতিবাচক ব্যাপার। ওটা কথা নয়। ঠিকমত চল, বল, কর, সেইটেই চলার পথ, তাতেই সার্থক হবে। এইই কথা। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষের বাদ আছে, সব একবাদ। তাহলো একনিষ্ঠ সাত্বত কর্মবাদ। তাতে ব্যষ্টি ও পরিবেশ ইষ্টকে কেন্দ্র করে সংহত, সংযত, ও সংবর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। তাই, বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্রেও আছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সজ্ঞং শরণং গচ্ছামি।’[২০] বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এরকমই ধারণা পোষণ করতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ইহুদী বা খ্রিষ্টানরা নবীকে গ্রহন না করায় যেমন ইসলাম পৃথক মতবাদ বা ধর্ম হিসেবে দাঁড়িয়েছে, তেমনি বুদ্ধদেবকে তখনকার হিন্দুরা গ্রহন না করায় পৃথক বৌদ্ধধর্ম দাঁড়িয়েছে। তবে দর্শনগত জায়গায় বৌদ্ধধর্মের সাথে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। হিন্দুরাও বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে দেখে থাকেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর তো স্বয়ং তাকে ভগবান বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তলিখিত একমাত্র গ্রন্থ ‘সত্যানুসরণ’-এর বাণীতে যেসব প্রেরিত-পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উদ্ধৃত করেছেন তিনি ভগবান বুদ্ধদেব। সত্যানুসরণের প্রথমেই দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। দুর্বলতা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি শারীরিক বা মানসিক অপটুতাকে। কিন্তু প্রকৃত দুর্বলতা কি, দুর্বলতার সাথে ধর্মরাজ্যের সম্পর্ক কি, দুর্বল কিংবা সবল হৃদয়ই বা কিরূপ প্রভৃতি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে সবল হৃদয়ের সুস্পষ্ট উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়—‘দুর্বল হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যাথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যাথা, বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙ্গে পড়া, এলিয়ে পড়া, বা কেঁদে আকুল হওয়া—ও-সব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক,তাদেও নজর নিরাকরণের দিকে; যাতে ও-সব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা—বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ঐ হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।’[২১]

---

[২০] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৫শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ২৫

[২১] *ঐ. ঐ.*, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ), পৃ. ৮

পরবর্তীতে আবার একদিন ক্ষাত্রভাব নিয়ে কথা ওঠায় তিনি উদাহরণস্বরূপ তিনি বুদ্ধদেবের কথা বললেন। প্রকৃত ক্ষাত্রভাব কিভাবে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে বললেন—'ঐ তো ঠিক-ঠিক ক্ষাত্রভাব—ক্ষত-ত্রাণী ভাব। ক্ষাত্রভাব বলতেই আমরা বুঝি মামুলি বীর্য্যবত্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রকমটাই বীর্য্যদৃপ্ত। রাজার ছেলে হ'য়ে ঐভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন, কঠোর সংকল্প নিয়ে জগতের কল্যাণের জন্য ঐভাবে অতন্দ্র তপস্যা করলেন, সে কি কম বীরত্ব? আবার, ওঁর মনের মধ্যে একটা ব্যাথা ছিল—মা মারা গিয়েছিলেন অত ছেলে বয়সে, তাই সেই ব্যাথাই যেন sublimited (ভূমায়িত) হ'য়ে গিয়েছিল। জরা, মৃত্যু, ব্যাধির দৃশ্যে মন তাঁর চঞ্চল হ'য়ে গেল—কারও যেন অমন কষ্ট না হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামচন্দ্র প্রত্যেকের জীবনে ক্ষাত্রভাবের এক-এক বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়।'[২২]

অন্যান্য প্রেরিতপুরুষের জন্মতিথির ন্যায় ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি বা বুদ্ধপূর্ণিমাকেও শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেন। একবার এক বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'আজ মহাপুণ্যতিথি। এই তিথির তাৎপর্য্য স্মরণ ক'রে, যদি ভগবান বুদ্ধের আলোকে আজকের দিনে নিজ ইষ্ট সম্বন্ধে গভীরভাবে জপ, তপ, ধ্যান, ভজন ও স্বাধ্যায় করা হয়, তবে তার ভিতর-দিয়ে অনেক মাল পাওয়া যায়। মদ্ গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরু- এটা সম্বন্ধে বাস্তব অনুভব যত বাড়ে, প্রত্যয়ও তত পাকা হয়।'[২৩]

অহিংসা পরম ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্রই হল অহিংসা। আর বুদ্ধদেব এই অহিংসার বাণী নিয়েই তাঁর মতাদর্শ প্রচার করে গেছেন। 'অহিংসা পরম ধর্ম' এটিই বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হল কিভাবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে তখনকার পরিবেশগত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'প্রেরিত পুরুষেরা যেমন সমীচীন মনে করেন, সেইভাবে যুগের প্রয়োজন পুরণ করেন। প্রফেটরা ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের আদিষ্ট। তাঁদেও পাঠান যখন যেমমন প্রয়োজন হয়। তাঁরা কাজ করেন বিশ্বজনীন নীতির সঙ্গে যোগ রেখে। যেমন বুদ্ধদেব যখন এসেছিলেন, তখন দেবতার কাছে নৃশংসভাবে জীব বলি দিত। শুনেছি মানুষ পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে বলি দিত। তিনি প্রথমে বুলি

---

[২২] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ৪৬

[২৩] ঐ. ঐ. *(১৭শ খণ্ড)*, পৃ. ২৬৫

ধরেন—'জীবহিংসা করো না।' পূর্ববর্তীকে ঠিক রেখে অহিংসাকে মূখ্য রেখে বাণী ও নির্দেশ দিতে লাগলেন। 'জীবন নাশ করো না'- এইটেই ছিল তাঁর কাছে মূখ্য ধর্ম।'[২৪]

আবার বললেন- 'অহিংসা যেখানে সপরিবেশ নিজের সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে সর্ব্বতোভাবে পুষ্ট করে সেখানেই তা সার্থক হয়ে ওঠে, আর তা যে পরম ধর্ম সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সত্তাকে হনন না করা যদি পরম ধর্ম হয় তবে সত্তাহননী যা তাকে বিহিতভাবে নিরোধ করাও পরমধর্মের অঙ্গীভূত। আমরা যদি জীবনপ্রেমী হই তবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চিরকালই চলবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, তবে সহজেই সব বোঝা যায়।'[২৫] তাই অহিংসা কেবল হিংসা না করা নয়, বরং হিংসাকে হিংসা করা অর্থাৎ সত্তাহননী যা তার নিরোধ কিংবা মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এও অহিংসার অন্যরূপ।

আবার বুদ্ধদেবের যে অষ্টশীল আছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে সেগুলো সব মিলে একটা সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়, আর তা হল অস্তিত্বপোষণ ও তাঁর বৃদ্ধি অর্থাৎ বাঁচা ও বাড়া। এসম্পর্কে বললেন, 'সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদবাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক সমাধি আলাদা-আলাদা ব্যাপার নয়। সবগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে। ফলকথা, আটটা মিলে যেন একটা। প্রধান কথা হলো, যা কিছু করব তা যেন সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বপোষণী হয়, বৃদ্ধিবাহী হয়। আর তার মূলে আছে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনতি-সম্পন্ন হতে হবে। তাঁর নীতি-বিধিকে আশ্রয় করে চলতে হবে।'[২৬]

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে বুদ্ধদেব বর্ণধর্ম মানতেন, আর্যকৃষ্টি মানতেন। তিনি আর্যসত্য, আর্যসত্য করে অতো বলেছেন—আর্যকৃষ্টির উপর তাঁর সব কিছু ভিত্তি। তিনি গৃহীদের জন্য গৃহীদের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, আবার ভিক্ষুদের মত জন্য ভিক্ষুদের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন। গৃহীদের বিয়ে-থাওয়া, চাল-চলন সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, তার সঙ্গে বর্ণাশ্রমের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম চাপা পড়ে গেছে। বিশেষ করে সম্রাট অশোক দীক্ষাগ্রহনের পর বৌদ্ধধর্মের যে রূপ দিয়েছেন তাতে বর্ণাশ্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,'বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম এবং অশোকের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ঢের তফাৎ আছে।'[২৭]

---

২৪. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ৭৮

২৫. ঐ. ঐ. *(১২শ খণ্ড)*, পৃ. ১০২

২৬. ঐ. ঐ. *(১১শ খণ্ড)*, পৃ. ১৪৮

২৭. ঐ. ঐ. *(১৬শ খণ্ড)*, পৃ. ৬২

অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে ভগবান বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের প্রচলিত বৈষ্ণবমত, শৈবমত বা শাক্তমত থেকে পৃথক এক মতবাদ বা ধর্মমত তৈরী করেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মদর্শনে বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম মূলত একই। নির্বাণ-লক্ষ্যে এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এপ্রসঙ্গে তিনি গৌতম-বুদ্ধের নির্বাণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের নির্বাণের ভাব নিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন - 'এক কথা বিভিন্নভাবে বলা। বিরোধ নেই। একজন কয় নেতি, একজন কয় ইতি।...... বুদ্ধদেব বলেছেন- তৃষ্ণার একান্ত নির্বাণ হোক। চৈতন্যদেব বলেছেন- ওসব আমি বুঝি না। আমার তৃষ্ণা তাক আর যাক কিছুই জানি না। আমি তোমাকেই চাই- এই আমার একান্ত তৃষ্ণা। তুমি ছাড়া আমার আর কোন তৃষ্ণা নাই। দুটোই মূলত এক কথা। ঘুরে-ফিরে নির্বাণই দাঁড়ালো। চৈতন্যদেবের ভাবটাই তৃষ্ণা নির্বাণের সহজ পথ।'[২৮]

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন বুদ্ধদেবকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়, তার মানে সার্বিক বোধির সত্তা। তিনি নিজের বোধির উপর দাঁড়িয়ে সকলের বোধিকেও জাগ্রত করার প্রয়াস করে গেছেন আজীবন। তাই তিনি নিজে যেমন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তেমনি লোককল্যাণার্থে আমাদের জন্যেও শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাজিয়ানদের প্রতি শ্রীবুদ্ধ নির্দেশিত নিম্নলিখিত সমৃদ্ধির সাতটি পথকে গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।[২৯]

ক) বাজিয়ানরা একত্রে সম্মিলিত হতে অভ্যস্ত থাকা
খ) ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা
গ) নূতনত্ব না করে অনুশাসন মেনে চলা
ঘ) প্রাচীনের উপর অভিঘাত না করা
ঙ) স্ত্রীগণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া
চ) দেশের দেবমন্দিরসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল রাখা এবং তা যথাযথ সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখা এবং
ছ) দেশের অর্হৎগণের প্রতিপালনের জন্য সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করে যথোচিত ব্যবস্থার আয়োজন করা।

---

২৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৮শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ২৬০

২৯. ঐ. ঐ. *(২য় খণ্ড)*, পৃ. ১৯২

৫.৪ খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর

‘আর্য্যধারা যদি জীবন্ত থাকত তাহলে হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ হয়ত একাদশ অবতার, দ্বাদশ অবতার বলে পরিগণিত হতেন।’[৩০]-এ উক্তি থেকেই অনুমান করা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভু যীশুকে এবং খ্রিষ্টধর্মকে একান্ত নিজের মনে করতেন। চরিত্রবান মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যীশুর উদাহরণ দিয়েছেন: কিভাবে মেরী ম্যাগডালিন যীশুর দ্বারা চরিত্রকে গঠন করলেন এবং শেষ সময়ে যীশুকে সবচেয়ে বেশি তিনিই ভালবেসেছেন। যখন সবাই প্রভুযীশুকে ছেড়ে গেলেন, তখনও কিন্তু ম্যাগডালিন তাকে ছেড়ে যাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে বর্তমান বিশ্বের অশান্তি ও দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে আদর্শপ্রাণতার অভাব। যীশুর ন্যায় একজন মূর্ত্ত আদর্শের প্রতি প্রকৃত টানের অভাবকেই এখানে মূখ্য করে দেখিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আর মূর্ত্ত আদর্শে নিষ্ঠা ছাড়া চরিত্র গঠন সম্ভব নয়। অন্য যেকোন কিছুর চেয়েও তাঁকে অকাট্যভাবে ভালোবাসা যখন হয়, তখন তাঁর জন্য জগতের সব কিছুকেই ভালোবাসা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেছেন- “You are for the Lord, not for others; You are for the Lord and so for others.”[৩১] এমনিভাবে যীশুর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তির শিক্ষা নিয়ে ক্যাপেল ব্রিটন নামক এক ইংরেজ যুবকের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—‘প্রভু যীশু হলেন মূর্ত্ত প্রেম, তাঁর প্রতি যত আমাদের টান বাড়ে, ততই তা ছড়িয়ে পড়ে জগতের উপর। নইলে ভালবাসার অনুশীলন করতে চাইলেও করা যায় না, প্রবৃত্তির পাল্লায় পড়ে বালবাসা বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তার বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না।..... আর, জগতে যে আজ এত অশান্তি ও দ্বন্দ্ব, তার কারণ আদর্শকেন্দ্রিকতার অভাব। প্রভু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে যদি আমরা চলতাম, আর মানুষকে যদি তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারতাম, তাহলে এ-অবস্থার সৃষ্টি হতো না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ হয়ে উঠতো। কেউ কাউকে মারার কল্পনা করতো না। অন্যকে মারা মানেই তো নিজের বাঁচার ভিত্তিভূমিকে ক্ষয় করে ফেলা। ..... মনে রাখতে হবে, যাঁরাই তথাগত, তাঁরাই bedewed with the attributes of Providence, আর তাঁরাই Christ. Christ মানেই anointed.’[৩২]

---

[৩০] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ.১৫৪

[৩১] Sri Sri Thakur Anukul Chandra, Magna Dicta, Satsang Publishing House, Deoghar, India, 2015, P. 88

[৩২] ঐ. ঐ., পৃ.৪৫

মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে নিজের প্রাণকেও উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি প্রভু যীশু। তাঁর মৃত্যুতেও রয়েছে নবজীবনের উত্থান। একদিন যীশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'মৃত্যুও তাঁকে পরাস্ত বা নিবৃত্ত করতে পাারেনি। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও তিনি মানুষের মঙ্গল-প্রার্থনাই করে গেছেন। প্রাণ হারালেও তিনি তাঁর জীবনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি । এইখানেই তাঁর জয়।'[৩৩]

শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কিছু পাশ্চাত্য-খ্রিষ্টান শিষ্য ছিলেন, যেমনঃ এডমন্ড স্পেন্সার, রে আর্চার হাউজারম্যান, ইউজিন এক্সম্যান, ম্যাথু, মিস শিমার প্রমুখ অন্যতম। একদিন ম্যাথুর সাথে আলাপচারিতার সময় খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন- 'God the Father মানে সৃজনকর্তা, ও পালনকর্তা ভগবান, God the Son মানে তাঁরই নর-বিগ্রহ যিনি, যেমন যীশুখ্রীষ্ট; God the Holy Ghost মানে আমাদের জীবাত্মা বা সুরত। আমাদের জীবাত্মা যখন মূর্ত নারায়ণে যুক্ত হয়, তখনই আমরা পরমপিতাকে অনুভব করে ধন্য হই। পরমপিতা, পরমস্রষ্টা ও পরমপালয়িতার স্বরূপ অবতার-পুরুষের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে, তাই সত্তার যোগাবেগ নিয়ে তাঁতে অনুরক্ত হতে হয়। তিনি অর্থাৎ God the Son-ই পথ। তিনি অজানদিগকে জানায় পৌঁছে দেন।.....এই জানা মানুষ যিনি, তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ করে সেই পরম জ্ঞেয়কে জানতে পারি আমরা।'[৩৪]

প্রত্যেক প্রেরিত চলে যাওয়ার পর তাঁর মতবাদ বিকৃত হতে শুরু করে। ঈশ্বরপুত্র যীশুর দেখানো শান্তির পথ, ভালোবাসার পথেও আজ অনেক বিকৃতি এসেছে। দ্বন্দ্ব এসেছে, হিংসা এসেছে, যুদ্ধ এসেছে। তাঁর নামে অন্যায় হচ্ছে। এসবের মূল কারণ তাঁর প্রদর্শিত পথের বিকৃতি। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন- "তাঁর (যীশুখ্রীষ্ট) জীবনই যে পৃথিবীর মহাসম্পদ, তাঁর একটা নিঃশ্বাসের বাতাসে জগতের যত মঙ্গল হয়, তার কি কূলকিনারা করতে পারি আমরা? তিনি বেঁচে থাকলে মানুষগুলোকে আরো কতখানি গড়ে দিয়ে যেতে পারতেন। খ্রীষ্টধর্মে অত তাড়াতাড়ি বিকৃতি আসতে পারতো না। তারপর ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনচলনা সম্বন্ধে আরো কত হয়ত বিশদ নির্দেশ পাওয়া যেত।'[৩৫]

---

৩৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ.৭৮

৩৪. ঐ. ঐ. *(৫ম খণ্ড)*, পৃ. ৭৩

৩৫. ঐ. ঐ., পৃ.৬৫

পবিত্র বাইবেলের অনেক বাণীর ব্যাখ্যাই বিকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য পন্ডিত জেমসের সমর্থনে পবিত্র বাইবেলের সেরকম একটা বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বাইবেলে বলা আছে, ‘Resist no evil.’ অর্থ অসৎকে প্রতিরোধ করো না। সৎ-এর সংস্থাপনের লক্ষ্যে যাদের জন্ম, সেই প্রেরিতপুরুষ এমন কথা বলতে পারেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—“আমার মনে হয়, বাক্যটার মধ্যে punctuation–এ ভুল আছে। জেমস্ যেমন বলেছেন- ‘Resist, no evil.’ অর্থাৎ নিরোধ কর, অসৎ-এর অস্তিত্ব থাকবে না। অসৎকে যদি নিরোধ না করি, তাহলে অস্তিত্বধর্মী আমরা যে বিলীন হয়ে যাব। যীশুখ্রীষ্ট, যিনি কিনা মানব-সত্তার উদ্ধাতা, তিনি অমনতর বলতে চেয়েছেন বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। আর তাঁর নিজের জীবনের আচরণ দেখেও তা বোঝা যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি তো বরাবরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই যে মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, মন্দিরের প্রাঙ্গনে ব্যবসাদাররা দোকান-পাট মেলে মেলা বসিয়ে ফেলেছে, সেখানে তিনি কেমন রুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন? এইটে কি resist না করার দৃষ্টান্ত? ..... ‘Resist no evil’ একথা যীশুখ্রীষ্ট ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর যে অন্যায় উৎপাত আসছিল, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন কিনা, সেটাও আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁর নিজের উপর অন্যায় হলে সেই অন্যায়ের সম্পর্কে তাঁর মুখ দিয়ে একথাটা বেরোন কিছু বিচিত্র নয়। ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে সেইটেই হয়ত অন্যভাবে চালিয়ে দিয়েছে।.....তাছাড়া evil -কে সবসময় সরাসরি Resist করাও যায় না। অসৎ-এর শক্তি যেখানে প্রবল, বিপুল ও পরাক্রমশালী, সুকৌশলে শক্তিসংহত না করে যদি সেখানে বেকুবের মত বিনা প্রস্তুতিতে হঠাৎ ঘা দিতে যাও, তবে তুমি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই, তাছাড়া তোমার উদ্দেশ্যও সফল হবে না।..... তাই আমিও বলেছি, Manage the evil for good.”[৩৬]

শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞানের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। যীশুখ্রিষ্টের জন্মকে তিনি অযোনীসম্ভবা মনে করতেন না। প্রকৃতপক্ষে অযোনীসম্ভবা বলতে কোন কিছুকেই তিনি গ্রহন করেননি। সেটি অন্য কারও বেলায়ও না। একে তিনি প্রক্ষিপ্ত চিন্তা বলেছেন। এতে মানুষ বিকৃত চিন্তার অনুসরণ করা শুরু করে। যা অস্বাভাবিক, প্রকৃতি বিরুদ্ধ, কল্পিত তা সে যে ধর্মেরই হোক তিনি সেগুলোরই যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে প্রভু যীশুর জন্মকাহিনীও একটি।

---

৩৬. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ১৪২

ভক্ত ম্যাথুর সাথেই আলাপচারিতার একপর্যায়ে প্রভুযীশুর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ‘আমার মনে হয় যে যীশুর মা মেরী যখন অবিবাহিত ছিলেন তখন থেকে জোসেফের সঙ্গে ভালবাসা ছিল, যার ফল যীশু। উভয়ে উভয়কে পবিত্রভাবে ভালবাসতেন ভগবদ্বিশ্বাসী প্রাণে, আর পরিস্থিতির দুঃখদৈন্য নিরাকরণ-সম্বন্ধে উভয়ের মিলিত আগ্রহ সেই ভালোবাসাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। পিতামাতার এই সাত্ত্বিক ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে রূপ ধরেছিল যীশুতে।..... ঋষিরা বাগদানকেই প্রকৃত বিবাহ বলেন। সেই বাগদান হবার পর মেরীর গর্ভসঞ্চার হয়েছিল হয়তো। আর আনুষ্ঠানিক বিবাহ পরে হয়েছিল। এতে ন্যায়তঃ-ধর্মতঃ অধর্ম কিছু হয়নি। কিন্তু সামাজিক প্রথার সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় পাছে এই নিয়ে কোন কথা ওঠে, কিংবা যীশুর স্বাভাবিক জন্ম দেখালে তাঁর ভগবত্বের কোন হানি হয়, এই ভেবে তাঁকে হয়তো অযোনী-সম্ভব বলে দেখানো হয়েছে।’[৩৭]

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর খৃষ্টান শিষ্যদের কখনো ধর্মান্তরের শিক্ষা দেননি, কূল-কৃষ্টি ত্যাগের শিক্ষা দেননি বরং বলতেন আমি তোমাদের যীশুর প্রেম কেমন ছিল তা বোঝাতে পারি মাত্র। তাই আমেরিকান ভক্ত হাইজারম্যানদা যখন ধুতি-পাঞ্জাবী পরতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তা পছন্দ করতেন না। হাউজারম্যানদার উপলব্ধিতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে লেখেন এক বিস্ময়কর গ্রন্থ “Ocean in a Tea Cup” (চায়ের পেয়ালায় মহাসমুদ্র)[৩৮]। আরেক ভক্ত স্পেন্সারদার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল- আপনি ঠাকুরের মধ্যে কি দেখেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং কেবলমাত্র ভালোবাসা। এমনিভাবে প্রভুযীশুকে প্রতিমুহূর্তে আপূরিত করে গেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে হাজারো মতের আবর্তের মধ্যে খেই হারানো মানুষকে পথের দিশা দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রেরিত-পুরুষোত্তম যীশুর সেই আহ্বান। তাঁর ভাষায়- ‘সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথই একমাত্র পথ। হাজারো মতের আবর্তের মধ্যে পড়ে মানুষের খেই হারিয়ে যায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন পরমপিতার দূত এসে বলেন—I am the way, the truth, the goal, none can, come to the Father but by me.’[৩৯]

---

৩৭. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ.৬৯ *(৪র্থ সং)*

৩৮. রে আর্চার হাইজারম্যান(জুনিয়র), *ওস্যান ইন এ টি কাপ*, সৎসঙ্গ চার্চ, কলকাতা, ২০০৯, অনুবাদঃ ছবি রাণী গোস্বামী

৩৯. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৮ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ.৬০*(৪র্থ সং)*

৫.৫ হিন্দুধর্মে অপরাপর প্রেরিত সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর

ভারতবর্ষে প্রচারিত সনাতন হিন্দুধর্মে বহু ধর্মবেত্তাপুরুষ থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কথাই বেশি বলেছেন যারা সমন্বয়ের মূর্তপ্রতীক এবং যারা পূর্ব্বতনদিগকে মেনেছেন ও পরিপূরণ করেছেন, যেমন পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্র, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ। এছাড়াও সন্তধারার সাধক মহাত্মা কবীর, গুরু নানক, স্বামীজী মহারাজ, হুজুর মহারাজ, জালালউদ্দিন রুমী, মইনুদ্দিন চিশতি প্রমুখের কথাও তিনি বলতেন প্রায়ই। ভক্তশিষ্যদের মধ্যে বীরভক্ত হনুমান, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের কথাও মাঝে মাঝে উঠে এসেছে আলোচনায়।

পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীরামচন্দ্রই পুরুষোত্তমদিগের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে প্রাচীন। তাঁর সম্পর্কে জানর জন্য একমাত্র রামায়ণই ভরসা। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে বিভিন্ন সময়েই শ্রীরামচন্দ্র, ঋষি বশিষ্ঠ, মাতা সীতা, রাজা ভরত, বীরভক্ত হনুমান কিংবা ভক্ত বিভীষণের বিষয় উঠে এসেছে। তবে ভক্তির প্রসঙ্গে শ্রীরামের অনুগত ভক্ত হনুমানকেই শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তশ্রেষ্ঠ বলেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সময় বলতেন-শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন লোকরঞ্জনী রাজা।...লঙ্কায় সেই যুদ্ধের সময় অত লোকক্ষয় দেখে রামচন্দ্র বললেন, ‘তোমরা এরকম করো না। আমি আর যুদ্ধ করব না। আমি সীতা চাই না। এরাই যদি না থাকল তাহলে আমি সীতা দিয়ে করব কী![৪০]...আবার প্রজাদের সন্তোষ বিধানের জন্য মা সীতাকে বনবাসে দিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন পরিপূর্ণ বিজ্ঞানমনস্ক একজন ব্যক্তি। অবশ্য বিজ্ঞানের এমন সব অজানা সূত্র তিনি দিয়েছেন যে তাকে বিজ্ঞানবেদীও বলা যায়। বিভিন্ন সময়ে পৌরানিক কাহিনীতে বা রামায়নে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অতিরঞ্জিত ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণসঙ্গ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। যেমনঃ অহল্যা শাপমুক্তি, হনুমানের গন্ধমাদন আনা প্রভৃতি।

---

৪০. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ১৯৯৫, পৃ. ২

উদাহরণস্বরূপ একদিন অহল্যার পাষাণ-উদ্ধার বা শাপমুক্তির ব্যাপারে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন- ‘অহল্যা ছিলেন গৌতম ঋষির স্ত্রী। কিন্তু তিনি নিজের দুর্বলতাবশে ও অন্যের প্রলোভনে পাতিব্রত্য থেকে ভ্রষ্টা হন। তাতে গৌতম তাঁকে অভিশাপ দেন এবং তিনি পাষাণের মত হয়ে যান। পাষাণের মত হয়ে যাওয়া মানে, বোধশক্তি-রহিত হয়ে যাওয়া- যাকে বলে callous হওয়া। মানুষ পাপের পথে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের পথে চললে তাতে তার বুদ্ধি-বিবেচনা ও সাড়াশীলতা অনেকখানি নিরেট হয়ে যায়। ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা হ্রাস পায়, আস্তে আস্তে জবুথবুর মত হয়ে পড়ে। অহল্যারও তাই হয়েছিল। আস্তে-আস্তে জড়ত্ব এসে গিয়েছিল। অনেকদিন পর রামচন্দ্র যখন গৌতমের আশ্রমে আসেন, রামচন্দ্রের চরণ-স্পর্শে তাঁর শাপমোচন হয় অর্থাৎ পাপজনিত জড়ত্বমুক্ত হয়ে গতিশীল পবিত্র জীবনের অধিকারী হন। আমি যা শুনেছি, তাতে এমনতরই মনে হয়। মানুষ যত পাপই করুক, সর্বপাপবিনির্মুক্ত হতে পারে, যদি পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ-সংস্রবে তদনুপ্রাণনায় তন্মুখী চলনে ব্রতী হয়। চরণ স্পর্শ মানে চলন স্পর্শ। তাঁকে দেখে আমাদের চলন তাঁর চলন ছুঁয়ে চলা চাই। আমাদের চলনের মধ্যে যদি তাঁর চলনের পরশ ফুটে না ওঠে, তাহলে কিন্তু যতই সান্নিধ্যলাভ হোক না কেন, তাতে কিছু হবে না।’[৪১]

আবার রামচন্দ্রের সংস্পর্শে মন্ত্রী হনুমান কিভাবে প্রবৃত্তিমুখীনতাকে ত্যাগ করে বীরভক্ত হনুমান হয়ে ইষ্টস্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন, ভক্ত বা ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার সেসব উদাহরণ দিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন-“আমরা মহাপুরুষের কাছে যাই, তখন কিন্তু একটা আড়াল থাকে। আমরা কেউ চাই টাকা-পয়সা, কেউ চাই মান, বড়াই, আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেউ চাই নানা কামনা-বাসনার পরিপূরণ। ঠিক-ঠিক তাঁকে চাই না, চাই-তাঁর অনুগ্রহে নিজেদের উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণ করতে। হনুমানও প্রথমে ঐ-রকম বুদ্ধি নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু পরে মনটা ঘুরে গেল। রামচন্দ্রকে পূরণ করাই তার একমাত্র স্বার্থ হ’য়ে দাড়াল। তখন তার ঠেলায় পরিবেশও অনেকখানি ঠিক হ’য়ে দাড়াল। রাবন অতখানি prepared ও powerful (প্রস্তুত ও পরাক্রমশালী) হওয়া সত্ত্বেও, অনেকখানি হনুমানের বুদ্ধি, বিবেচনা, পরাক্রম ও পরিকল্পনার দরুণ রামচন্দ্রের জয় হয়ে গেল। ভক্তি থাকলে এমনতরই হয়।”[৪২]

---

৪১. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ২য় সংস্করণ *পৃ. ১৪৫*

৪২. *ঐ. ঐ. (১৭শ খণ্ড)*, পৃ.৮৪

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্র হনুমানের কৌশল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও তারিফ করেছেন। এসবই যে ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ সে সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-"ভালোবাসা মানে 'সখি আমায় ধর ধর' এমনতর ভাব নয়। গদগদ হয়ে হাপুস কান্না কাঁদছে, অথচ কয়েকটা তুলসীপাতা জোগাড় করে এনে দিতে বললে মন বেজার- একে ভক্তি কয় না। আর হনুমানকে বিশল্যকরণী আনতে বলা হলো, বিশল্যকরণী চেনে না, তাই মন্দ একেবারে গন্ধমাদন পর্বত ঘাড়ে করে নিয়ে এসে হাজির। ... কান্ড কি বোঝ একবার! এসব আজগবী কথা নয়। ভাল করে study (বিচার) করলে হয়তো দেখা যাবে, এই সব অসম্ভব সম্ভব করার মত scientific knowledge ও skill (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল) তার আয়ত্তে ছিল।"[৪৩] পরবর্তীতে শ্রীশ্রীঠাকুর গন্ধমাদন পর্বত ঘাড়ে করে নিয়ে আসার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তার ভাষায়- 'যেমন বাজার থেকে অনেক জিনিস নিয়ে আসলে বলে না একেবারে পাহাড় নিয়ে এসেছে! ঐরকম হনুমান সেখানে ওষুধের গাছগুলি যা পেয়েছিল- অধিকাংশ তুলে নিয়ে এসেছিল।'[৪৪] হনুমানের একলাফে সমুদ্র পার হওয়া নিয়েও বলেছেন যেহেতু ভারত ও সিংহলের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে, তাই সাঁতরে-সাঁতরেই পার হয়েছিল হনুমান। এভাবে তিনি প্রত্যেকটা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেখিয়েছেন।

আবার হনুমানের মুক্তোর মালা ছিড়ে ফেলে বুক চিরে রামনাম দেখানোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রশ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন- 'ওর তাৎপর্য্য হচ্ছে, মালার মধ্যে রামচন্দ্রের কাজে লাগে এমন কিছুই নেই। আর, আমার মধ্যে রামচন্দ্রের উপযোগী যা, তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ রকম উপমা থাকলে তার তৎপর্য্য ঠিকমত ভেঙ্গে না দেওয়া হলে অনেক সময় বিকৃতি ঢুকে যায়।' [৪৫]

বিকৃতি রোধ করতে মূল বাল্মিকী রামায়ণের সাথে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পার্থক্য থাকাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মূল বাল্মিকী রামায়ণ পড়তে উৎসাহিত করতেন। তা বোঝার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূল বাল্মিকী রামায়ণ অনুসারে রামচন্দ্র ভরতকে রাজকার্য্য ও রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি সম্বন্ধে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলোকে গুরুত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করেন।[৪৬]

---

৪৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১৫৩

৪৪. ঐ. ঐ., *দীপরক্ষী (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৭, ২য় সংস্করণ,পৃ. ১০২

৪৫. ঐ. ঐ., *দীপরক্ষী (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ২য় সংস্করণ,পৃ. ১৭২

৪৬. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৫ম সংস্করণ *পৃ. ১৪৩*

সবশেষে প্রসঙ্গক্রমে রাজা ভরতের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কতিপয় নীতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. তুমি গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে বহু-মন প্রদর্শন করে থাক তো?

২. বীর, বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ লোকদের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করেছ তো? তুমি তাদের সাথে মন্ত্রণা কর তো? তোমাদের মন্ত্রণা লোকের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে না তো?

৩. তুমি যথাসময়ে শয্যাত্যাগ কর তো? রাত্রিশেষে অর্থলাভের চিন্তা কর তো?

৪. তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ করেও একজন বিদ্বানকে সংগ্রহ করতে চেষ্টা কর তো? অযোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে ও যোগ্য লোককে অযোগ্যস্থানে নিয়োগ কর না তো?

৫. যেসব অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাদের পিতৃপুরুষ যোগ্যতার সাথে অমাত্যের কাজ করেছেন, যারা ভিতরে-বাইরে পবিত্র, সেই সব শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে শ্রেষ্ঠ কাজে নিযুক্ত করেছ তো?

৬. রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা অযথা উৎপীড়িত হয় না তো? শত্রুকে পরাস্ত করতে পটু, সাহসী, বিপদকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান, সৎকুলজাত, শুদ্ধাচারী, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করেছ তো?

৭. বিদ্বান, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিচক্ষণ এবং তোমার জনপদের অধিবাসীকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেছ তো? চরগণ পরস্পর-বিরোধী তথ্য পরিবেষণ করলে তার কারণ নির্ণয় করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাক তো?

৮. প্রজাগণ সুখে আছে তো? তারা দিন-দিন স্ব-স্ব কর্ম করে সমৃদ্ধ হচ্ছে তো?

৯. তোমার আয় বেশী, ব্যয় কম হচ্ছে তো? ধনাগার অর্থশুন্য হচ্ছে না তো? অপরাধীদের ধনলোভে ছেড়ে দেওয়া হয় না তো?

১০. তুমি সাম, দান, ভেদ ও দন্ডের প্রয়োগ যথাস্থানে করে থাক তো? তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতে সচেষ্ট থাক তো?

যোগেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

সনাতন হিন্দুধর্মে বিশেষত বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র ভগবান করেন অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। সাকার-নিরাকার এক করে ফেলায় অনেক ক্ষেত্রেই গোলমাল তৈরী হয়। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিভিন্ন পুরাণাদি বিশ্লেষণ করলে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূরণী ও ধর্মপালনী পুরুষোত্তমরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় এজাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার বিভিন্ন শ্লোকের সঠিক ব্যাখ্যা। বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও মিলেছে তার কাছে। মোটকথা যেসব বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় বা হয়ে থাকে তিনি সেসবের সুষ্ঠু সমাধান করেছেন।

মূর্ত্ত সাকার বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্বই বেশি দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন- ‘গীতার বাসুদেব কথাটা আমার খুব ভাল লাগে। আত্মা,পরমাত্মা বলে কথা নয়, বসুদেবের ছেলে বাসুদেবই আমার সব- এই হলো মোক্ষম কথা।’[৪৭] আবার বললেন-‘বসুদেবের ছেলে শ্রীকৃষ্ণ- রক্ত-মাংস-সঙ্কুল এই প্রতীকই যা-কিছু সব, এই বোধই চরম বোধ।’[৪৮]

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিশালী ঋত্বিক সংঘ ছিল বলেই তাঁর ধারা অনেকদিন টিকে ছিল এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-‘কেষ্টঠাকুর সারা ভারতকে এমন ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের প্রয়োজন উদ্ভূত হয়নি। তাঁরও ঋত্বিক সংঘ ছিল এবং এই ঋত্বিকসংঘই বৈশিষ্ট্যপালী দীক্ষা, শিক্ষা ও কৃষ্টির ধারাটা দীর্ঘকাল অনেকখানি অবিকৃতভাবে ধরে রেখেছিল।’[৪৯]

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়েছেন যে শুভ বা মঙ্গল উদ্দেশ্যই ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ্য। আর সেজন্য তিনি ছলনা বা কুটিলতার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর ভাষায়-‘কেষ্টঠাকুরের সম্বন্ধে কথা আছে- অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল। আবার, ঘৃণা-লজ্জার ভাবও থাকে না। বারবার চেষ্টা করে প্রতিহত হলেও প্রতিনিবৃত্ত হয় না।’[৫০]

---

[৪৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৯ম সংস্করণ, পৃ. ১১৭

[৪৮] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৯, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৮৮

[৪৯] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (১২শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৩

[৫০] ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র বললেন- ‘কেষ্টঠাকুরকে বলে চতুর-চূড়ামণি। কোন্ মানুষটাকে, কোন অবস্থাটাকে কেমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, তার কলাকৌশল তাঁর নখ-দর্পণে।...তাঁর প্রত্যেক কাজের পিছনেই ছিল কুশলকৌশলী মঙ্গলবুদ্ধি।’[৫১] আবার বললেন-‘তিনি সবাইকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগিতা না করে যারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শয়তানের আনুগত্য স্বীকার করলো, বিধিবশে তাদিগকে শয়তান-সেবার বিহিত ফল পেতে হলো।...শ্রীকৃষ্ণের গোটা জীবনটা দেখতে হয়। যাকে বলে- একেবারে ভগবান!’[৫২]

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পুরুষোত্তম কে এবং তাঁর স্বরূপ কি তা সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন-“পুরুষোত্তম সাধারণ মানুষের মতই জরাব্যাধি ও মরণশীল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর অব্যয়, অক্ষয় স্বরূপের স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হন না, তাই তিনি ক্ষর অর্থাৎ নাশশীল হয়েও তার অতীত, আবার অক্ষর পুরুষের যে অব্যক্ত অবস্থা, তার থেকে অক্ষরত্বের বাস্তব চেতনবিগ্রহরূপী পুরুষোত্তমের ব্যক্তসত্তা ঢের বেশী গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। ফলকথা, পুরুষোত্তমের আবির্ভাব যখন হয় তখন তাঁর মধ্যে যুগপৎ জীবের শ্রেয়-আকৃতির চরম বিকাশ ও ঈশ্বরের ধারণ-পালনী সম্বেগের পরমপ্রকাশ একাধারে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুরুষোত্তম মানে সর্ব্বোত্তম পূরণকারী।[৫৩]

বিশ্বরূপদর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের কল্পিত বিষয় প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের উন্মুক্ত প্রান্তরে। তাই তা কেবল অর্জুন দেখল কি করে? বাকীরা কেন দেখতে পেল না। অনেকে বলে থাকেন দিব্যচক্ষু দ্বারা। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণের সার্বিক জ্ঞানপ্রদানের পর তাঁর সম্পর্কে অর্জুনের মোহমুক্তি ঘটে, এ উপলব্ধি হয় যে তিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁর অজানা কিছুই নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- ‘অর্জুন সেটা আয়ত্ত করেনি, কেষ্টঠাকুর তাঁকে দয়া করে দেখিয়েছিলেন, তাই পুণরায় মোহগ্রস্থ হল। আবার দূর্যোধনও নাকি বিশ্বরূপ দেখেছিল, তা হয়তো সাময়িক। তার মনে একটা উচ্ছ্বস আসার ফলে হয়েছিল, কিন্তু তা চরিত্রে অর্শেনি। তাই পরে ভুলে গেল- নিজের অনুভবকেই সন্দেহ করল।’[৫৪]

---

[৫১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৫ম সংস্করণ *পৃ. ১১৮*

[৫২] *ঐ. ঐ.*, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৪শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৩য় সংস্করণ *পৃ. ১২*

[৫৩] *ঐ. ঐ.*, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ৪র্থ সংস্করণ *পৃ. ৮৪*

[৫৪] *ঐ. ঐ.*, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৯শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ২য় সংস্করণ *পৃ. ২৬৯*

অসৎ-নিরোধী হতে তাঁর ছলনার আশ্রয়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আবার ভীষ্ম যখন প্রতিজ্ঞা রক্ষাকেই একমাত্র ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম স্থাপনের জন্য, শরণাগতকে বাঁচানোর জন্য মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাখ্যা- ‘শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রথের চাকা তুলে নেওয়ায় ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তাই তিনি আশ্রিতের-রক্ষণের অন্তরায় স্বরূপ যে প্রতিজ্ঞা তা মুহূর্তে ভঙ্গ করতে পেরেছিলেন। ভীষ্ম ঐ দেখে বুঝলেন। বললেন-আমরা কতখানি সীমার মধ্যে আছি।’[৫৫] সুদর্শন চক্র নিয়েও আমাদের একটা প্রচলিত কল্পিত ধারণা আছে। সেপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-‘কেষ্টঠাকুরের ছিল সুদর্শন চক্র। চক্র মানে horizon (দিগন্ত), দূরে বা নিকটে যা-কিছু আছে, খুঁটিনাটি যা-কিছু (অন্তর্ভেদী দৃষ্টি) নিয়ে দেখেছেন-কিছুই তাঁর চোখ এড়াচ্ছে না। এ দর্শন বিধিপ্রসূত।’[৫৬]

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও গোবর্দ্ধন-ধারণ নিয়েও বিভিন্ন অবাস্তব উপাখ্যান প্রচলিত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার উদ্দেশ্য ছিল গোজাতির স্থিতি ও বর্দ্ধন।[৫৭] আবার গোবর্দ্ধন-ধারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, ‘গো মানে পৃথিবীও হয়। গোবর্দ্ধনধারী মানে, যিনি মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধির ধারক।’[৫৮]

গ্রন্থ হিসেবে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাকে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। বহুজনকে তিনি গীতা মুখস্ত করতে বলেছেন। পবিত্র পুণ্যপুঁথি গ্রন্থে তিনি গীতা ঠোটস্থ করতে বলেছেন। গীতার গান গেয়ে বেড়ানোর জন্য কতকগুলি বালক নারায়ণ তৈরী করতে বলেছেন। তিনি বললেন- ‘গীতা হল practical life-এর (বাস্তব জীবনের) কথা- আমাদের সাত্বত সম্বর্দ্ধনার জন্য। এটা science and philosophy combined (বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়)।[৫৯]...গীতার মত একখানা বই পাওয়া দুষ্কর। ওতে সংক্ষেপে সব আছে। আর, পড়লে আমাদের মত দুঃখ-পীড়িত সাধারণ মানুষ আশা-ভরসাও পায় খুব।’[৬০]

---

৫৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০১, ২য় সংস্করণ *পৃ. ২৬*

৫৬. *ঐ. ঐ. (১৯শ খণ্ড), পৃ. ৩৩২*

৫৭. *ঐ. ঐ. (১৮শ খণ্ড), পৃ. ৩০৮*

৫৮. *ঐ. ঐ. (১৯শ খণ্ড), পৃ. ৩৩১*

৫৯. ঐ. ঐ., *দীপরক্ষী (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০২, ১ম সংস্করণ *পৃ. ১৩০*

৬০. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (৮ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৪র্থ সংস্করণ *পৃ. ৮৫*

গীতায় অর্জুনের উক্ত একটি শ্লোকের বিকৃতি করে 'দ্বিভুজেন' শব্দের স্থলে 'চতুর্ভুজেন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে শ্রুতি আছে। গীতার এজাতীয় অপব্যাখ্যা নিয়ে বললেন-"চতুর্ভুজ কথা নিয়ে কতজনে কত ব্যাখ্যা করেছে তার অন্ত নেই। অথচ এর মানে হল- হে কৃষ্ণ! তুমি সীমায়িত হয়ে দেখা দাও। বাসুদেব বলে যেখানে বলেছেন সেখানেও বসুদেবের ছেলে এই অর্থগ্রহন না করে আমরা নানা দার্শনিক তত্ত্বেও অবতারণা করেছি। ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করার একটা ঝোঁক আমাদের পেয়ে বসেছে। অকাম যে কত করিছি তার ইয়ত্তা নেই- বহু কিছু undo(প্রতিকার) করা লাগবি।"[৬১]

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার প্রায় সম্পূর্ণই উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তন্মধ্যে তিনি ভক্তিযোগের শ্লোকসমূহ তাঁর খুব প্রিয় ছিল।[৬২] এছাড়াও মোক্ষযোগের কিছু শ্লোকসহ বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোক বা শ্লোকাংশ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেসবের যুগানুপাতিক সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য শ্লোক বা শ্লোকাংশসমূহ হল:

১. কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি
২. ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াং প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
৩. নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।
৪. বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যন্তে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।
৫. তেষাং জ্ঞনী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে
৬. অব্যক্তাং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।
৭. মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা। আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।
৮. ক্লেশোহধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।
৯. যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম
১০. সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।
১১. যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ
পুরুষোত্তমঃ।।

---

[৬১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ৪র্থ সংস্করণ *পৃ.* ৬৬

[৬২] *ঐ. ঐ. (৫ম খণ্ড), পৃ. ১৯৫*

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

‘যার যারে ভালো লাগে সে তারে ভজুক গো
আমার কিন্তু ভালো লাগে শচীর দুলাল গোরা গো।’

শ্রীচৈতন্যদেব প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই এই ছন্দটি বলতেন। আর এতেই বোঝা যায় প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বিশেষ টান ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে তাঁর আলোচনায়। এর মধ্যে প্রবল শক্তিসমন্বিত প্রেমের কথা উঠে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়-‘চৈতন্যদেবও জগাই-মাধাইয়ের উপর কেমন উগ্রভাব ধারণ করে তাদের অন্তরে ত্রাস ও অনুতাপ জাগিয়ে তবে প্রেম দেখিয়ে তাদের অন্তর জয় করেছিলেন। তাদের উগ্রদম্ভ, দর্প ও প্রবৃত্তি-উন্মত্ততাকে স্তব্ধ না করে, আয়ত্তে না এনে গোড়ায় প্রেম দেখাতে গেলে সে-প্রেম তারা ধরতে পারত না। হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত।’[৬৩] ...‘যারা নিজেরা properly adjusted, integrated ও powerful (যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত, সংহত ও শক্তিমান) নয়, তাদের কথা অন্যে শুনতে চায় না। আমার মনে হয়, জগাই-মাধাই যখন দেখলো যে বৈষ্ণবরা অতো integrated ও powerful (সংহত ও শক্তিমান), তাদের অতোখানি regard (শ্রদ্ধা) নিত্যানন্দের উপর, তখন ওরা ভড়কে গেল। ভাবলো- যদি সবাই মিলে একটা করে চুল ছিড়ে নেয়, তাহলেও টিকতে পারবে না। অন্তরে ভয় জাগায় নরম হলো, তারই সঙ্গে সঙ্গে জাগলো কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা। তাই প্রেম যদি শক্তি-সমন্বিত না হয়, তাহলে শুধু নীতিকথা বা মিঠেবুলিতে মানুষের দুরিতবুদ্ধি দমিত হয় না।’[৬৪]

অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবকে দ্বৈতবাদী বলে শ্রীশঙ্করাচার্যের থেকে তাঁর মতবাদের একটা পার্থক্য দেখান। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে পুরুষোত্তম তাঁর পূর্বতনদের পরিপূরণ করে থাকেন, তাই শ্রীচৈতন্যদেবও শঙ্করাচার্য্যকে পরিপূরণ করেছেন। কিভাবে দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদকে পরিপূরণ করতে পারে সে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-‘আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতভাব। মূলতঃ সকলের বাদই অদ্বৈত, কারণ, একের উপরই দাঁড়িয়ে আছে যা-কিছু, আদিতে এক ছাড়া দুই নেই। একেরই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ নানাস্তর ও অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু ভক্তিই তাঁকে লাভ করার সহজ পথ। ভক্তির মধ্যে দ্বৈতভাব এসে পড়ে, ভক্ত নিজের সত্তা না হারিয়ে ভগবান-

---

[৬৩] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৯ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৪র্থ সংস্করণ *পৃ. ৮*

[৬৪] *ঐ.ঐ. পৃ. ১৪৭*

কে ভজনা করে চলে। ভক্তির সঙ্গে আবার কর্ম ও জ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে জড়ান। একেরই বিচিত্র প্রকাশ বলে সব সমন্বয় হয়েই আছে।...কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, যা-ই বল, ভক্তির সঙ্গে যোগ না থাকলে কাজ হয় না, সব যোগই আসে ভক্তিযোগ থেকে। বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। এই জ্ঞানী একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মী। গোড়া থেকেই অদ্বৈতবাদ গাণিতিকভাবে সম্ভব হতে পারে, বাস্তবে সম্ভব হয় কমই।... আবার দ্বৈতভাবটা থাকার দরুন বিপদটা আসে কম, তথাকথিত অদ্বৈতবাদীর মত অহংকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভাবে না, অহংটা তাতে কাবু থাকে।'[৬৫]

এজন্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈদান্তিক জ্ঞানীরাও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট ভক্তিভাবের শিক্ষালাভ করেছেন। অন্যের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিভাব অনুসরণ করতে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন- 'চৈতন্যদেবের ভাবটা নিয়ে চলতে হয়। তিনি যেমন সার্ব্বভৌমের সাত রকম ব্যাখ্যা সশ্রদ্ধভাবে শুনেও পরে আবার আঠারো রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন- সবগুলিকে স্বীয় আদর্শে কেন্দ্রায়িত করে তুলে, আমাদেরও তেমন সবার সঙ্গে মিষ্টি, গাম্ভীর্য্য ও সৌজন্যপূর্ণ, সশ্রদ্ধ, সম্বর্দ্ধনী, ব্যবহার করতে হয়- সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, নিষ্ঠায় রফাপ্রবণ না হয়ে, নিজ দাঁড়ায় অচ্যুত থেকে- নিষ্ঠায় কেন্দ্রায়িত করে প্রতিপাদ্য যা কিছুকে।'[৬৬]

অনেকে মহামতি বুদ্ধদেবের সাথে শ্রীচৈতন্যদেবের মতের পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের উভয়ের গতি বা লক্ষ্য এক। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, 'বুদ্ধদেব বললেন- তৃষ্ণার অপলাপ কর, তৃষ্ণাকে মিটিয়ে ফেল। গৌরাঙ্গদেব বললেন- তোমার তৃষ্ণার একমাত্র কেন্দ্র হউন তিনি। কোন তিনি? তার উত্তরে বলে দিলেন-

শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।'[৬৭]

---

[৬৫] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৩শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩, ৩য় সংস্করণ *পৃ.১০০*

[৬৬] *ঐ. ঐ. (১৭শ খণ্ড), পৃ.১৪৬*

[৬৭] *ঐ. ঐ. (১৬শ খণ্ড), পৃ.৪০*

অন্যত্র বললেন-'মহাপ্রভুর ঊর্জ্জী ভক্তির কথা, প্রেমের কথা, নিরভিমানতার কথা শুনতে-শুনতে আমাদের ভেতরে একটা ভাল লাগার বোধ আসে।[৬৮]...গৌরাঙ্গদেবকে বুঝতে গেলে যীশুকে বোঝা লাগে। ভাবানুকম্পিতার উপর দাঁড়িয়েই তাঁর সমস্ত দর্শন গড়ে উঠেছে।'[৬৯]

পরিশেষে শ্রীচৈতন্যদেব বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে **১৯৫৯** সালের দোলপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে আমরা তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারি। তিনি বললেন- 'এটা হল পূণ্যদিন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। তিনি যা যা করেছিলেন,তা না করলে তো এ দিনটি পালন করা হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য কত অবতার পুরুষ এলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের পথ অনুসরণ করলাম না। হনুমানের পূজা করি, কিন্তু হনুমানের চরিত্র আমাদের নেই। ঐসব ভাব যদি আমাদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরাও ঐ রকম থৈ থৈ করে নাচতে পারি, আমাদের আশপাশকেও নাচাতে পারি- সব অসৎ দূর করে।'[৭০]

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুর যাদের তাঁর অব্যবহিত পূর্বতন প্রেরিত মনে করতেন তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুর সবচেয়ে নবীন, সবচেয়ে অল্প প্রাচীন। শ্রীশ্রীঠাকুর মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষ সঠিকভাবে চিনতেই পারেনি, আর দর্শনও মানুষ বুঝতে পারেনি। তিনি বারংবার শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'অবতার-মহাপুরুষদের কথা বলে, কিন্তু রামকৃষ্ণঠাকুরের মত এমন একজন সহজ মানুষ আর দেখি না।... লোকে ভগবান মানেই বোঝেনা, একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা নিয়ে চলে- কি যে করে, তাই কিছু হয় না।'[৭১]...'রামকৃষ্ণঠাকুর যে কী দিয়ে গেলেন, কেউ বুঝলো না। অনেকে তাকে নকল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু নকল করে কি আর তা হওয়া যায়?'[৭২]

---

৬৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৭, ২য় সংস্করণ *পৃ.* ১৩৬

৬৯. *ঐ.ঐ. পৃ. ১৪২*

৭০. ঐ. ঐ. *(৫ম খণ্ড)*, *পৃ. ৭*

৭১. ঐ. ঐ., *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৯ম সংস্করণ *পৃ. ১*

৭২. ঐ.ঐ. *পৃ.৮*

অন্যত্র বলেছেন, 'রামকৃষ্ণ ঠাকুর স্বয়ং ভগবান। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) যেমন বলেছেন- 'You have seen me and you not seen God!' (তুমি আমাকে দেখেছ অথচ পরমপিতাকে দেখনি, এ কেমন কথা!) অর্থাৎ তাঁকে তেমনভাবে দেখলেই ভগবানকে দেখা হয়।'[৭৩] (১১/৯২)

পরবর্তীর মধ্যে ছাড়া পূর্ববর্তীর সঠিক রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না, এ প্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উদাহরণ দিয়েছেন- "রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সময় কেষ্টঠাকুরকে বুঝতে গেলে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ভিতর দিয়ে ছাড়া বোঝার উপায় নেই।"[৭৪] শ্রীকৃষ্ণের সাথে তুলনা করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'রামকৃষ্ণদেব অমনি ছিলেন।...প্রীতির সঙ্গে বলতেন, সকলেরই ভাল লাগত। আবার কঠোর কথাও মিষ্টি করে বলতে পারতেন, স্পষ্টবাদী মিষ্টভাষী মত ছিলেন।'[৭৫] অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকেই যুগোপযোগীভাবে পরিপূরণ করেছেন, তাকে ভিন্ন নতুন কোন মত খাড়া করেননি।

অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধারণ সাধক হিসেবে দেখেন। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে তাঁর সাধনা অন্য সাধকদের মত একাকী-নির্জন-জনবিচ্ছিন্ন ছিল না, তা ছিল মানুষের জন্য, মানুষ ছাড়া কিছু বুঝতেন না তিনি। তাঁর ষোল থেকে পয়তাল্লিশ বছর পর্য্যন্ত নির্জন সাধনা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "লোকগুরু হিসেবে সাধনা যেমন করেছিলেন তেমনি ঐ পরিবেশের মধ্যে প্রয়োজনমতো নিজের অভ্যাস-ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, সব-কিছুকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির অনুকূল ক'রে তুলেছিলেন। সমস্ত সত্তা মায় প্রতিটি রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ঈশ্বরপ্রাণ ক'রে না তুললে ঈশ্বর লাভ হয় না। চিন্তা যদি চলনকে নিয়ন্ত্রিত না করে, সমাধান যদি চরিত্রে দানা না বাঁধে, সে সমাধান কথার সমাধান হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কাজের কিছু হয় না। রামকৃষ্ণদেবের কথাগুলি যে মানুষকে এমন ক'রে নাড়া দেয়, তার কারণ তাঁর প্রত্যেকটি কথাই জীবন চোয়ান কথা।"[৭৬]

আবার মায়ের সাধনার ক্ষেত্রেও গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মায়ের উপর অগাধ টান ছিল, তাই তিনি জগন্মাতাকে পেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গের সমর্থনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-'যে মায়ের পেটে জন্মেছ, তাকে বাদ দিয়ে জগতের মাকে পাওয়া হয় না। যার কাছে

---

৭৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ৪র্থ সংস্করণ, *পৃ.৯২*

৭৪. *ঐ. ঐ. (১ম খণ্ড), পৃ. ১০৬*

৭৫. *ঐ. ঐ. (১৭শ খণ্ড), পৃ.২২*

৭৬. *ঐ.ঐ. পৃ.১১৮*

তার মার ছবিখানা ঠাঁই পায় না, জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় না, তার কাছে মা-কালী জীবন্ত হবেন কী করে?'[৭৭]'আমার মনে হয়, তাঁর মার (ভূমায়িতি) হয়েছিল কালীতে, তাই কালীকে অমন করে ধরতে পেরেছিলেন। আমার তো তাই হতো- কালী, দূর্গা, সব-কিছুর (কেন্দ্রায়িনী বিন্দু) যেন আমার মা। আর মারই (ভূমায়িতি) যেন তাঁরা।'[৭৮]

পুরুষোত্তম বা প্রেরিত পুরুষের বৈশিষ্ট্য কেমন হয়, তাঁরা কাদের জন্য আসেন, তাঁদেরকে চিনতে হয় কিভাবে, অন্য সাধারণ সাধকদের সাথে তাঁদের পার্থক্যই বা কি এসব প্রশ্নের সমাধান দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরের উদাহরণ দিতে দেখা যায়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন- 'যে-কোন জাতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হোক না কেন, সে আবির্ভাব সবার জন্যই। রামকৃষ্ণদেব শুধু বাংলার জন্য নন, শুধু ভারতের জন্য নন, তিনি সারা জগতের জন্য, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবার জন্য। তিনি আসেন এক জায়গায়, এক জাতির মধ্যে। কিন্তু আসেন সবার পরিপূরণ-মানসে। আর, এই পরিপূরণ করতে গিয়ে কারও বৈশিষ্ট্যে আঘাত তো করেনই না, বরং তাকেই আরও উজ্জীবিত ও উদ্বর্দ্ধিত করে তোলেন। তাই জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যে-কেউ তাঁকে গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে।'[৭৯]

আবার বললেন- 'বাঙ্গালীর মত এমন জান আপনি আর পাবেন না। গলদ ঢুকেছে দুটো জায়গায়, তাই যদি ঠিক করতে পারেন তবে হয়- প্রথম দোষ হচ্ছে পূর্ব্ববর্তীকে মানে না এমন লোককেও গুরু বলে মানি- তাই বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, এ মিশন, সে মঠ, অমুক আশ্রম, তমুক সংঘ- ইত্যাদি কত দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা কিনা এক সূত্রে সংহত নয়। সত্যিকার গুরু যিনি তার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেককেই trace (বের) করা যাবে- এ একেবারে map (মানচিত্র) দেখার মত- যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলে ধরা যাবে এই এখানে শ্রীকৃষ্ণ, এই বুদ্ধ, এই যীশু, এই মহম্মদ, এই গৌরাঙ্গ- পরিষ্কার বোঝা যাবে সবাইকে- তাঁর মধ্যে সবারই দেখা মিলবে। এই না হলে তিনি গুরু হবার উপযুক্ত নন- তখন হাজার মতের লোক থাকলেও কিছু এসে যাবে না। আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণ বা তজ্জাতীয় মহাপুরুষকে না মেনে, অস্বীকার করে বা অপমান করেও মানুষ গুরুর আসনে বসতে পারে, এর চেয়ে দুরবস্থা আর কী হতে পারে?'[৮০]

---

[৭৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, ২য় সংস্করণ *পৃ.৭৯*

[৭৮] ঐ.ঐ. পৃ. ১৭৪

[৭৯] *ঐ. ঐ. (৯ম খণ্ড), পৃ. ৫৩*

[৮০] *ঐ. ঐ. (১ম খণ্ড), পৃ. ৭৩*

পরিশেষে আর একদিনের উক্তি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের অনুভূতি কতটা জাগ্রত ছিল। একদিন রামকৃষ্ণদেবের কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিগলিত কণ্ঠে মুগ্ধ-মদিও আগ্রহে অপূর্ব ভঙ্গীতে হাতখানি নেড়ে আবেগভরে বললেন- 'মুখ্যু বামুন যা বলে গেছেন, অমন আর কারও বলবার যো নেই, অমন পরিবেষণ কেউ করতে পারবে না।'[৮১]

৫.৬ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেক প্রেরিতকেই একই রূপের বিভিন্ন প্রকাশ এবং তাঁরা প্রত্যেকে একই বাণী প্রচার করেছেন বলে মনে করতেন। এ বিশ্বজগতে খোদা বা ভগবান একজনই আর তার প্রবর্তিত ধর্মও একটি। তাই ধর্মান্তরিতকরণ বলে কোন শব্দ থাকতে পারে না। কারণ সকল ধর্মই যদি এক হয়, তাহলে তো ধর্ম ত্যাগও থাকে না, ধর্মগ্রহনও থাকে না। আর সনাতন ধর্মের মধ্যে সবের সমন্বয় আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়-"সনাতন ধর্মের মধ্যেই সব আছে। আদি থেকে ধর্ম চিরদিন সমান। সনাতন ধর্মই সব ধর্ম। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি সব ধর্মমতের মধ্যেই সেই আদিম সনাতন ধর্মেরই প্রতিধ্বনি ও সমর্থন। এ-সবের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য নেই। তাই বলে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিধিমাফিক যে ঠিক-ঠিক ভাবে করবে সে-ই পাবে সেই একই জিনিষ।"[৮২]

অর্থাৎ প্রয়োজন পরস্পর পরস্পরকে জানা এবং নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্যকে জেনে সেগুলোকে ধারণ করা। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের সাথে প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের সাদৃশ্যও জানা দরকার। বিভিন্ন তাফসীর বা টিকা-টিপ্পনীই বাণীসমূহকে বিকৃত করে, তার চেয়ে প্রকৃত বাণী ধরে ধরে পড়লে এ সাদৃশ্য উন্মোচিত হয়, তবে প্রয়োজন হয় একজন সাক্ষাত আদর্শের যিনি নিজে এ সাদৃশ্য ধরতে পারেন। বাস্তবে সবই যে একই পরমপিতার বাণী সেই সূত্র ধরে এগিয়ে চললে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে সম্প্রীতির পথ, শান্তির পথ উন্মোচিত হবে। পরিশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাতেই এ অধ্যায় সমাপ্ত করছি- "The Bible in the Gita (গীতায় বাইবেল), The Gita in the Bible (বইবেলে গীতা), The Gita in the Quran (কোরাণে গীতা), The Quran in the

---

[৮১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৯ম সংস্করণ *পৃ. ১০৯*

[৮২] *ঐ. ঐ. (১২শ খণ্ড)*, পৃ. ১৪৭

Gita (গীতায় কোরাণ) এইভাবের বই পেলে হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটা আছে মূলতঃ। আমরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ঐক্যের সন্ধান করিনি। Self-seeking (স্বার্থ-সন্ধিক্ষু) পরিবেষণে করেছে যত গোলমাল। আর এটা শুরু হয়েছে কি আজ থেকে ! কত পন্ডিতি, কত টিকা-টিপ্পনী ! সেই টিকা ভেদ করে আসলে পৌঁছানই মুশকিল। তথাকথিত টীকার ভিতর দিয়ে না যেয়ে যদি independently (স্বাধীনভাবে) যাওয়া যায়, light (আলো) বেশী পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কোন মহাপুরুষের বাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা চুরি ইত্যাদির থেকে বেশী পাপ, কারণ, তা আমাদের Lord (প্রভু) থেকে বঞ্চিত করে। ন্যাংটা গীতা পড়তে হয়। তবে গীতা, বাইবেল যাই পড়ি, উপলব্ধিবান আচার্য্য চাই। প্রয়োজনমতো তিনি বলে দিতে পারেন। All-sided adjustment (সর্ব্বতোমুখী সমন্বয়) না দেখলে হবে না। প্রত্যেকটা কথা এত balanced (সামঞ্জস্যপূর্ণ)।”[৮৩]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে পূর্বতন সকল প্রেরিত-পুরুষের দর্শনেরই প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি কেবল তাত্ত্বিক ও বাচিকভাবে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, হযরত যীশু, হযরত মোহাম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ কিংবা কবীর-নানক প্রমুখের কথা স্মরণ করেছেন তাই নয়, বরং তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃত আদর্শকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। সাথে সাথে তাঁদের নিয়ে বা তাঁদের মতবাদ নিয়ে যেসব বিকৃতি হয়েছে, বিশেষ করে যেসব মতবাদের জন্য আজ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বৈরীত্ব সূচিত হয়েছে বা তাঁদের মতবাদের সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা কমে গিয়েছে সেসব বিকৃতি রোধ করতে তিনি তাঁর প্রাণান্তিক চেষ্টা করে গিয়েছেন এবং প্রত্যেকের প্রতি সেই আহ্বান করে গিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-শিখ-পার্সী-জৈন তথা সকলকে নিয়েই যেন তাঁর এই অবারিত চলা। এঁদের কেউ ছোট হলে, কেউ হেয় হলে, কেউ পিছিয়ে পড়লে যেন তাঁরই আদর্শ খাটো হয়ে গেল। আর তার দর্শন শেখায় যে প্রত্যেক প্রেরিতের মধ্যেও পূর্বতনকে সতত শ্রদ্ধা করার এই রীতি ছিল। তাই প্রত্যেক পূর্বতনের সমন্বয়ী সত্তা-সম্বর্দ্ধনী শিক্ষাকে একায়িত করে তিনি তাঁর যুগোপযোগী দর্শন তুলে ধরেছেন এ কথা অনস্বীকার্য।

---

৮৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১৪শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৬

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাস্তবায়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী রূপরেখা

৬.১ ভূমিকা

> “তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম-আপনি। সেই পরম-আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক তাঁকে জানাই হলো না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উল্টো- জ্ঞান সহজেই তফাত করে জানে, আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।”[১]- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে, যেমন- সদগুরু, পরমপিতা, প্রিয়পরম, যুগপুরুষোত্তম, বিশ্বগুরু প্রভৃতি। তন্মধ্যে বিশ্বগুরু শব্দের অর্থ বৈশ্বিক ব্যাপ্তি সম্পন্ন গুরু, অর্থাৎ এমন এক গুরু যিনি বিশ্বের প্রত্যেককে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধর্মপথ বা জীবনের পথ নির্দেশ দেন। বিশ্বের সমস্ত বিরোধের সমাধান বাতলে দেন তিনি। তাই তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হন না। আবার পুরুষোত্তম শব্দের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূরণকারী, অর্থাৎ যিনি সবাইকে পরিপূরণ করেন। তিনি কাউকে হেয় করেন না, বরং তার দর্শনে সকলেই আপূরিত হন। পূববর্তী সকল প্রেরিত পুরুষদের আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগোপযোগীভাবে এক সমন্বয়ী বিধান দেন, যা সবার জন্যই জীবনদায়ী। এ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের আলোকে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাস্তবায়নে শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমন্বয়ী রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, তার উপর আলোকপাত করা হল। প্রথমেই তাঁর ভিন্নমত বা সম্প্রদায়গত ঐক্য ও সম্প্রীতিপ্রসারী বহুবাণীর মধ্যে একটি বাণী উদ্ধৃত করা হলঃ

হিন্দুই হো’ক, মুসলমানই হো’ক,
খ্রীষ্টানই হো’ক–
বিশেষতঃ এই ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান
আর, যেই হো’ক না কেন,–

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মবোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী (৮ম খণ্ড)*, ঐতিহ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২। পৃ. ৬০০

প্রত্যেকেরই রক্ত সেই একই ভাণ্ডারেরই
বিভিন্ন গোত্রেরই অবতারণা;
ধর্ম মানুষকে উৎসারণায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষকে একতানে আবদ্ধ করে,
ধ'রে রাখে তার সত্তা
কৃষ্টির পথে, সত্ত্বা-সম্বর্দ্ধনায়, ধৃতি-বিনায়নায়,
–ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে
একটা সার্থক-সমন্বয়ী উৎসারণায়;
ধর্ম রক্তকে কলঙ্কিত করে না,
সংহতিকে ভেঙ্গে ফেলে না,–
বরং সে একত্বে উন্নীত ক'রে রাখে সবাইকে –
প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে
বৈশিষ্ট্যপালী উৎসারণী অভিনন্দনে, –
পরম সত্তানুপূরক সহযোগিতায়
পারস্পরিক আত্মনিয়ন্ত্রণে
শ্রমে – প্রস্তুতিতে –
উপচয়ী পরিপোষণী পরিপূরণে,
এই রক্ত-সংহতিতে যা'রা সংঘাত আনে –
সম্বর্দ্ধনাকে যা'রা প্রবঞ্চিত করে –
সর্বনাশা আত্মস্বার্থী, আত্মম্ভরি অভিযান নিয়ে
মিথ্যার মুখে একটা সত্যের মুখোস-পরা
বিচ্ছেদী, বিকল্পনী বিদ্রোহ ও বিপ্লবের
উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে, –
ভুলে যায় তা'রা বা
ইচ্ছা ক'রেই সে চক্ষু আবৃত করে
যে প্রেরিত-পুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের

আধ্যত্মিক রূপান্তরীণ পরিক্রমা, –
সেই পরমপুরুষেরই
একই বাণীবাহী যন্ত্রস্বরূপ,
কোন একেরই নিন্দা মানে –
প্রত্যেকেরই অবদলন;
যা'রা এই বিচ্ছেদের বাণীবাহী
তা'রা কি ধ্বংসের দূত নয়?
শয়তানের পূজারী নয়?
রক্তের গ্লানি নয়?
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের ধর্ষী নয়?
যদি মানুষ হও,
সত্তাকে যদি ভালই বাস,
ঈশ্বরেরর জীবন্ত বেদীর সম্মুখে
সম্বর্দ্ধনার পূজারী হওয়াটাকেই যদি
শ্রেয় মনে কর,
সার্থকই যদি হ'তে চাও ঈশ্বরে,
তুমি হিন্দুই হও –
মুসলমানই হও –
খ্রীষ্টানই হও –
আর, যে-ই হও না কেন –
কিছুতেই এ ব্যভিচারকে
বরদাস্ত ক'রবে না,
প্রাণের আকুণ্ঠ ক্ষমতা দিয়ে নিরোধ ক'রবে
তা'র প্রতিটি পদক্ষেপকে;
যে রক্তকে অবজ্ঞা করে
সে ধর্মকে অবজ্ঞা করে,

যে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে
সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
সর্ব্বান্তঃকরণে এই রক্তদ্রোহী,
ধর্ম্মদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী অভিযানকে
অবদলিত ক'রে তোল;
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,
শিখ, জৈন, আর যে-ই হো'ক, যা'ই হো'ক,
সবাইকে আমরা চাই –
যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
পুরয়মাণ আদর্শপুরুষদিগকে মানে,
গোত্রকে অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে মানে,
ঈশ্বরের একত্বে যা'রা বিশ্বাসী,
একায়তনী সমাবেশে যাদের শ্রদ্ধা আছে,
সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী আত্মনিয়ন্ত্রণে
যা'রা প্রবুদ্ধ;
সেই একেরই ঘরে সমাবেশ হ'য়ে
পারস্পরিক সহযোগিতার সহিত
প্রত্যেককে উন্নত ক'রে
জীবনে,সম্পদে ও সাহচর্য্যে
আমরা বাঁচতে চাই – বাড়তে চাই,
দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রে
স্বস্তি-সম্বোধি নিয়ে
জীবনকে উপভোগ করতে চাই,
খেয়ে-প'রে উপচয়ে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
যোগ্যতাকে আরোতর উদ্দীপ্ত ক'রে

আমরা বাঁচতে চাই –
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে
ধৃতি-তান্ত্রিকতায় –
পালনে-পোষণে-পূরণে-সম্বৃদ্ধ ক'রে;
পরস্পর পরস্পরের সেবা-সম্বর্দ্ধনাকে
উপভোগ ক'রে
দ্যুতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আমরা বাঁচতে চাই- বাড়তে চাই,
জীবনকে উপভোগ করতে চাই,
যা'রা এ-চাওয়ায় বিপর্য্যয় আনে,
ব্যাঘাত আনে,
বিধ্বস্তি নিয়ে আসে,
বিক্ষোভ নিয়ে আসে,
ভঙ্গুর ক'রে তোলে একে –
তা'দিগকে নিরোধ ক'রতে চাই,
স্তব্ধ ক'রতে চাই,
নিরস্ত ক'রতে চাই-
তা'দের প্রতিটি অগ্রসরকে
ব্যাহত ক'রতে চাই আমরা;
দূরে কেন, সে তো বেশি দিন নয় –
যে-দিন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চক্রান্তে
বাংলার নবাব সিরাজকে
মসনদ চ্যুত ক'রে
মৃত্যুমর্দনে বিমর্দিত ক'রে তা'কে
ইংরেজকে সাহায্য ক'রে
তা'দের হাতে দেশকে তুলে দিয়েছিলাম,

সে পুণ্যই হো'ক, আর পাপই হো'ক –
তা'দের আওতার ভিতরে দাঁড়িয়েও
হিন্দু-মুসলমানকে ছাড়েনি,
মুসলমানও হিন্দুকে ছাড়েনি,
সেই না-ছাড়াই কি আজকে
এমন আত্মঘাতী বিপ্লবেও
ক্রুর উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রেছে? –
ব্যভিচারের বিভর্ৎস লীলার
পৈশাচিক নাচনে
মত্ত ক'রে তুলেছে মানুষকে?
আমাদের জানা ছিল –
মুসলমান হিন্দুকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
হিন্দুও মুসলমানকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
যে-মতবাদের যে-ই পূজারী হো'ক না কেন,
যে-কোন আশ্রমের যে-ই হো'ক না কেন –
তা'রা পরস্পর পরস্পরের সতীর্থ,
আজকার এদিনে
সন্দেহ সঙ্কুল হৃদয় যদিও –
সে-জানাটা ক্ষত-বিক্ষত যদিও –
কিন্তু বুঝো এখনও উঁকি মারে,
প্রচেষ্টা এখনও এমন দিন আনতে পারে –
যা'তে আমরা সবাই সে-দিনকে
'স্বাগতম্' ব'লে ডেকে অভিনন্দন জানাতে পারি।[২]

বাণীটির বাস্তবতাকে যদি আমরা মেনে নিই তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের, মতের, ধর্মের সমন্বয়ের অন্যতম প্রবক্তা। প্রাণের আঁকুতি

---

[২] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *চর্য্যা-সূক্ত*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৯, পৃ. ৪৯

নিয়ে তিনি সবাইকে আহ্বান করেছেন এক হওয়ার জন্য। তাঁর মুখে এ যে সেই ঐশী আহ্বান, ধর্মের আহ্বান। সকল বিভেদ দূর করে সবাইকে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান জীবনের জয়গানে- সমৃদ্ধির উৎসারণী অভিদীপনায়। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে ছোট করে নয়; বরং সবাইকে নিয়ে, সবাইকে বড় করে তুলতে তাঁর এই মঙ্গল অভিযাত্রা। এ শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, তাঁর বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সাত্বত ও শাশ্বত সার্বজনীন গণকল্যানমুখী, বিচিত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই তিনি আপূরয়মান বৈশিষ্ট্যপালী, আর দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সঙ্কুল পরিবেশে সমন্বয়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানের মধ্য দিয়ে তিনি যে অমৃতময় জীবনের আলোকরেখা এঁকে গেছেন, সেখানে বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দুয়ার খুলে গেছে।

৬.২ সাম্প্রদায়িকতা নিরসন

আদর্শকে ঘায়েল করে চুক্তি রফায় বাঁধতে দল,
যতই যাবি পড়বি ঘোরে হাতে হাতে দেখবি ফল।
দল ভেঙে দল করিস নাকো সব দলে কর একটি দল
সাত্বত সেই ধৃতি প্রসাদে শিষ্ট তপে পাবি বল।[৩]

উপরের বাণী দুটিতে মহাপুরুষদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দলগুলোর জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি নির্দেশনা দেখা যায়। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে আদর্শকে কেন্দ্র করে চলার বিপরীতে সেই আদর্শকেই পুঁজি করে তাঁর নীতির সাথে আপোষরফা সাপেক্ষে যখনই আমরা পৃথক দল তৈরী করি, তখনই আমরা ঘোরের মধ্যে পড়ব এবং হাতে হাতে ফল দেখতে পাব। শেষোক্ত বাণীটিতে বলছে দল ভেঙে নতুন দল তৈরীর প্রয়াস কোন শুভ প্রয়াস না বরং বিদ্যমান দলসমূহ নিয়ে নতুন একটি দল করা ভাল। সেটা সাত্বত। তাই সেই শিষ্ট তপস্যার ফলস্বরূপ আমরা আরও শক্তিশালী হতে পারব। অর্থাৎ বাণীদুটির মূলকথা হল সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে সবাইকে নিয়ে ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা। সাধারণতঃ দেখা যায় মহাপুরুষদের গত হওয়ার পর তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায় এবং নতুন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। এর সাথে তিনি যে সংহতির সূত্র দিয়ে যান তাও ভেঙ্গে যায়। মহাপুরুষদের তিরোধানের পর সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি নষ্ট হওয়ার

---

৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭, পৃ. ২৩০ ও ২৩২

কারণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন- ‘এর প্রধান কারণ হলো যারা গুরু নয় তারা গুরু হয়েছে। এতে মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মহাপুরুষেরা বলে যান এক রকম কিন্তু অনুসারীরা তাদের মধ্যে বিকৃতি এনে ফেলে। তার ভিতর দিয়েই গোলমালের সূত্রপাত হয়।’[৪]

অনেকে মনে করেন যে ধর্মই সাম্প্রদায়িকতা তৈরী করে। তাই সাম্প্রদায়িকতা নিরসনের উপায় ধর্মকেই বাদ দেওয়া। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে প্রকৃত ধর্ম জীবনের কথা বলে। আর কোন মতবাদ তো ধর্ম নয়ই, বরং মহাপুরুষদের প্রয়াণের পর সেসব মতবাদের অপব্যাখ্যা কখনো কখনো অধর্ম বা ধর্মের গ্লানি হয়ে দাঁড়ায়। আর তা থেকে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হতেই পারে। উপায় ধর্মের মূলদাঁড়াকে বুঝে তার অনুসরণ করা, আর ধর্ম সবকালে সবক্ষেত্রেই একই কথা বলে। প্রেরিত বা মহাপুরুষদের কথাও স্থান-কালভেদে ভিন্ন মনে হলেও তাদের মূলকথা অভিন্ন। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান সম্ভব নয়। বরং এর ভিতরে থেকেই এ এসমস্যার সমাধান করতে হবে। ধর্ম এক, ধর্মগ্রন্থসমূহের বাণীর একই সুর এই সত্যকে আচরণে ফুটিয়ে তুলেই এর সমাধান সম্ভব।

কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হতে পারে সে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- ‘সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কেন যে এত মাথা ঘামান, তা আমি বুঝি না। ....ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়েই তার সমাধান হবে। প্রকৃতধর্ম্ম যে এক বই দুই নয়, ধর্ম্মকে আচরণে গ্রহন করে তা show (প্রদর্শন) করতে হবে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, কোরান, বাইবেল ভাল ক’রে ধীইয়ে পড়ুন, তাহ’লে ওগুলির কুব্যাখ্যা ও কদর্থ দূরীভূত করতে পারবেন। ভাল ক’রে লাগলে পরমপিতার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হবে। তাঁর দয়া অফুরন্ত। আমরা যে তাঁকে লক্ষ্য ক’রে চলি না, এইখানেই যত গোলমাল।’[৫]

উপরোক্ত কথায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করে ধর্মান্তরিত হয়ে সবাই এক মতাবলম্বী হয়ে ওঠা কোন সমাধান নয়। বরং যেকোন আদর্শকে অনুসরণ করে অন্যসব মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমূহের কুব্যাখ্যাসমূহ দূর করতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মবোধ গজিয়ে তোলা ও প্রকৃত ধার্মিক হয়ে ওঠাই সাম্প্রদায়িকতার সঠিক

---

[৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭, পৃ. ২৩০ ও ২৩২

[৫] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ১৪৬

সমাধান। ধর্ম আর সম্প্রদায় এক নয় । সম্প্রদায়বোধ থাকলে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে। কিন্তু ধর্মবোধ গজিয়ে উঠলে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর এপ্রসঙ্গে বললেন- 'ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম্ম বরাবর এক এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেইকো! এক-একজন প্রেরিতপুরুষকে আশ্রয় করে এক-এক দেশে ধর্ম্মের বিশেষ জাগরণ হয়েছে।'[৬]

তার মতে প্রকৃত ধার্ম্মিক যারা, সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, বৌদ্ধই হোক আর খৃষ্টানই হোক, তারা সবাই এক। তিনি বলেছেন-'ঈশ্বর এক, প্রেরিতপুরুষগণ এক বার্ত্তাবাহী এবং ধর্ম্মও এক। ধর্ম্ম মানে সেই আচার, সেই চিন্তা, সেই চলন যাতে মানুষ সপরিবেশ সর্ব্বতোমুখী বাঁচা-বাড়ার পথে এগিয়ে যায়- দেশকাল পাত্রানুযায়ী স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে, তাহলে একের ধার্ম্মিক চলনের সঙ্গে অপরের ধার্ম্মিক চলনের কোন মূলগত বিরোধ থাকতে পারে না, যদিও বৈশিষ্টানুযায়ী উভয়ের চলন স্বতন্ত্র হতে পারে। সে হিসাবে ধার্ম্মিক প্রত্যেকেই একপন্থী। তাছাড়া কোন প্রেরিতপুরুষের প্রতি যদি কেউ নিষ্ঠাসম্পন্ন হয়, একের ঐ নৈষ্ঠিক অনুসরণের ভিতর দিয়ে তার অন্যান্য প্রেরিতপুরুষগণকেও যুগপৎ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন আমি যদি রামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলি, তাহলে তাঁর ভিতর দিয়েই আমার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব সকলকেই অনুসরণ করা হয়- কারণ এঁদের মূলনীতি এক। আর প্রত্যেক মহাপুরুষেরই নির্দ্দেশ অন্যান্য মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে চলা। তাই আমি তাঁদের কাউকে যদি ভালবাসি, অন্য সকলকেও স্বভাবতঃই ভালবাসব তাঁরই বিভিন্ন মূর্ত্তি জেনে। আর তাঁদের অনুগামী যারা, তাদেরও ভালবাসব আপনজন ভেবে। এই-ই তো স্বাভাবিক। তাহলে আর খাঁটি মুসলমান, খাঁটি হিন্দু, খাঁটি খৃষ্টানে ভেদ থাকে কোথায়? তবে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পন্থানুযায়ী খাঁটি হওয়া চাই এবং অন্য সকলকেও তাদের আদর্শ অনুযায়ী খাঁটি হয়ে উঠতে সাহায্য করা চাই।'[৭]

কোরাণ, হাদিসের কদর্থ ক'রে লোককে যেভাবে বিভ্রান্ত করা হ'চ্ছে, কোন ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরই তা' বরদাস্ত করা উচিত নয়। সুনিষ্ঠ, ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞ মুসলমান ভাইদের সংগ্রহ ক'রে এই কাজে লাগাতে হয়। তাদের উপর প্রথমটা হয়তো অত্যাচার, অবিচার হবে।

---

[৬] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ.৯৫

[৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৯০

কিন্তু ধীরে-ধীরে লোকে বুঝবে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ-নিরোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর এই অসৎ-নিরোধ করতে গিয়েই আসে opposition (বাধা) ও persecution (নির্যাতন)। তা' overcome (অতিক্রম) করার মত কৌশল ও শক্তি আয়ত্ত করতে না পারলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য্য। তুমি মানুষকে টাকা দাও, পয়সা দাও, খেতে দাও, পরতে দাও, নারী দাও, মাটি দাও, শিক্ষা দাও, সভ্যতা দাও, কোন দেওয়াই দেওয়া হ'লো না, যতক্ষণ না তুমি তার মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তার ability (যোগ্যতা) ও self-control (আত্মসংযম) unlock (বিকশিত) করছ। Heaven (দিব্যধাম)-কে কে কত ভালবাসে, দার পরখ হ'লো মানুষের ভিতর heaven (দিব্যধাম)-কে সে কতখানি impart (সঞ্চারিত) করতে পারে। সেইজন্য গীতায় আছে- যান্তি মদ্‌ যাজিনোহপি মাম্‌।'[৮]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে প্রকৃত ধর্ম কি তা মানুষকে বুঝিয়ে, প্রচলিত সকল ধর্মমতসমূহকে শ্রদ্ধা করে সেই মতবাদের প্রকৃত চর্চার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আমরা যতই সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, একাত্ম হয়ে উঠতে পারব; এক কথায়, সবার মধ্যে ধর্মের মূল দাঁড়া ঠিক করে দিয়ে দিতে পারব, সাম্প্রদায়িকতা নিরসনের পথে ততটাই আমরা অগ্রসর হতে পারব।

৬.৩ ধর্মান্তরিতকরণ নিরসন

> "যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় একথা কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।" [৯]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই পিতৃকৃষ্টি ধারণ করাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তাই যার যার স্বধর্ম্ম বা নিজকৃষ্টি ত্যাগ করে অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ কোনও প্রেরিত পুরুষই সমর্থন করেন নি। একজন প্রকৃত হিন্দু তার হিন্দুত্ব বজায় রেখে মহানবী কিংবা প্রভু যীশুর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। তেমনি প্রকৃত মুসলমান তার মুসলমানত্ব বজায় রেখেও শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। বাইবেলে আছে যে, 'হায়! অধার্ম্মিক ইহুদি ধর্ম্মব্যাখ্যাতাগণ!

---

[৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৪র্থ সংস্করণ পৃ.১৭৩

[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৯ম খণ্ড, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ.৬০৩

তোমরা একজনকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাবার জন্য জল-স্থল পরিভ্রমণ কর, কিন্তু যখন তাতে কৃতকার্য্য হও, তোমরা তাকে একটি নরক-নন্দন ক'রে তোল, যে কিনা তোমাদের চাইতে দ্বিগুণ খারাপ হ'য়ে ওঠে।'[১০]

শ্রীশ্রীঠাকুরের শব্দাভিধানে ধর্মান্তর বলে কিছু নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই বিষয়টির বহুল সমস্যার প্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের এইরূপটি খুবই বিশ্লেষণাত্মক ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে তাঁর শিষ্যেরা কেউ ধর্মান্তরিত হবে না অর্থাৎ তথাকথিত ধর্মত্যাগ বলে এখানে কিছুই থাকবে না। দীক্ষাগ্রহনকে তিনি ধর্মান্তকরণ বলতেন না।[১১]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে একজন বিশ্বাসী ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরু হিসেবে গ্রহন করতে পারে এবং তাঁর নীতিসমূহ অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু এজন্য তাকে তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম ত্যাগ করতে হবে না। অর্থাৎ একজন জন্মগত মুসলমান শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বীকার করার ও তার আদর্শকে অনুসরণ করার পরও মুসলমানই থাকবে। একইভাবে একজন খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর কখনো প্রাকৃতিক পরিচিতি, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কারসমূহকে পরিবর্তন করতে চাইতেন না।

প্রাথমিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর তো ধর্মের বহুত্ব রূপকেই স্বীকার করেননি। তিনি বলতেন- ধর্ম হল জীবন-বৃদ্ধির পথ। বিশ্বের সমস্ত তথাকথিত ধর্মসমূহ জীবন-বৃদ্ধির বিভিন্ন বিভিন্ন পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবতার ইতিহাসে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রেরিত পুরুষেরা এসেছেন এবং প্রত্যেকে চলে যাওয়ার পর তার মতবাদসমূহ এক একটা ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এভাবেই আনুক্রমিকভাবে প্রত্যেক প্রেরিতের অনুসারীরা তাদের স্বতন্ত্র দলীয় পরিচিতিকে ধরে রেখেছে।

অন্যভাবে বলা যায় প্রেরিত চলে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে ধর্ম তৈরী বা স্বাধীন সংস্কৃতি তৈরী হল ঐ প্রেরিতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া।[১২] কারণ কোন প্রেরিতই তাঁর পূর্ববর্তীদের বাদ দিয়ে পৃথক পরিচিতি করতে চাননি। হয়তো আদর্শগতভাবে এটার প্রয়োজন না হলেও সময়ের দাবীতে তা গড়ে উঠেছে। কারণ পরবর্তী প্রেরিত যখন আসেন তখন পূর্ববর্তী প্রেরিতদের আদর্শ একপ্রকার বিকৃতই হয়ে যায় তাই সততা-শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পরবর্তী প্রেরিতের কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পরিচিতি আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই আদর্শগতভাবে বিকৃত হলেও প্রত্যেক প্রেরিত চলে যাওয়ার পর নতুন ধর্মের গঠনপ্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক হয়ে পড়ে। এভাবেই

আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তন হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও প্রেরিতকে কেন্দ্র করে সেই সময়ের আদলে গড়ে উঠেছে।

অনেকেই ধর্মান্তরিতকরণকে সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হতে পারে বিবেচনা করে সে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- ‘শুনেছি, বিদায়-হজে রসুল বলেছেন পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করলে সে অভিশপ্ত হবে। সেদিক থেকে তো মনে হয়, আমরা হিন্দু হ’য়েও যারা রসুলকে মানি এবং বাস্তবভাবে ধর্ম্মের আচরণ করি, converted (ধর্মান্তরিত)-দের চাইতে তারাই খাঁটি মুসলমান। রসুলকে মাথায় ক’রে নিয়েই আমরা রসুল-বিরোধী রকম যেখানে যা’ আছে, তার নিরাকরণ করতে পারি। অধর্ম্মকে বরদাস্ত করাই পাপ- তা’ হিন্দুর ভিতরই হো’ক, আর মুসলমানের ভিতরই হো’ক। ....বেদ, উপনিষদ, গীতা, কোরান, বাইবেল ভাল ক’রে ধীইয়ে পড়ুন, তাহ’লে ওগুলির কুব্যাখ্যা ও কদর্থ দূরীভূত করতে পারবেন।’[১৩]

পৃথক কোন আদর্শে পরিপূরণী দীক্ষাগ্রহণ আর ধর্মান্তরিতকরণ যে এক নয় সেসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- “ধর্ম্ম চিরদিনই এক। আর তা’ আচরণের বস্তু। ধর্ম্মের কখনও ভেদ হয় না। ধর্ম্ম কখনও পিতৃপুরুষ বা মানুষের অতীত সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ভাল হয় না। এক কথায় conversion is no verse of religion (ধর্ম্মান্তরিতকরণ ধর্ম্মের কোন কথা নয়)।..... কিন্তু পরিপূরণী দীক্ষা জিনিষটা আলাদা, তাতে গুরু ত্যাগ হয় না, কৃষ্টি ত্যাগ হয় না, বরং প্রত্যেকটাই স্ফূরণদীপনা লাভ করে। আমার কথা এই যে, পূর্ব্বতন একজনকে না মানলেও মহা ক্ষতি। বর্ত্তমান পূরকপুরুষ সম্বন্ধে বলেছে-সর্ব্বদেময়ো গুরুঃ। পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষ তাঁর মধ্যে alive (জীয়ন্ত)। তাঁর কাছে conversion (ধর্ম্মান্তকরণ) নেই, আছে adherence (নিষ্ঠা)। Convert (ধর্ম্মান্তর) করা মানে betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা) শেখান। ওটা ধর্ম্মরাজ্যের কথা নয়। আমার কাছে কোন খৃষ্টান আসলে তাকে বলি- Be more deeply christian (আরো গভীরভাবে খৃষ্টান হও), কোন মুসলমান আসলে তাকে বলি Be more deeply muslim (আরো গভীরভাবে মুসলমান হও)।

---

১০. পবিত্র নতুন নিয়ম প্রেমের বাণী, ম্যাথুস ২৩:১৫

১১. ড. দেবেশ চন্দ্র পাত্র, *শ্রীশ্রীঠাকুরের শব্দভাণ্ডারে ধর্মান্তর বলে কিছু নেই*, ভারতীয়-আর্য্য শিক্ষা সংস্থা, রাঁচী, ঝাড়খন্ড, ২০১২, পৃ. ১

১২. ঐ. ঐ. পৃ.৩

১৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৪র্থ সংস্করণ পৃ.১৭৩

১৪. ঐ.ঐ. পৃ.১৭৪

আমাদের শাস্ত্র বলে- যে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দলিল মানে না, গুরু মানে না, তাকে কখনও গুরু ব'লে গ্রহন করবে না, কারণ সে complex (প্রবৃত্তি)-এর দাস হবেই।”[১৪]

ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় নিজ পিতৃকূলের কূলগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে হয়, যা নবীজীর স্পষ্টভাবে নিষেধ করা আছে। প্রকৃত অর্থে তথাকথিত ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া আর ইসলামে দীক্ষিত হওয়া এক জিনিস নয়। কারণ পিতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে কাফির বলে গণ্য হয়। সহিহ মুসলিম বর্ণনা মতে, ‘আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ বলেছেন- তোমরা আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কাফির।’[১৫]

ভারতে খ্রীস্টান ধর্ম্মযাজকরা যীশুর আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ বা মা কালীর নামে নিন্দা করতো সে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন-‘যীশুর কথা মানুষে যতই জানে ততই ভাল। কিন্তু যীশুর নাম ক'রে যদি অন্য কোন মহাপুরুষকে খাটো করা হয় এবং তাঁকে ছেড়ে যীশুকে ভজনা করার কথা বলা হয়, তাতে কিন্তু যীশুকে ধরার পক্ষেই অসুবিধা হয়। যীশু কিন্তু কখনও তা’ শেখাননি। তিনি বলেছেন- I come to fulfill, not to destroy.(আমি ধ্বংস করতে আসিনি, পরিপূরণ করতে এসেছি)। কিন্তু তাঁকে এমন ক'রে পরিবেশন করা হ'ল, যার থেকে এসে গেল।’[১৬]

অন্যধর্ম বা মতাবলম্বীরা নিজ ধর্ম বা আদর্শে অটুট থেকেও যে ইসলামের মতাদর্শ গ্রহন করতে পারে সে সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- রসুল কি কখনো একথা বলেছেন যে মুসলমান বা ইসলামপন্থী হ'তে গেলে কারো hereditary culture (বংশানুক্রমিক কৃষ্টি)-কে অস্বীকার করতে হবে? পূর্ব্ববর্ত্তীকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে যাকে accept (গ্রহণ) করতে যাই- প্রকৃতপক্ষে তাকেই কি করা betray (ঠকান) হয় না? আমি ইচ্ছা করলেই তো ইসলামের সেবক এই অবস্থায় হতে পারি- প্রত্যেকেই প্রত্যেক অবস্থায় পারে- আর তা উচিতও, কিন্তু conversion (ধর্ম্মান্তর)-এর কথা রসুলের মধ্যে নেই- বরং তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীকে কত মান্য দিয়েছেন।’[১৭]

---

[১৫] *সহিহ মুসলিম*, ২৬: ১২২

১৬. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৪, পৃ.৮৬

১৭. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ.১০

বিশ্বের সকল ধর্মের ইতিহাস একটি সুদীর্ঘ ও জটিল বিষয়। ধর্মমতসমূহ ও বর্তমানের ক্ষমতাসীন শক্তিসমূহের মধ্যে অসংখ্য উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থাকতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শকে বোঝাই আমাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমরা শুধু এসব সমস্যার আলোকে তাঁর সমাধানী রূপরেখা আলোকপাত করতে পারি।

তাঁর মতে প্রচলিত যে কোন ধর্মের অনুসারীই তার জন্মগত নিজ নিজ ধর্ম পালন অক্ষুন্ন রেখেও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে অনুসরণ করতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুসরণ করা মানে কোন নতুন ধর্ম, সংস্কৃতি বা সাংগঠনিক আদেশে প্রবেশ করা নয় বরং একটি আদর্শিক কাঠামোকে গ্রহন করা যা একজন ব্যক্তিকে তার পরিবার ও সমাজ নিয়ে সর্বতোভাবে ভালো থাকতে শেখায় ও সেইপথে চালিত করে। উপরন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের দেখানো পথ প্রচলিত ধর্মের বাধাসমূহকে ভেঙে ফেলতে পারে যে প্রচলিত বাধাসমূহ উন্নয়নের পথে কোন কাজেই আসেনা। সেই অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শকে বা মতবাদকে অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষও বলা যায়। এটা একটি পথ, সম্ভবত একমাত্র পথ, বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থকারী প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের দূষিতচক্র থেকে বের হয়ে আসার। সবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণীর আলোকে বিষয়টি দেখতি পারি।

১. পূর্বপুরুষ জাত-গরিমা জানিস্ যা'তে ছাড়তে হয়,
এমনতর ধর্মবাণী জগদ্‌গুরুর নিছক নয়।[১৮]

পূর্বপুরুষ চেতন-ধারা ধর্মে যদি ছাড়তে হয়, জোর গলাতে বলছি আমি নিছক সেটি ধর্ম নয়।[১৯]

২. হিংসা-দ্বেষী বৃত্তিবিধুর পালন-পূরণ মিলন-হারা,
চতুর চালে ধর্মনীতির সমর্থনে দিয়ে কাড়া,

ভরদুনিয়ার প্রেরিতদের কা'রও ভক্তি-অছিলায় / অন্য প্রেরিত-নীতির দলন করতে যদি কেহ ধায়,

তা'রেই নিছক কাফের জানিস্ ধর্মদ্রোহের কারণ সেই;
তা'কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া অবজ্ঞা সে ঈশ্বরেই।[২০]

---

১৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, পৃ. ২৮৯

১৯. ঐ. ঐ. পৃ. ২৮৯

২০. ঐ. ঐ. পৃ. ২৯১

৬.৪ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া

> ‘লোকটা ঈশ্বর মানে না বলিয়াই তুমি তাহাকে বিদ্বেষ করিও না। ঈশ্বর সেবার প্রয়োজন না মানিয়াও যদি কেহ ঈশ্বরের সৃষ্ট সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া থাকে। তবে তাহার সেবা কর্মের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্বিরোধ হও। ঈশ্বর মানিয়া, ঈশ্বরের দোহাই দিয়া যাহারা কেবলই নিজেদের ভোগ উপকরণ সংগ্রহ করে, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ।’[২১]
>
> -স্বামী শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দজী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন-যত মত তত পথ। তবে এসব মত যত বাড়ছে মতবিরোধও তত বাড়ছে। সমন্বয়ের থেকে সমস্যাই বেশি তৈরী হচ্ছে। তাই আজ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বা বহুধর্মের মধ্যে সম্পর্কটা কামড়াকামড়ির মত। সে প্রসঙ্গ টেনে এর সমন্বয় প্রশ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- “প্রেরিত বা অবতারপুরুষদের প্রত্যেককেই মান্য করতে হবে, এঁদের মধ্যে বিভেদমূলক বিচার করলে হবেনা, আবার পূর্বতন প্রত্যেককে স্বীকার করেন ও পরিপূরণ করেন এমনতর বর্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁতে শ্রদ্ধানত হতে হবে। এতে আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকবে না। ঈশ্বর এক , ধর্মও এক, অবতার মহাপুরুষরাও এক; সমন্বয় হয়েই আছে। চাই শুধু সেইটে ধরিয়ে দেওয়া।”[২২]

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন,‘ কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের- একটাকেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানাপ্রকারে হতে পারে।’[২৩] সকল ধর্মের প্রতি, সকল প্রেরিতের প্রতি আমাদের অটুট শ্রদ্ধা রাখতে হবে। সবাইকে স্বীকার করতে হবে। তাই আর্য্যধারাকে শ্রদ্ধা করা মানে প্রত্যেক প্রেরিতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া, তাদের স্বীকার করা। আর হযরত যীশু কিংবা হযরত মোহাম্মদও এই ধারারই অংশ। এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, “হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ আমাদেরও প্রেরিতপুরুষ, আর্য্যধারা যদি জীবন্ত থাকত তা-হলে হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ হয়ত একাদশ অবতার, দ্বাদশ অবতার বলে পরিগণিত হতেন। বাইবেল বিরোধী, কোরাণ বিরোধী, বেদ বিরোধী-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার নিরাকরণ করতে হবে।”[২৪]

---

[২১] স্বামী স্বরূপানন্দ, *অখণ্ড সংহিতা*, ৪র্থ খণ্ড, অযাচক আশ্রম, মুরাদনগর, কুমিল্লা, ২০০০। পৃ. ১৩৪

[২২] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র. *(১ম খণ্ড)*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৯ম সংস্করণ, পৃ. ১২৬

[২৩] ঐ.ঐ., *সত্যানুসরণ*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৪৩তম সংস্করণ, পৃ. ১২

[২৪] ঐ.ঐ. *(১ম খণ্ড)*, পৃ. ৪৭

হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পরস্পর পরস্পরের প্রতি কেমন থাকা উচিত, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত খ্রষ্টান একই- কোন ভেদ নেই। এরা প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পরস্পরে শ্রদ্ধান্বিত থাকে।"[২৫]

অর্থাৎ প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকা। নিজ নিজ ধর্মাচরণ ঠিক রেখে বিভিন্ন প্রেরিত সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষাদান করা এবং ঐক্য ও সমন্বয়ের শিক্ষা দেওয়া। মানুষকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যেন কেউ ভুল শিক্ষা না দিতে পারে, বিভ্রান্ত না করতে পারে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলতে না পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি- 'খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধই হোক, আর যেই হোক, তারা যদি নিষ্ঠা ঠিক রেখে, আচরণ ঠিক রেখে, অল্প কিছু সময় প্রেরিত-পারম্পর্য্যমূলক ঐক্যের সেবা ও শিক্ষা দেয়, তাহলে মানুষের বড় কাজ হয়, তারা বিভ্রান্ত হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় না, বিদ্বেষপরায়ণ হয় না। চাই প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা, যা মানুষকে ঈশ্বরপরায়ণ করে তোলে, ঐক্যসমৃদ্ধ করে তোলে, সবার প্রতি দরদী ও সেবাপরায়ণ করে তোলে।'[২৬]

প্রকৃত ধর্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যেন তার নিজ-নিজ প্রেরিত-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন থেকেও অন্য সবাইকে শ্রদ্ধা করে, তাঁদেরও চর্চা করে, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাঁরা মানুষের জন্য কি চেয়েছেন তা জানা, বোঝা আর সেই অনুযায়ী করা। তাঁদেরকে নিজেদের সুবিধা অনুসারে ব্যাখ্যা করাও অনুচিত কাজ। তাতে বরং আরও ক্ষতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, 'একজন খৃষ্টানের প্রথম যীশুখ্রীষ্টকে ভালোবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে সব প্রেরিতপুরুষকে ভালোবাসা উচিত। একজন হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে বা যে প্রেরিতপুরুষকে সে অনুসরণ করে তাঁকে ভালোবাসা উচিত এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য সব প্রেরিতপুরুষকে ভালোবাসা উচিত। কোন প্রেরিতপুরুষকে ভালোবাসা মানে তিনি যেমন ছিলেন, সেইভাবে তাঁকে বোঝা। আমাদের সুবিধা অনুযায়ী তাঁর মতের বিকৃত ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।'[২৭]

---

২৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২১শ খণ্ড)*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, ২য় সংস্করণ, পৃ.৫২

২৬. ঐ. *ঐ(১৪শ খণ্ড)*, পৃ. ১৫৭

২৭. ঐ.ঐ. *(১১শ খণ্ড)*, পৃ. ২

৬.৫ ঈশ্বর ও প্রেরিতগণ অভিন্ন

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীতে বলেছেন,

'প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম
পৃথিবীর যে-কোন দেশেই আবির্ভূত হন,
তাঁ'র ঐশী বাণী,
ঐশী অনুবেদনা
শুধু সেই দেশেই নিহিত থাকে
তা' নয়কো,
তবে তিনি যে-দেশে আবির্ভূত হন,-
সেই দেশের রীতিনীতি, ভাব,
সত্তাপোষণী সংস্থিতির সম্বন্ধ বিনায়না
মূখ্যতঃ তদনুপাতিকভাবে
নিয়মন ক'রে থাকেন,
শুভসন্দীপী কল্যাণকর প্রথাগুলি
যা' আবর্জ্জনমৃষ্ট-
তা'কে পরিমার্জনায় বিনায়িত ক'রে থাকেন-
তেমনি ক'রে;
আবার, তিনি অন্য দেশের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সমস্যাগুলিকেও
তেমনি ক'রে বিনায়িত ক'রে থাকেন,
যা'তে শুভসন্দীপী কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে
বাঁচা-বাড়ার পন্থা প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে;
তিনি তাঁ'র নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
প্রাচীনের সঙ্গতিকে বজায় রেখে
সেই সূত্রে বর্তমানের

দেশকালপাত্রানুপাতিক শুভ-বিনায়নে
ভবিষ্যৎ-প্রবর্ত্তনাকে
স্বর্ণপ্রসূ ক'রে তুলে থাকেন;
তিনি বিধায়ক-
মূর্ত্ত বশী,
গণসত্তার পরম ধাতা,
জীবনের বৈশিষ্ট্য-বিনায়নী উদ্ধাতা তিনিই-
তা' সবারই;
সর্ব্বত্রই দেখবে-
যা' দিয়ে তাঁ'কে গন্ডীবদ্ধ করা হয়েছে,-
তা' তাঁর বার্তা নয়কো,
কদর্য্য-ব্যাখ্যার আভিঘাতিক নিবন্ধ মাত্র;
তিনি পুরুষোত্তম-
কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন,
ঈশ্বরের প্রেরণাপ্রেরিত মূর্ত্ত-বাণী তিনি;
ঈশ্বর পরম উদ্ধাতা,
তিনি বিধাতা-
জীবনের শৌর্য্য-দীপনা-
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মান।'[২৮]

সুফী সাধক জালালউদ্দিন রুমী যেমন বলেছেন- 'সব ধর্মই আসলে এক', শ্রীশ্রীঠাকুরও তেমনি বললেন, 'যুগে যুগে সেই একজনই আসেন, পূর্বতন ও পরবর্তীর মধ্যে- তাই রয়েছে অচ্ছেদ্য সঙ্গতি। বিবর্তনের ধারা এইভাবে এগিয়ে চলছে। তাই একজনকে খাটো করে আর-একজনকে বড় করার প্রচেষ্টা ভাল নয়। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখি না- বুদ্ধদেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে দেখি না- এই যে দোষ।'[২৯]

---

২৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ*, ১৩শ খন্ড, পৃ ১৭৬-১৭৭, বাণী নং-৫১৯৫

২৯. ঐ. ঐ.*(১ম খণ্ড)*, পৃ. ১৭৩

যুগে যুগে সকল প্রেরিত-পুরুষই একই সুরে একই কথা বলে গেছেন। তাদের কারও কথাই কারও সাথে ভিন্ন নয়। ঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেমন সর্বদা একই ফল দেয়, তারাও যেখানেই জন্মগ্রহন করেন না কেন, একই মানবতার বাণী, আশার বাণী, উদারতার বাণী দিয়ে যন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-'সবারই এক কথা, সব শেয়ালের এক ডাক। মরুভূমির মহামানব, প্যালেষ্টাইনের নির্য্যাতিত ফকির, কপিলাবস্তুর সর্বত্যাগী রাজপুত্র, নবদ্বীপের প্রেমের গোরা- যে- বেশেই তিনি যেখানে আসুন, তাঁর একই কারবার, একই কথা- মানুষ কেমন করে ভগবানকে ভালবাসবে এবং ভগবানেরই জন্য তাঁর জীব-জগতকে ভালবাসবে? নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিমায় সেই চিরন্তন এক কথা। তাই বলে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই হলো divine fulfillment of all ism (সমস্ত বাদের ভাগবত পরিপূরণ)! বড়া রোশনি কী বাত! Message of hope! (আশার বাণী); Message of charity! (উদারতার বাণী)।'[৩০] আবার অন্যত্র বললেন, 'ঈশ্বর অদ্বিতীয়, অখণ্ড, না-শরীক, তাই তা'র নির্ব্বাচিত প্রেরিত-পুরুষ যখনই আসেন তিনিও অদ্বিতীয়, অখণ্ড, না-শরীক।'[৩১]

মহাপুরুষদের একই কথা তার অনুসারীরাই বিকৃতভাবে পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরী করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়—'যত মহাপুরুষ এসে গেছেন সবাই প্রকারান্তরে একই কথা ব'লে গেছেন। আমরাই তা' বিকৃতভাবে পরিবেষণ ক'রে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছি। ধর্ম নিয়ে বিরোধের কোন কারণ নেই। উন্নতির পথ সবার জন্যই উন্মুক্ত।'[৩২]

বিভিন্ন মহাপুরুষদের বা প্রেরিত পুরুষদের একই দৃষ্টিতে দেখা এবং একইভাবে গুরুত্বের সহিত শ্রদ্ধা করা বা ভালোবাসা সম্পর্কে এ পর্যায়ে আমরা কোরআনের কয়েকটি আয়াত পর্যবেক্ষণ করব। সুরা হাম সাজদায় বলা হয়েছে, 'হে মোহাম্মদ! তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা বই বলা হইতেছে না।'[৩৩] কোরআনের এই আয়াতে নবী-মোহাম্মদকে বলা হচ্ছে যে পূর্বে প্রেরিতদের যা বলা হয়েছিল, তাকেও সেই একই বার্তা ভিন্ন অন্য বার্তা দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ, সকল প্রেরিত একই। তাই একজন মুসলমান হযরত

---

৩০. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, আলোচনা প্রসঙ্গে(৭ম খণ্ড), সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ২০১২, পৃ. ২০৯

৩১. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, প্রীতি বিনায়ক(১ম খণ্ড), সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ২০০৮, পৃ. ১২৬

৩২. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, আলোচনা প্রসঙ্গে(১৭শ খণ্ড), সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ২০১৪, পৃ. ৩১৬

৩৩. *আল কোরআন, সুরা হাম সাজদায় ৪১:৬*

মুহাম্মদকে যতটা শ্রদ্ধা করবেন ততটাই শ্রদ্ধা অন্যান্য পূর্ব-পূর্বপ্রেরিতদেরও করা উচিত। তন্মধ্যে কারও কারও নাম পবিত্র কোরাণে বা হাদিসে উল্লেখ আছে যেমন-ঈসা, মুসা, দাউদ; আবার অধিকাংশ নামই উল্লেখ নেই, যাঁরা হয়তো অনেকেই পৃথিবীর অন্য জাতি বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে প্রেরিত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যেমন-রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ।

পবিত্র আল-কোরআনে অন্যত্র বলা হচ্ছে যে, 'যাহারা ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করে না- এই তাহারা সত্বরই তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।'[৩৪] কিংবা এও বলা হচ্ছে যে, 'আমরা তাঁহাদের (রসুলগণের) মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না। আমরা সকলকেই মানি এবং আমরা কেবল তাঁহারই অনুগত।'[৩৫] অর্থাৎ প্রেরিতদের মধ্যে কাউকে পৃথক ভাবে চিন্তা করা যাবে না, তাতেই আল্লাহ খুশি হবেন ও পুরস্কৃত করবেন। আর তাঁর পুরস্কার হল শান্তি ও সম্প্রীতি। আর প্রেরিতগণকে পৃথকভাবে চিন্তা করা মানে আল্লাহকে বা পরমপিতাকে অস্বীকার করা, অমান্য করা।

একই রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ সুর আমরা পবিত্র কোরাণের আরও একটি আয়াতে শুনতে পাই, 'বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহা আমাদের প্রতি, যাহা ইব্রাহীমের প্রতি ও যাহা ইসমাইল, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা মুসা ও ঈসাকে প্রদান করা হইয়াছে এবং অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং আমরা সেই ঈশ্বরের অনুগত।'[৩৬] পরবর্তীতে আবার মনেও করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হযরত মুসা নবীর অনুসারীরা ভুল করেছিল মতভেদ করে তা যেন মুসলমানরা না করে। 'নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম কিন্তু পরে উহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত করা হইয়াছে।'[৩৭] অর্থাৎ মতভেদের কারণে যেমন হযরত মুসা নবীর কিতাবকে অমান্য করা হয়েছে। তেমনি বর্তমানে প্রেরিতদের মাঝে ভেদচিন্তা দ্বারা পবিত্র কোরআনকে বা পক্ষান্তরে আল্লাহকে ও তাঁর নবীকেই অমান্য করা হচ্ছে।

---

৩৪. আল কোরআন, সুরা নেছা ৪:১৪৯

৩৫. আল কোরআন, সুরা বাকারা ২:১৩৬

৩৬. আল কোরআন, সুরা বাকারা, ২:১৬

৩৭. আল কোরআন, সুরা হা-মীম, ৪১:৪৫

পূর্বতনকে যারা মানেনা, শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সবসময় স্পষ্টভাবে তাঁর ভারতীয় হিন্দু অনুসারীদের প্রতি বলেছেন যে হিন্দুদের উচিত সনাতন ধর্মের প্রচলিত প্রেরিত-পুরুষদের পাশাপাশি যীশুখ্রীষ্ট, মোসেস, জরথুষ্ট, গৌতম বুদ্ধ কিংবা হজরত মুহাম্মদ এদের প্রত্যেককে অবতার হিসেবে মানা এবং সবাইকে শ্রদ্ধা করা। আবার তাঁর মুসলিম, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ অনুসারীদেরও একই রকম নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সবার জন্যই তাঁর একই কথা। সরাসরি হযরত মুহাম্মদকে প্রেরিত মানা এবং পূর্বতন হিসেবে তাকেও পূজার আসনে বসানোর সহজ-সাবলীল-সাহসিকতা এসেছে তাঁর বাণীতে-

‘রসুল পূজা করলে তোদের জাত যাবে তা বললো কে?
রসুল তোদের সেই অবতার সেটাও তোরা ভুললি যে।’[৩৮]

একই রকমভাবে আমরা দেখতে পাই মনীষীরাও অনেকেই কোরআনকে বেদের সাথে তুলনা করেছেন। আর বাইবেলকে তো প্রেমের বাণীই বলা হয়ে থাকে। গীতায় রয়েছে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ে এক পূর্ণাঙ্গ মোক্ষলাভের বিধান। আর, গুরু গ্রন্থ সাহিবের বিভিন্ন সংগৃহীত দোঁহার সুরে রয়েছে ঐশী চেতনার উন্মেষ। মূলতঃ বেদ, কোরআন, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক এসবের মূলে সেই একই কথা- একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্। ‘কোরআন বিশুদ্ধ অবিকৃত মন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইসলামের মূলে ঈশ্বরের একত্ববাদ এবং তৎসঙ্গে মানবের একত্ববাদ, হিন্দু ধর্মের মূলেও এই একত্ববাদ।’[৩৯] নবীও যে একই শিক্ষা দিয়েছিলেন তাও তাদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন, ‘হে মানব! সমভাবে সকলের সঙ্গ করিবে যেন অপর ধর্মাবলম্বীরা তোমাকে আপন ও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারে।’[৪০]

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে, যেহেতু ঈশ্বর এক, আর তাঁর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ একই কথা বলে, তাই তাঁর প্রেরিতগণ অভিন্ন এই সত্য স্বীকার করাই প্রকৃত ধার্মিকের লক্ষণ। তাঁর কথায়,

‘এক বাপেরই পাঁচটি ছেলে
দেখলি না তুই চোখটি মেলে,
কাউকে বাপের করলি স্বীকার কাউকে বললি নয়,
কা’রে রে তুই দিলি ধিক্কার গাইলি কাহার জয়?[৪১]

---

[৩৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩, পৃ. ২৮৩

[৩৯] গোলাম মোস্তফা, *ইসলাম ও বিশ্বনবী*, *২য় খন্ড*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ- ৩৩৬

[৪০] ঐ.ঐ., পৃ- ২৬৯

[৪১] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩, পৃ. ২৮০

৬.৬ স্বদেশে কুৎসা ও অপ্রতিষ্ঠা

প্রত্যেক মতেই বলা হচ্ছে যে প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে গৃহিত হন না। ইতিহাসেও দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় মূল্যায়িত হলেন না, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মূল্য পেলেন না, মহামতি বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে গৃহিত হলেন না, প্রভুযীশুকে তো ক্রুশবিদ্ধই করা হল, হযরত মুহম্মদকে মক্কাবাসী তাড়িয়েই দিল, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠা পাননি আর শ্রীশ্রীঠাকুরও হিমাইতপুর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষের জীবনে এটা একটা অধ্যায় যে তারা স্বদেশে কুৎসার স্বীকার হন। স্বদেশের মানুষ তাকে চিনতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কতিপয় শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া হলোঃ

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলা হচ্ছে,

‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো ত ভূত মহেশ্বরম্।।’[৪২]

অর্থাৎ, আমার পরম ভাব না জেনে মূঢ়গণ মনুষ্য দেহধারী বলে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে।

বাইবেলেও বলা হয়েছে, ‘আমি নিশ্চিত করে তোমাদিগকে বলছি, কোন প্রেরিতই তাঁর নিজের দেশে গৃহীত হন না।’[৪৩]

একই ধরণের আয়াত আমরা কোরআনেও দেখতে পাই, ‘তাদের মধ্যে এমন কোন রসুল আগমন করেন নাই যে, তাহার সহিত উপহাস করা হয় নাই।’[৪৪]

আর শ্রীশ্রীঠাকুরও তার সত্যানুসরণে লিখেছেন-‘মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দন্ডিত হন- যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়- তাই প্রেরিত-পুরুষ স্বদেশে কুৎসামন্ডিত হন।’[৪৫]

---

[৪২] *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক-১১*

[৪৩] *পবিত্র নতুন নিয়ম, লুক, ৪:২৭*

[৪৪] *আল কোরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:১১*

[৪৫] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*,সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫, ৪৩তম সংস্করণ, পৃ. ১২

৬.৭ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা

ইসলামের কালেমায় বলা হয়েছে, লা ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মদুরাসুলুল্লাহ। অর্থ ঈশ্বরের কোন শরীক নেই, আর মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত। খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র ত্রিত্বেও একজনকেই বোঝানো হয়েছে। সকল মতেই এক মহাশক্তির উৎসকে লক্ষ্য করে সাধনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর প্রণীত প্রত্যেকের জন্য নিত্য-স্বীকার্য পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চির প্রথম বাণীদ্বয়েই একেশ্বরবাদকে তুলে ধরেছেন:

একমেবাদ্বিতীয়ং শরনম্।
(এক ও অদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি)
নোপাস্যমন্যদ ব্রহ্মন্বেব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
(ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।)

এ দুটি লাইন তাঁর প্রণীত আর্য্যসন্ধ্যা-প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত যা প্রত্যেকের প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা নিত্যপাঠের বিধান আছে, এ যেন উপনিষদ বা বেদান্তের একেশ্বরবাদকেই নিত্য স্বীকার্য করে দেওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ আছে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চি প্রতি-প্রত্যেকের বিশেষতঃ প্রত্যেক হিন্দুর নিত্য স্বীকার্য, অনুসরণীয় ও পালনীয়, তবেই সে হিন্দু। অর্থাৎ সনাতন আর্যধারার এই মূলমন্ত্র পুর্ণজাগ্রত করার জন্যই তাঁর এই কঠোর নির্দেশ। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকাদির প্রায় প্রত্যেক পুস্তকের শুরুতেই এ নির্দেশনা দেওয়া আছে। এ নির্দেশ অমান্য করা মানে তাঁকেই অমান্য করা।

এক্ষণে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও মনীষীদের বাণীর আলোকে আমরা ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদের সমর্থনে আলোকপাত করবো:

> পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- ‘তাহাদের মূর্ত্তির সুপারিশ আমার কোন উপকারে এবং না পারিবে তাহারা আমাকে উদ্ধার করিতে।’[৪৬]
>
> পবিত্র বাইবেলে বলা হচ্ছে, ‘আমরা জানি দুনিয়াতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয় আর খোদাও মাত্র একজন ছাড়া আর কেহ নাই।’[৪৭]

---

[৪৬] *আল কোরআন, সুরা ইয়াসিন, ৩৬:২৩*

[৪৭] *পবিত্র নতুন নিয়ম, করিন্থিয়, ৮:৫*

আর্য্যঋষিরা তন্ত্রশাস্ত্রে বলেছেন,

‘উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবঃ ধ্যানভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমস্তপো জপশ্চ বাহ্যপূজাহধমাধমঃ।।’[৪৮]

অর্থাৎ, জীবগণের পক্ষে একমাত্র ব্রহ্ম সদ্ভাব বা একব্রহ্মের প্রতি অকাট্য টানের ভাবই উত্তম, ধ্যানভাব হল মধ্যম। তপ-জপ-স্তুতি ইত্যাদি অধম ভাব, আর বাহ্যপূজা অধমেরও অধম।

পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় বলা হচ্ছে যে

‘যো মাং সর্ব্বেষূভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্
হিত্বাচর্চাং ভজতে মৌঢ়াদ্ ভস্মন্যেব জুতোহি সঃ।’[৪৯]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া শুধু মূর্খতাবশতঃ প্রতিমায় পূজা করে সে ভস্মে হোম করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছে, ‘যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি দেবতার পশু।’[৫০]

বিষ্ণু পুরাণে বলা আছে,

‘অপসু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মণীষিনাম্
কাষ্ঠলোষ্ট্রেসূ মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতাঃ।’[৫১]

অর্থ সাধারণ লোকে জলকে ঈশ্বর জ্ঞান করে, মনীষীরা আকাশকে ঈশ্বরকে কল্পনা করে, যোগীরা আত্মাতে ঈশ্বর অনুভব করে আর মূর্খেরা কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ইত্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া বোঝে।

আলবেরুনী বলেছেন- ‘কেবল মূর্খ জনসাধারণ বহুদেবতায় বিশ্বাস করে। শিক্ষিত হিন্দুরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে- তিনি এক, অদ্বিতীয় অনাদি, অনন্ত সর্বশক্তিমান, স্রষ্টা, পাতা ও যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহারই জন্য।’[৫২]

---

[৪৮] ব্রজগোপাল দত্তরায়,শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র(৩য় খণ্ড), তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, পৃ-৭৩

[৪৯] *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক-২১*

[৫০] মহামহোপাধ্যয় দুর্গাচরণ, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ (২য় ভাগ)*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪৮

[৫১] বেনীমাধব শীল, বৃহৎ *বিষ্ণু পুরাণ*,বুক চয়েস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২০৪

[৫২] আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ, *আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১২৪

আর, একেশ্বরবাদ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পষ্ট অভিব্যক্তি এরকম-

‘তুমি যেই হও না কেন-
ঠিক যেন ঈশ্বরই তোমার একমাত্র উপাস্য,
আর তাঁর-ই জীয়ন্ত বেদীমূলে
প্রিয়পরমের চরণ বেলাভূমিতে
তাঁরই উপাসনা কর- সার্থক হবে।’[৫৩]

৬.৮ পৌত্তলিকতা বর্জন কিন্তু দেবতা বা বীরের পূজা যথার্থতা

একথা প্রচলিত সত্য যে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও যেমন বহু অজ্ঞ হিন্দু পৌত্তলিক অর্থাৎ যারা মৃত্তিকা নির্মিত প্রতীকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করে, তেমনি কোরান-বিরুদ্ধ হইলেও বহু অজ্ঞ মুসলমান পৌত্তলিক অর্থাৎ মাজার, দরগার উপাসক। তবে সনাতন ধর্মের প্রবর্তক আর্যঋষিরা পৌত্তলিক ছিলেন না, তবে দেবতা বা বীরের পূজা অর্থাৎ প্রশংসা বা স্তুতি করতেন, যা সমর্থনযোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, ‘হিন্দুরা কিন্তু পৌত্তলিক নয়। তারা হ’লো Hero worshiper(বীর পূজারী), দেবতা পূজারী। দেবতা মানে দীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ।...হিন্দুরা পৌত্তলিক কখনই নয়, বরং hero-র পূজক। তাঁরা যেখানেই কোন শক্তির প্রাচুর্য্য বোধ করেছেন, তাহাকেই ভগবানের শক্তি বলিয়া নতজানু হইয়া গ্রহন করিয়াছেন। উৎসকে অবমাননা করিয়া কোন শক্তির প্রাবল্যকে তাঁরা জানেন না বা গ্রহন করেন নাই আমার তো ইহাই মনে হয়। উৎসকে অস্বীকার করিয়া যখনই শক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাকে অসুর ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া অস্বীকারই করিয়াছে, এই তো দেখিতে পাই- জানি না আর কী আছে।’[৫৪]

শ্রীশ্রীঠাকুর এর আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘আর্যদের মধ্যে যে প্রতীমা পূজার বিধি আছে সে বিধির কারণই হচ্ছে এই যে- দেবতা জ্যান্ত শরীরী হয়ে মানুষের সম্মুখে এখন আর প্রতিভাত নয়, তাদের এমনতর একটা প্রতীক তৈরী ক’রে তাতে ধারণা বা মননে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক’রে স্তব ও পূজার ভিতর দিয়ে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে সেগুলিকে স্মরণে এনে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ও

---

৫৩. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আদর্শ বিনায়ক*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৮, পৃ. ৮৭

৫৪. ঐ.ঐ. (১৮শ খণ্ড), পৃ. ৩২১

জ্বলজ্বল করে তুলে কর্মের ভিতর দিয়ে স্বভাব ও জীবনে সিদ্ধ ক'রে তোলা এই হচ্ছে আর্য্যদের প্রতিমা পূজার উদ্দেশ্য।[৫৫] ...প্রতীমাকে আর্য্যরা কখনই স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন নাই। যদি উপযুক্ত আদর্শ ইষ্ট বা গুরু না থাকেন, এই প্রতীমা পূজা অনেক স্থলে বিপদও সৃষ্টি ক'রে থাকে। তাই শাস্ত্রে যাদের গুরুকরণ হয় নাই, তাদের এই প্রতীমা পূজাকরা নিষিদ্ধ। তা হলে বুঝুন যেমন প্রতীমা পূজার বিধি তেমনি তা থেকে বিপদের সম্ভাবনা, তা নিরাকরণের জন্যও বিধিমত ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয়নি।'[৫৬]

সার্বিক প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়েছেন, যে অর্থে পৌত্তলিকতাকে নিষেধ করা হয়েছে তা কোনও না কোনওভাবে সকল মতের মধ্যেই কমবেশি আছে। কিন্তু প্রশংসা বা পূজার মূল লক্ষ্য যদি ঈশ্বর বা তাঁর প্রেরিত হন বা তাঁর সমর্থিত কোন বিষয় হয় তবে তাকে ত্যাগ করা যায় না। অর্থাৎ সার্বজনীনভাবে দেবতা, প্রতীক বা বীরের পূজা বা প্রশংসা সর্বত্রই রয়েছে। এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'পৌত্তলিকতা কোন না কোন রকমে এসে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দেখতে হবে ওর মূল। খ্রীষ্ট ভক্তরা যেমন cross পূজা করে, তার কোন মানে নেই, যার পিছনে christ (যীশুখৃষ্ট) নেই; তা আমরা ত্যাগ করতে পারি না; যার পিছনে আছে পবিত্র স্মৃতি এবং sentiment (ভাবানুকম্পিতা)। পূর্ব পুরুষের স্মৃতি নিজেদের ভিতর জাগ্রত রাখবার জন্য তাদেরও পূজা করে, কিন্তু পৌত্তলিকতা বলে যদি সেটা বাদ দেয় তা হলে কতখানি বঞ্চিত হয়।'[৫৭]

পরিশেষে বলা যায় যে একেশ্বরের শক্তিতে দীপ্তিমান চরিত্র বা দেবতাদের চর্চা, প্রশংসা বা পূজায় ঐ ঈশ্বরকেই মূখ্য করা হলে তা দোষের হয় না, তবে ধর্মের নামে কেবলমাত্র গাছপূজা, গরু-ছাগল-মহিষ পূজা, কিংবা কোন কল্পিত চরিত্রে পূজাই পৌত্তলিকতা। আর এ পৌত্তলিকতায় একেশ্বরবাদী ঋষিদের সমর্থন ছিল না, আর আর্যহিন্দুরা বা বৌদ্ধরা তা করেওনি কখনো। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছন্দ-ছড়ায় বললেন-

> 'কোন বেকুব শিখিয়ে দেছে আর্য্য তারা পৌত্তলিক?
> পুতুল পূজা করে না তারা পূজে আপ্ত বীর প্রতীক।
> ভর দুনিয়া দেখ খুঁজে তুই স্মারক পূজক কেই বা নয়,
> যার যেমনটি লাগে ভাল তেমনি পূজায় সবাই রয়।' [৫৮]

---

৫৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, কথা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড), সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০০৯, পৃ. ৯

৫৬. ঐ. ঐ. (২য় খণ্ড), পৃ. ৪৯

৫৭. ঐ. ঐ. *(১৮শ খণ্ড)*, পৃ. ৩২৩

৫৮. ঐ. ঐ. (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৫৬

একই সঙ্গে একেশ্বরবাদ ও দেবতা পূজার তাৎপর্য নিয়ে আর্যঋষিদের সাথে বিভিন্ন প্রেরিতের সাদৃশ্য দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- 'এ বাবা কঠোর সত্য- সব মানিকের এক জেল্লা! সবাই ঐ এক-কথাই বলেছেন।...ধর্ম আচরণের দিক দিয়া হজরত রসুলও যা' বলে' গিয়াছেন, আর্য্যদের ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই ঋষির নির্দেশরূপে তাহাই বহন ক'রে আসছেন। আর্যধর্মশাস্ত্র তাই ছবি বা পুতুল-পূজা এমনতর বিকট তাচ্ছিল্যের সহিত নিরস্ত করতে ঘোষণা করেছেন। তবে আর্যঋষিদের প্রত্যেক মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার এমন একটা ঝোঁক ছিল যা' নাকি হজরত রসুলের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়...আর, তার জন্যই ঐ পুতুল-পূজার ভিতর দিয়াও মূঢ়রা যাতে সেই পথে চলতে চলতে একদিন ঐগুলির বাস্তব ব্যাপার বুঝে শুঝে, তাহ'তে বিরত হতে পাওে এমনতর ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে অধমাধম ব'লেও একদম নাকোচ ক'রে দেন নি। আর দেখা যায়, হজরত রসুলও একরকম তাই-ই বলেছেন। যা'রা পুতুল-পূজা নিয়ে পুতুলকেই ভগবান ক'রে একটা বেপরোয়া জড়ত্বের আরাধনায় মসগুল হয়ে আছে, কায়দা-কলম ক'রে তাদিগকে ঐ পুতুল বা ছবিপূজার অনিষ্টকারিত্ব বুঝিয়ে ওগুলি যে নিরেটই অধম, তাদের তাই বিবেচনার ভিতর এনে, অন্তর থেকে তা যাতে মুছে যায় তারই মতলব মত কথার ভিতর দিয়ে কত রকমে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি ত'একথা কখনও বলেন নাই, যারা পুতুল পূজা করেছে তাদের ইয়াদে অর্থাৎ জ্ঞানে তার অপকৃষ্টতা বোঝাবার মতন হলেও, সে যদি সত্য অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধির ধর্মাচরণকে অবলম্বন করে আল্লাহতাল্লাহ তথাপি তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হবেন না। তাহলেই এই ধর্মপথে যে যে আচরণ মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উৎকর্ষে উন্নত করে তোলে, সে ব্যাপারে এঁদের কারও ভিতরে মতান্তর কোথায়? মতান্তর ভাবি আমরা অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যারা।' আর দেবতা মানে হচ্ছে যাঁরা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির সেবা করে উৎকর্ষে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল আবেগে স্মৃতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁরাও একদিন জ্যান্ত-শরীরী, দীপ্তকর্মা ও সেবা-উদ্দীপ্ত হয়েই প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথেই নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, যে স্মৃতি মানুষ ভুলতে পারে না,- তা খৃষ্টানই হউক, আর্যই হউক, মুসলমানই হউক, বৌদ্ধই হউক, জৈনই হউক বা যেই হউক বা যাই হউক। এই দেবতাদের গুণকীর্তন হজরত রসুল যে কত-রকম করে গেছেন তা বলা যায় না, আর প্রত্যেকের তাদের স্তুতি ও পূজা করবার কথা যে কত-রকমে বলে গেছেন তারও ইয়ত্তা নাই।'[৫৯]

---

[৫৯] ব্রজগোপাল দত্তরায়,শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র(৩য় খণ্ড), তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, পৃ-৯৫-৯৬

৬.৯ পরনিন্দা ত্যাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পুণ্যপুঁথি বা ভাববাণীতে বলেছেন, ‘দ্যাখ্, অধঃপাতে যাওয়ার প্রধান সহায় কি জানিস্? পরনিন্দা।’[৬০] ইসলামেও গীবত বা পরনিন্দাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মমতসমূহেও পরনিন্দাকে ত্যাগ করবতে বলা হয়েছে। তবে সত্য এই যে ধর্মপ্রচারকদের মুখে ভিন্নমতের নিন্দা করা এখন হরহামেশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শাস্ত্রবিচারে পুণ্যের চেয়ে পাপই অর্জন হচ্ছে বেশি। আর ধর্মের বদলে হচ্ছে অধর্ম। যেকোন সাধারণ ব্যক্তির নিন্দাকেই যেখানে পাপ বলা হচ্ছে, সেখানে না জেনে কোন প্রেরিত-পুরুষকে বা তাঁর আদর্শ বা মতবাদের নিন্দা করা মহাপাপেরই সামিল। প্রকৃত অর্থে যখন কারও প্রকৃত ধর্মবোধ জাগে একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারে যে, যেকোন প্রেরিত পুরুষের নিন্দা বা ইষ্টনিন্দা করা পক্ষান্তরে তারই প্রেরিতের ইষ্টের নিন্দা করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে এসব নিন্দার বিরুদ্ধে তার বাণীতে বললেন,

‘পরের ইষ্ট নিন্দা ক’রে হ’লি ইষ্ট-নিষ্ঠ
নিজেরই পা ভাঙলি নিজে বুঝলি না পাপিষ্ঠ।’[৬১]

পরনিন্দার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপমহাদেশে কথায় কথায় বহুহিন্দু ধর্ম প্রচারক মুসলমানসহ অন্যদের ম্লেচ্ছ এবং বহু মুসলমান ধর্মপ্রচারক হিন্দুসহ অন্যদের কাফের বলে থাকে। না জেনে বা অজ্ঞাতে কাউকে ম্লেচ্ছ বা কাফের বলা যাবে না, কারণ সে যদি কাফের না হয়, তবে সে কাফেরত্ব আমার নিকটই ফিরে আসবে। অর্থাৎ যে কাফের না তাকে কাফের বলার অর্থ বক্তা নিজেই কাফের।

সহিহ মুসলিম তাই বর্ণনা করছে, ‘যুহাযর ইবন হারব (রা)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আর কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে বা ‘আল্লাহর দুশমন’ বলে ডাকলে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অনুরূপ না হয়, তা হলে তা বক্তার প্রতি ফিরে আসবে।’[৬২]

---

[৬০] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *পুণ্যপুঁথি*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০০৩, পৃ. ১৫৮

[৬১] ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৫, পৃ. ২৭৭

[৬২] *সহিহ মুসলিম, ২৫: ১২১*

একই রকমের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীতেও পাওয়া যায়-

‘যা’রা ঈশ্বরকে মানে,
আদর্শ-পুরুষকে মানে, ধর্ম্মকে মানে,
অনুসরণ করে সাধ্যমত,
তা’ সত্ত্বেও তা’দের যা’রা
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন ভাবে বা বলে-
বুঝতে হবে সেই তা’দের মধ্যে
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন-ভাবেরই
অভিব্যক্তি বেশী-
এক-লহমায় তা’রা দুষ্কর্মপ্রবণ হ’তে পারে।’[৬৩]

৬.১০ মহাপুরুষদের প্রণীত পথের বিকৃতি নিরোধ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর আরেকটি সমাধান দেখিয়েছেন, আর তা হলো প্রেরিতদের বাণীগুলো অবিকৃত রাখা। তাঁর কথায়, ‘অবতার মহাপুরুষরা বলে যান এক রকম, করে যান এক রকম কিন্তু অনুসারীরা তার মধ্যে বিকৃতি এনে ফেলে, তার ভিতর দিয়ে অনেক গোলমালের সূত্রপাত হয়।’[৬৪] এই বিকৃতি রোধ করতে পারলে মূল বাণীসমুহের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা জানতে এবং জানাতে পারব, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে প্রকৃত যা তা সর্বত্রই এক। বিকৃত ব্যাখ্যাকারীরা নিজেরা সঠিক পথ খুঁজে পায় না, অন্যদেরও সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। তারা মনে করে যে তারা ধর্ম পালন করছে, কিন্তু তারা যা’ করে তা’ ধর্মের নামে বিকৃতি বা ভন্ডামী অর্থাৎ অধর্ম ছাড়া কিছু নয়। এরকমভাবে শান্তির ধর্মে অশান্তি প্রবেশ করে, উগ্রবাদ কিংবা গোঁড়ামী ধর্মের রূপধারণ করে। এ সম্পর্কে তিরমিজি শরীফেও সাবধান বাণী করা হয়েছে, ‘বনি ঈসরাইলগণ ৭২ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল আমার ইসলাম ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, কিন্তু একটি মাত্র দল ছাড়া অবশিষ্ট জাহান্নামে যাবে।’[৬৫]

---

[৬৩] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ধৃতি-বিধায়না (প্রথম খন্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১২, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪৪৪

[৬৪] ঐ. ঐ., *কথা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০০৯, পৃ. ৯

[৬৫] *তিরমিজি শরীফ, সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং-২৬৪১*

এর মূল কারণ ব্যাখ্যা করে ‘মোস্তফা চরিত’-এর ভূমিকায় মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ লিখেছেন, ‘কোরাণও আরবি ভাষায় লিখিত। তাই বাংলায় যে তার মূল অর্থ কতখানি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নেই। শুনা যায় মূল কোরাণ আলেমগণের হাতে পড়িয়া বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।’[৬৬]

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর তিনজন ঔরসজাত সন্তানসহ (শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবিবেকরঞ্জ চক্রবর্তী ও ড. শ্রীপ্রচেতারঞ্জন চক্রবর্তী) সকল কৃষ্টিজাত সন্তানদের লক্ষ্য করে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, ‘বড় খোকাই হোক, মনিই হোক, কাজলই হোক বা আপনারাই হোন- আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি আশা করি যে আপনারা নিজেদের জীবন ও চরিত্রে আমাকে বহন করে নিয়ে বেড়াবেন এবং মানুষের কাছেও আমাকে পৌঁছে দেবেন অবিকৃতভাবে।’[৬৭]

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে মহাপুরুষের বাণীবিকৃতি চুরি-হত্যা প্রভৃতির চেয়েও পাপের কাজ। তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাঁর ও অন্যান্য প্রেরিত-পুরুষদের বাণী যেন অবিকৃতভাবে প্রচার হয় সেদিকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে বলেছেন।

তাঁর বাণীতে তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন-

‘আমার কথা বিহিতভাবে যা অবগত হয়েছ,
বোধে ফুটন্ত হয়ে উঠেছে যা’,-
তাই-ই অন্যকে ব’লো,
যা’ বোঝনি-
বলার লালসা থেকে তা বলতে গিয়ে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক’রে
মানুষকে বিভ্রান্ত ক’রে তুলো না,
নিজেও হ’য়ো না।’[৬৮]

---

[৬৬] মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪ (৫ম সংস্করণ)

[৬৭] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৫, পৃ. ১৪৩

[৬৮] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *চর্য্যা-সূক্ত*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৫, পৃ. ২৭

এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর ছড়াবাণীতেও বলেছেন-

‘সহজ মানুষ হও,-
সৎ-শুভ যা’ নির্ভুল জানা লোকের কাছে কও।
শোনা কথায় আস্থা করে কল্পনাতে যারাই দেখে,
ভাল কিংবা কুৎসিত অন্তর রকম দেখে বুঝো তাকে।
জানা যতই কানা তোমার অসহায় তুমি তত,
ভ্রান্তিভরা আচার-ব্যাভার বিধ্বস্তি আনে স্বতঃ।’[৬৯]

উদাহরণস্বরূপ এপর্যায়ে দু-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি যেগুলোতে মতানৈক্য আছে এবং সেসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধান দিয়েছেন সমন্বয় ও প্রকৃত সত্য উন্মোচনের স্বার্থে:

অবতারবাদ: “দুনিয়ার যা-কিছু সবই তো তাঁর (ঈশ্বরের) অবতার- তা থেকে তো সবই অবতরণ করেছে, আর অবতরণ করেও সর্বতোভাবে তো তাঁতেই সবাই আছে! তবে হিন্দুরা তাঁ’দিগকেই অবতার বলে থাকেন- খোদায় যাঁরা চেতন আছেন বা থাকেন- আর তাঁরাই হচ্ছেন, ঐ খৃষ্টানরা যাঁকে বলেন ঈশ্বরের সন্তান, মুসলমানেরা যাঁকে বলে খোদার দোস্ত। আবার এঁরা যেমনই হউন বা যাহা হউন না কেন, ঋষি তো বটেন-ই। কারণ খোদার দর্শন বা চেতনা এঁদের প্রত্যেকের ভিতরেই মসগুল বিদ্যমান। কোরাণের ভিতরও তো দেখতে পাওয়া যায় এমনতর বহুত আছে। ইহাদিগকে যাঁরা মানে না, কোরাণের কথায় তাঁরা তো মুসলমানই নয়। একটা লাঠি সোজা করে ধরলেই লাঠি হয়, আর ফেরালেই তাকে কোৎকা বলে। লাঠিই বল আর কোৎকাই বল- যা ইচ্ছা তুমি বলতে পার, কিন্তু জিনিষ যা তা থাকবেই; তার যা গুণ, তা দিয়ে যা হয়, তা তুমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না। তাহলে গরমিল কোথায় তাতো ঠাহর পাওয়া গেল না।”[৭০]

জন্মান্তরবাদ: “হিন্দুর জন্মান্তর লইয়া মুসলমান বা খৃষ্টানের সাথে কি কোন গোল আছে? বুঝের গোলই সব গোল এনে দেয়। খোদার কাছে কি কোন দিন ফিন আছে? দিন-রাত বলে কি কিছু আছে? না, এখন পাঁচটা বাজল, তখন সাতটা বাজল বলে কিছু আছে? যখন যা হয়, তাই তখন তার দিন। ‘রোজ কিয়ামত’ বা re-surrection মানেই হচ্ছে- রোজ কায়ামৎ বা re-rise- কায়াম হওয়ার রোজ বা আবার হওয়ার দিন! কর্মফল অনুযায়ী এতো দুনিয়ার হরদমই হচ্ছে

---

৬৯. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৫, পৃ. ২৪, ৫৬ ও ১২৭জ

৭০. ব্রজগোপাল দত্তরায়,শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র(৩য় খণ্ড), তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, পৃ-৯৬

রোজ। যেদিন সে হয় তারই দিন-ধাতার বিধানের বিচারে তা যে অনবরত আপনা-আপনি চলছে। তা, তাঁরা তো আর আমাদের মতন অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন একটা যা-তা বলার ক্ষেউ ছিলেন না যে, কারু সাথে কারু মিল থাকবে না! আমরা আমাদের বুঝ-মাফিক মারামারি করি। ঐ মারামারির ভয়ে বাস্তব যা, তাতো আর অস্তিত্বপ্রকৃতিহারা হতে পারে না; যা আছে তা আছেই, যতদিন যা থাকবার থাকবেই।”[৭১]

পশুবলি বা কোরবানী : শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়েছেন যে সকল প্রেরিত পুরুষই প্রাণীহত্যাকে অপছন্দ করতেন তবুও ধর্মের নামে পশুবলি বা কোরবানী এখনো টিকে আছে। বুদ্ধদেব তার পঞ্চশীলায় প্রাণীহত্যাকে নিষেধ করেছেন। বাইবেল বলছে যে বলদ ও ছাগলের রক্ত কখনো পাপ দূর করতে পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বলির হাত থেকে ছাগশিশুকে রক্ষা করেছিলেন। কোরবানী প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, ‘কোরবানী’ কথার মানে হত্যা এ আমার কিছুতেই মনে হয় না, ও মনে হয় নিবেদন, মনে হয় উৎসর্গ- আর তা’ সবচেয়ে যিনি আমার প্রিয়, দুনিয়ায় যা’কে অত্যন্ত ভাবেই পছন্দ করি, ভালবাসি- তাঁকে নিবেদন করতে ইচ্ছা হয়- আর করেও হয় মহাসুখ, মহাতৃপ্তি, অন্তকরণ ফুটে ওঠে মহা সন্দীপনায়! নিবেদন ক’রে কেন তাঁকে দিতে ইচ্ছা করছে- এই চিন্তাতেই যেন অন্তরটা অমনতর হয়ে ওঠে। বধ বা হত্যার চিন্তাই তো এখানে নাই- বিশেষতঃ যেখানে ইসলাম is the attitude of dharma…. আমি আপ্রাণ চেচিয়ে বলতে পারি হযরত রসুল কখনও অমনতর প্রাণীহত্যার উপদেশ দেন নি।’[৭২] আবার বলির নিষেধ সম্পর্কেও বহু বলেছেন। একদিন মাকালীর উদ্দেশ্যে বলি নিয়ে বললেন, ‘তোমার ছেলেমেয়েকে বলি দিলে কি তোমার মা খুশি হয়? আর, নিজের ছাওয়ালকে যে খায় সে মা রাক্ষসী মা।’[৭৩]

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছড়া-বাণীতেও বললেন,

> “ঈশ্বরেরই উপাসনায় হিংসা-সাধন পশুবলি
> বিশ্বপ্রভু নেন না তাহা যায় না তা’তে সে-সকলই।”[৭৪]
>
> “হত্যা করি ঈশ্বরকে করলে নিবেদন
> সেই রক্ত-মাংস তা’তে পৌঁছে না কখন।”[৭৫]

---

৭১. ব্রজগোপাল দত্তরায়,শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র(৩য় খণ্ড), তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, পৃ-৯৫

৭২. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ১৯৯৫, পৃ. ১৮০

৭৩. ঐ. ঐ. , *দীপরক্ষী(৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ১৯৯৫, পৃ. ১০৪

৭৪. ঐ. ঐ., *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১৫, পৃ. ২৯০

৭৫. ঐ. ঐ, পৃ. ২৯৫

৬.১১ উপসংহার

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িকতা নিরসন— এ দুটি বিষয় বিবেচনা রাখলে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে সমাধানসমূহ দেখিয়েছেন, সেসব সত্যিই যুগোপযোগী এবং বর্তমান বিশ্বশান্তির জন্য সেসব প্রত্যেকটি মানবসত্তার জন্যই তা উপযোগী। আর তার জন্য প্রয়োজন ঐক্যতান। এই ঐক্যতানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

'কোন একের সাথে
অন্য যা' কিছুর
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুগতিই হ'চ্ছে
ঐক্যতান,—
যেখানে
ঐ যা'-কিছু
নিজের বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেও
বিনায়ন-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
একায়িত হ'য়ে ওঠে।'[৭৬]

আর এর প্রাচীনের সাথে সার্থক-সঙ্গতি রেখে দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিকভাবে অন্তর-বাহিরে যাঁর ব্যক্তিত্বে রূপায়িত তিনিই কিন্তু আচার্য বা বেত্তা আচার্য। শ্রীশ্রীঠাকুরও এখানে তাঁর পূর্ববর্তী সকলকেই পরিপূরণ করে কেবল যুগানুপাতিক রকমটাই তুলে ধরেছেন, যা প্রত্যেকেরই অনুসরণযোগ্য। আবার আচার্যের সংজ্ঞায় তিনি বললেন—

'যিনি প্রাচীন বা পূর্ব্বতনে
অনুরাগ-উচ্ছল হ'য়ে
তাঁ'দের বার্ত্তা বা বাণী পরিপালন ক'রে
দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক
তা'রই সুসঙ্গত সার্থক পরিপূরণশীল—
তিনিই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ,
ইষ্টার্থ-অনুচারী তপঃপ্রাণ বেত্তা
আচার্য্য তিনিই।'[৭৭]

---

[৭৬] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সংজ্ঞা সমীক্ষা*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১২, পৃ.১৬
[৭৭] ঐ. ঐ., পৃ. ২১

সবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা দিয়েই শেষ করি, যেখানে তিনি প্রত্যেকের অস্তিত্বের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানসহ সকলকেই গন্ডীবদ্ধ জীবন ত্যাগ করে ধর্মে-ধর্মে মিল খুঁজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করেছেন, ধর্মের প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান নিয়ে প্রকৃত ধার্মিককে আহ্বান করেছেন আকুল স্বরে। তাঁর ভাষায়-'যখন বন্যায় সারা দেশ জলে ডু'বে যায়, ঘর-বাড়ীতে লোকের থাকা অসম্ভব হয়, জঙ্গলে জীব জানোয়ার ত' দূরের কথা- শুনেছি বাঘ, ভাল্লুক, বাঁদর, সাপ, মানুষ হয়তো এক গাছেই উঠে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার আগ্রহে হিংসা ভু'লে যায়, কেউ কা'কেও খায় না, কেউ কা'কেও কামড়ায় না। অস্তিত্ব বা জীবন আর তা'র রাখবার টান জীবের এমনতরই ভীষণ! জীবন বাঁচাবার টানে যখন জীব-জানোয়ারের এমন হ'তে পারে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এতো আর কি? তবে চাই অমনতর ধর্মের প্রতি হাড়ভাঙ্গান টান- তা'হলে সব চুকে যায়। ঐ রকম টানের মানুষের ভিতর কি দেখা গেছে- আছে হিন্দু বলে কোন গন্ডী, হিন্দু বলে কোন ভেদ, মুসলমান বলে কোনও গন্ডী, মুসলমান ব'লে কোনও ভেদ, কি বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোনও গন্ডী, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব'লে কোনও ভেদ? জীবনজড়িত প্রাণময় প্রেমের প্লাবনে তা'দেও কি ঐ সব হামবড়াইয়ের আইনগুলি ভে'ঙে চুরমার হ'য়ে যায় নি? ঐ সব গণ্ডী ফণ্ডী- তা'দের নামের দোহাই দিয়ে দিয়ে আত্মম্ভরিতার সেবাহারা ফাঁকিবাজির বদমাইসী ছাড়া কি আর কিছু বোঝা যায়?

তাহলে মানুষের ঠিক চলার পথ একটাই। এক খোদ বা ভগবানে বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত পয়গম্বও ও প্রকৃত ভক্তদিগকে সর্বতোভাবেগ গ্রহণ, আর তাঁদের নির্দেশগুলিকে মেনে তাঁকেই আপ্রাণ অনুসরণ-এই হচ্ছে ধর্মের মেরুদন্ড। এক কথায় যা নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথে চালনা করে, আসক্তির বা টানের আচরণে সেই পথে চলা। বিশেষ বিশেষের বিশেষ কোন জীবনপ্রদ ব্যাপার নিয়ে অবজ্ঞা বা বিরোধের সৃষ্টি না করে, প্রত্যেকের প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের সেবায় উন্নত চেতনা দিয়ে সংবৃদ্ধ ক'রে, আদর্শ-প্রতিষ্ঠার স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে, জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রত্যেককে সমুন্নত ক'রে খোদের চেতনায় অসীমের পথে চলা। এই ত হল যা-কিছু সব ব্যাপার। প্রত্যেকের এই বুদ্ধি এলেই তো সব মিটে গেল।'[৭৮]

---

[৭৮] ব্রজগোপাল দত্তরায়,শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র(৩য় খণ্ড), তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯, পৃ-৯৫ ও ৯৬

৭ম অধ্যায়

উপসংহার

৭.১ সমাপনী মন্তব্য

> ‘জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমত জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্য কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্য কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।’[১] - বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মমতই কোন না কোন প্রেরিতপুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অথবা কোন না কোন প্রেরিতপুরুষকে তারা স্বীকার করে কিংবা কোন মানবতাবাদী দর্শন কোন না কোন মহাপুরুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আর, প্রত্যেক প্রেরিতই ধর্মের মূল দাঁড়া ঠিক রেখে পুরোনো তথা অপ্রয়োজনীয় ধর্মের বাহুল্য গ্লানিসমূহকে বাদ দিয়ে সমসাময়িক ও ভবিষ্যতকে সামনে রেখে নূতনভাবে দিয়ে যান বাঁচা-বাড়ার সন্ধান-পথ। আর এই ধারাবাহিকতায় যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই বাংলায় জন্মগ্রহন করে গোটা বিশ্বের জন্য তেমনই এক দিক-নিশানা দিয়ে গেছেন। কোন প্রেরিতই তাঁর মৌলিক শিক্ষায় ও বাস্তব আচরণে পূর্বতন প্রেরিতদের সাথে কোন দ্বন্দ্ব করেননি কিংবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন অসম্মানসূচক কিছু বলেন নি। বরং তারা পৃথিবীর সকল প্রেরিতকে এক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং তাদের মধ্যে যেন আমরা ভেদদৃষ্টি তৈরী না করি সেই শিক্ষা দেন। তাদের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা সবাই পূর্বপরিপূরণী হন, তাই তাঁদের কথার মধ্যে বারংবার পূবর্তনদের কথার প্রতিধ্বনিই লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা প্রচলিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে ভেদদৃষ্টিপ্রসূত বিকৃতিগুলোর বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তার সর্বশেষ বাস্তব প্রমাণ, যিনি পূর্বতন সকল প্রেরিতকেই পরিপূরণ করেছেন তাঁর জীবনাচরণে, তাঁর প্রচারিত ধর্ম-দর্শনে ও প্রবর্তিত মতবাদে। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ভেদ ও দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়ে এবং বিকৃত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সেসবের নিরাকরণী পথও দেখিয়েছেন।

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজ্ঞান*, *রবীন্দ্র রচনাবলী (৮ম খণ্ড)*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩. পৃ. ৬০৭

মানুষের চলমান অধোগতি ও বিকৃতি মানসিকতা যখন কালের স্বাভাবিক পদক্ষেপে বিক্ষেপ তৈরি করে দুনিয়াকে আসন্ন সংকটের সম্মুখীন করে, প্রেরিতপুরুষেরা সেই অধোগতি ও বিকৃতিগুলোকে নিকেশ করে মানুষকে পুনরায় জীবনের সন্ধানী করতে চান। মানুষের মনুষ্যত্ব যখন কেবল নামমাত্র থাকে, তখন তারা মানুষের আসুরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আঘাত এনে তাদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ দেখান। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রেরিতই তাঁর পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের পরিপূরণী ও পুনরালোচিত রূপ। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, হজরত মুসা, হজরত যীশু, হজরত মুহম্মদ, শ্রীচৈতন্য কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীঅনুকূলচন্দ্র প্রত্যেকের জীবনে এ সূত্র কার্যকর। এ যেন এক ধারাবাহিক রূপের বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকেই তাঁর পূর্ববর্তীদের কৃতজ্ঞচিত্তে ধারণ করেছেন এবং যুগানুপাতিকভাবে ধর্মের রূপ ব্যক্ত করেছেন।

আবার সাধক পুরুষ বা মহামানব বা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যারা, যারা কোন একটি আদর্শকে অনুসরণ করে নিজে সিদ্ধিলাভ করেছেন— যেমনঃ কবীর, নানক, তুলসীদাস, সাধু পল, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ, তারাও সবাইকে নিয়ে প্রেমের কথা, সম্প্রীতির কথা, সমন্বয়ের কথাই বলেছেন। শুধু ধর্মজগতে নয়, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, সমাজতত্ত্ব, দর্শন সবদিকেই এরকম সিদ্ধপুরুষ বা সাধক আছেন। যারা যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাদের উপলব্ধ বিষয়সমূহ দ্বারা সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষও কিছু নতুন জীবনের দিশা খুঁজে পায় বটে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন-দর্শন থাকেনা তাঁদের চলনায়। যাঁরা সাধনার দ্বারা কোন গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা অধ্যাত্মতত্ত্বকে জ্ঞাত হন তাঁরাই তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষ। আর, বহু তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষেরাও তাঁদের আদর্শিক ধারায় শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২]

আর প্রেরিত পুরুষোত্তম বা তত্ত্বতঃ পুরুষ যাঁরা, তাঁরা সহজাতভাবে সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েই জন্মান। তাঁদের অজানা কিছুই থাকে না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাদের অতিমূর্খের মত মনে হয়, তাই তাঁরা হন জ্ঞানীভাবে মূর্খ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মহান-উচ্চ ভাবের বা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ ঘটে কিন্তু তাঁদের দেখলে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ মনে হয়; যা সাধারণের কাছে অনেক কঠিন বিষয়, তা তাঁরা অত্যন্ত সহজে সাবলীলভাবে সমাধান করতে পারেন, তাই তাঁদের বলা হয় অসাধারণভাবে সাধারণ এবং তাঁরা বেশভূষায় একদমই সাধারণভাবে জীবন-

---

২. সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তত্ত্বকণা, আলফা পাবলিশার্স, পুরানদহ, দেওঘর, ভারত ১৯৮৪. পৃ.

যাপন করলেও সবসময় তাদের একটা আভিজাত্যপূর্ণ ভাব ও চরিত্র থাকে, তাই তাঁদের বলা হয় স্বাভাবিকভাবে অভিজাত। এই ত্রিত্বগুণের সমন্বয়ে তাঁরা হন সহজ ভগবান বা মানুষ ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছেও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, দাম্পত্য-জীবন, স্বাস্থ্য ও সদাচারসহ জীবনের বিবিধ বিষয়ের সমন্বয়ী সমাধান মিলেছে, যদিও তার আক্ষরিক জ্ঞান সে অর্থে কিছুই নয়। তিনি কখনো স্বল্প বা দীর্ঘদিন যাবৎ কোনপ্রকার সাধনা করেছেন কিংবা বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এমনটি দেখা যায়নি। তিনি অতি সাধারণভাবে থেকেও অসাধারণ সব বিষয়ের খুবই সহজ ও প্রাঞ্জল সমাধান দিয়েছেন, যেন তার নিকট তা খুবই সাধারণ ব্যাপার। আবার, তিনি সবসময় খুবই সাধারণ পোশাকে থাকতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সর্বদা একটা আভিজাত্য ভাবের প্রকাশ পেত। তাই তিনি প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা তত্ত্বতঃ পুরুষের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বোপরি আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে পূর্ব-পরিপূরণী পুরুষোত্তম বা প্রেরিত-পুরুষদের কিছু আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য[৩] দেখার চেষ্টা করব।

প্রথমত, মৌলিকভাবে সব প্রেরিতপুরুষের মতই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সমাজের প্রচলিত সামাজিক ধারায় একটি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেন। যদিও তাঁর কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাঁকে সমসাময়িক অন্যান্য মহামানব থেকে পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করে। জন্ম থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য মহত্ব প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য প্রেরিতপুরুষের ন্যায় তিনিও কেবলমাত্র তাঁর নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি, বরং বহু পরিবারের একজন, সমাজের একজন এমনকি গণমানুষের একজন হিসেবে বসবাস করেছেন ও স্বীয়কর্মের মধ্য দিয়ে একজন সহজাত নেতা হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয়ত, সব প্রেরিতপুরুষের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণী, আচরণ ও আদর্শ দ্বারা পূর্বতন প্রেরিতদের শ্রদ্ধা করে গেছেন এবং নিজেকে তাঁর পূর্বতন প্রেরিতদেরই চলমান ধারামাত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। তাই, তিনি সাধারণত প্রচলিত ঐতিহ্যকে ভাঙ্গেননি, তবে ঐতিহ্যের বিকৃত রকমসমূহকে যুগোপযোগী সংস্কার করেছেন।

চতুর্থত, অন্যান্য প্রেরিতপুরুষের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরও ফলাও করে কখনো নিজেকে ঈশ্বর দাবী করেননি বরং ঈশ্বরের অনুগত বা 'পরমপিতার সন্তান' হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর জন্মগত

---

[৩] দেবেশ চন্দ্র পাত্র, *শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্মান্তরিতকরণ*, ভারতীয়-আর্য্য গবেষণা কেন্দ্র, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৬।

আধ্যাত্মিকতাকে খুবই কমই লুকাতে পেরেছেন যা তাঁর বাণী, আচরণ, জীবনযাত্রা ও আদর্শিক ভাবধারায় ফুটে ওঠে। তিনি কোন বুজরুকি দেখাননি বা তা পছন্দও করতেন না, তবে জগতের কল্যাণের নিমিত্তে তাঁর জীবনের কিছু অলৌলিক ঘটনা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ পেয়েছে। যদিও সেসব তিনি স্বীকার করতে চাননি বরং সেসবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

পঞ্চমত, অন্যান্য প্রেরিতপুরুষেরা যেমন কোন বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী বা দলের জন্য আসেন না, আসেন সমগ্র মানবজাতির জন্য; তিনিও তেমনি সমগ্র মানব-জাতির জন্য এসেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য সবার ন্যায় পৃথিবীর কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু কোন প্রকার বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান কিংবা তজ্জাতীয় কোনও কিছু দ্বারা তিনি আবদ্ধ হননি। তিনি ছিলেন বিশ্ব-শিক্ষক। বিশ্বের প্রত্যেকটি সত্তাকেই তিনি তাঁর স্বীয়-সত্তা মনে করতেন। তিনি কাউকে বাদ দেননি বরং সবাইকে নিয়ে একত্রে চলার পথনির্দেশ দিয়েছেন।

ষষ্ঠত, পূর্ব-পূর্ব প্রেরিতপুরুষের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরও এমন একটি আদর্শ প্রচার করেছেন যা বিশ্বব্যাপী স্বীকার্য । এ আদর্শের দ্বারা তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে যার-যার স্ব-বৈশিষ্ট্যে উন্নত করে তুলেছেন এবং প্রত্যেকের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের গাঢ়ত্ব তৈরি করেছেন যা প্রেরিত-পুরুষোত্তমদের এক বিস্ময়কর গুণ।

সপ্তমত, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পূর্বতন প্রেরিতপুরুষের মত প্রকৃতির নিয়মকেই ধারণ করেছেন– আর, তাই সহজাত বাঁচা-বাড়ার নিয়ম। তিনি কখনোই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। বরং অনেক বিকৃত আচার থেকে প্রকৃত আচার শেখাতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।

৭.২ পুরুষোত্তম হিসেবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী সম্পোষণা

পুরুষোত্তমের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার চেষ্টা করব। শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, এক নূতন আদর্শের জন্ম হয়েছে। আদর্শটির পূবর্তন আদর্শসমূহের সাথে ধারাবাহিকতা আছে- যা শাশ্বত এবং একই সাথে এর এমন কিছু উপাদান আছে যা এযুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও

তৎসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে যুগানুপাতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বোপরি এ আদর্শের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, একটা নতুন উদ্যম, একটা নতুন আকর্ষণ আছে; সব মিলে আছে এক নবসংস্কারকৃত সমন্বিত রূপ। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শের কিছু কিছু নির্দিষ্ট দিক আছে; যেমনঃ ক) ধারণার স্পষ্টতা, খ) বৈজ্ঞানিক মেজাজ, গ) সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা, ঘ) প্রচলিত সংকীর্ণতা যেমন পক্ষপাতিত্ব, কুসংস্কার প্রভৃতির উর্দ্ধে এবং ঙ) সব মিলে একত্রে আদর্শটি প্রগতিবাদী যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী।

প্রথমত, শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্ম-দর্শনের মূল দিকটি হল সমন্বয়। এটি প্রচলিত সকল ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যকে প্রকাশ করতে ও তাতে আলোকপাত করতে নিয়ত চেষ্টা করে থাকে। যেটি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। শ্রীশ্রীঠাকুর চেষ্টা করেছেন পবিত্র গ্রন্থসমূহ যেমন গীতা, বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য দেখাতে। তিনি সকল ধর্মের সারবস্তুকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছেন যে সব ধর্মই এক শাশ্বত ও সাত্বত 'বাঁচা-বাড়ার' নীতিকে অনুসরণ করে চলে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সত্যকে বের করতে চেয়েছেন যে সব প্রেরিত পুরুষই এক; তাঁরা সবাই একই স্রষ্টার ভিন্ন সময়ের ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ ও আবির্ভাব মাত্র; তাদের প্রত্যেকের জীবনের ব্রতও একই এবং তা সমগ্র মানবজাতির জন্য। কোনও প্রেরিতপুরুষই মানব সমাজের অন্য সব অংশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এক অংশকে নিয়ে দেখাশুনা করেননি। কোনও প্রেরিতই ধর্মমতসমূহের মধ্যে বাধা তৈরীর কথা বলেননি। সমগ্র পূর্বতন প্রেরিতদের এই একত্ব একটি চরম সত্য, যা শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরিয়ে আনতে জোর চেষ্টা করেছেন। এমনকি তিনি তার জীবনে বাস্তবে প্রতিপালনে করে দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক পরবর্তী প্রেরিতই সকল পূর্ববর্তী প্রেরিতের পরিপূরক; প্রত্যেক পরবর্তী প্রেরিতই সকল পূর্ববর্তী প্রেরিতের আধুনিক রূপ। আর তাই কোনভাবেই সেখানে পার্থক্য তৈরীর কোন সুযোগ নেই এবং দ্বন্দ্বের অবকাশও খুবই কম। গবেষণাপত্রের শেষভাগের প্রথম অংশের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের চারটি বাণীর উল্লেখ করা হল যা তাঁর দর্শনকে পরিপূর্ণ করে, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলে :

হিংসায় হিংসা বাড়ায় প্রীতি বাড়ায় প্রীতি
দেবে যেমন পাবে তেমন এই সাধারণ রীতি।[৪]

---

[৪] শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ. ২৯৩

যে আচরণ তোমার প্রতি অন্যে করলে ভাল লাগে
তেমনতর সু-আচরণ তার প্রতি করো আগে।[৫]

> তুমি অপরের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা কর, অপরকে তেমনি দিতে চেষ্টা কর। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালবাসবে।[৬] প্রেমকে প্রার্থনা কর আর হিংসাকে দূরে পরিহার কর, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে।[৭]

৭.৩ প্রাপ্ত উপাত্ত ও সম্ভাব্য সুপারিশসমূহ

> "ভগবানকে আকাশে খুঁজলেও পাবার জো নেই, বাতাসে খুঁজলেও পাবার জো নেই, মাটিতে খুঁজলেও পাবার জো নেই, একমাত্র সেই মানুষটি যাঁর বিজ্ঞান-বহুদর্শিতায় আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, নীহারিকা যা-কিছু সব একায়িত হয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে—সবৈশিষ্ট্যে—বৈধী বিধায়নায়, তাঁর প্রতি সুকেন্দ্রিক অনুরাগ ছাড়া। চন্ডীদাস বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তেমন মানুষই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্—তিনিই সত্য, অস্তিত্বের স্তম্ভ, মঙ্গলময়, আদরণীয়। সার্থক, সঙ্গতিশীল, তত্ত্বসমাহৃত, বিন্যাস-বিদীপ্ত মূর্ত প্রতীক যিনি, তিনিই ভগবান।"[৮]

বিশ্বশান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পাঠের এ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। বিশ্বশান্তি কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দুটি বিষয়ই সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণার জন্য খুবই যুক্তিযুক্ত হলেও এ বিষয়ে কমবেশি অনেক গবেষণাকর্মই বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শান্তিস্থাপনা নিয়ে গবেষণার দিকে গবেষকদের বেশ ঝোঁক তৈরী হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বিশ্বশান্তি নিয়ে অনেক গবেষণাই হচ্ছে, তবে তা শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নভিত্তিক, যেখানে শান্তি অর্থই যুদ্ধহীনতা। আর এ গবেষণা ব্যক্তি-আদর্শ কেন্দ্রীক, যা ব্যষ্টি পর্যায় থেকে সমষ্টিগত সামগ্রিক ধর্মমতগুলোকে নিয়ে আলোকপাত করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিতর দিয়ে যে স্থায়ী শান্তিস্থাপন সম্ভব সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোই ছিল এর লক্ষ্য। তবে বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া এক ধর্মবেত্তা-মনীষীর দর্শনের উপর ভিত্তি করে

---

৫. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ. ২৯৩
৬. ঐ. ঐ.*সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ), পৃ. ১৫
৭. ঐ. ঐ. পৃ. ১৭৬
৮. শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১২, পৃ. ৯৬

বাংলাদেশে করা এরূপ গবেষণা পূর্বে হয়নি বলে একে একটি পরিপূর্ণ মৌলিক কাজ বলা যায়। আমরা এই গবেষণাকর্ম থেকে যেসব বিষয় উপস্থাপন করতে সক্ষম হব, সেগুলো হল:

১. বিশ্বশান্তিস্থাপন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা। এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিজে জানা ও অন্যকে জানানো।
২. এক ধর্ম, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন এবং পৃথিবীর প্রত্যেক মতসমূহকে সমান গুরুত্ব দেওয়া, মূলতঃ সেসবের সারবস্তু থেকে ধর্মের মূলসূত্রগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।
৩. প্রত্যেক ধর্মমতসমূহের সম্প্রীতিমূলক বাণীসমূহের চর্চা বৃদ্ধি করা এবং পারস্পরিক সাদৃশ্য অন্বেষণ করা।
৪. পূর্ববর্তী প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষকেই সমদৃষ্টিতে দেখা ও তাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া।
৫. পূর্ববর্তী মনীষীরা বা দিপ্তীমান মহান যারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া, কিন্তু স্রষ্টার সমকক্ষ না করা।
৬. ধর্মান্তরিতকরণের ভ্রান্ত ও হিংসাত্মক পথ ত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ে থেকেও অন্য সম্প্রদায়ের আদর্শ অনুসরণ করা।
৭. বর্তমান প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে অনুসরণের ভিতর দিয়ে যুগানুপাতিক, বৈজ্ঞানিক ও সমন্বয়ী আদর্শ চর্চা ও প্রসার করা।

সর্বশেষে বলা যায়, আদর্শ ও তাঁকে কেন্দ্র করে আদর্শিক মতবাদ, এমনি করেই ধর্ম বিবর্দ্ধিত হয়েছে মানবসমাজে। দিব্যচেতনা সম্পন্ন ঐশী প্রেরিতপুরুষগণের আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধর্ম। ঐশীব্যক্তি ও তাঁর নীতি বা আদর্শ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটিকে ছাড়া অন্যটি চলতে পারেনা। যেমন- যে প্রভু যীশুকে ভালবাসে, সে অবশ্যই তার বাণী বা ঈশ্বরের বাণীকে ভালবাসবে। এর যেকোন একটির উপর অশ্রদ্ধার জন্ম নিলে অন্যটির উপরও অশ্রদ্ধার জন্ম নেয়। এভাবেই ধর্মীয় গোঁড়ামী চেপে বসে ধর্মজীবনে এবং ক্রমেই এক সংকীর্ণ বিকৃত ধর্মচর্চার দিকে আমরা ধাবমান হই। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সেই ব্যক্তির বাণী বা মতবাদ চর্চাও একসময় বিকৃত চর্চা হয়ে ওঠে। যেমন-ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের চর্চা করা। এভাবে ধর্মজীবনে বিকৃতি প্রবেশ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণচর্চাবিহীন বৈষ্ণবধর্ম যেমন হয়ে পড়ে

শুধুমাত্র ভাববাদী আহাজারি, তেমন মুহম্মদচর্চাবিহীন ইসলাম হয়ে পড়ে শুধুমাত্র সংকীর্ণ হিংসা ও হিংস্রতার ভয়াল রূপ। এভাবেই বিকৃতি ধর্মবৃক্ষে স্বর্ণলতার মত বেড়ে ওঠে এবং একসময় ধর্মবৃক্ষকেই মেরে ফেলে। তখন মানুষ ঐ লতাজড়ানো মৃত বৃক্ষকেই আঁকড়ে ধরে মূল বৃক্ষ মনে করে। আর অন্য বৃক্ষের সাথে তার সাদৃশ্য খুঁজে পায়না। কিন্তু হায়! সে তো ফুল বা ফল দিতে পারে না, সর্বোচ্চ কাঠ দিতে পারে। তেমনি প্রত্যেকটা মতবাদই বা ধর্মই যখন বিকৃত হয়, তখন অন্য মতের বা ধর্মের সাথে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, বরং বৈসাদৃশ্যই চর্মচক্ষে বেশি প্রতীয়মান হয়। কারণ মূল মানবতার জয়গান বা মানুষের বাঁচা-বাড়ার কথা কিংবা সর্বসত্ত্বার জীবন-বৃদ্ধিদ রূপটি ততক্ষণে বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাই কাঠামোগত ধর্ম পালনই সার হয়ে দাঁড়ায়, আসল ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই অন্য ধর্মকে ছোট করা, হেয় করা, নষ্ট করা কিংবা ধ্বংস করার মাঝে ধর্মপালন খুঁজে পাই আমরা, প্রকৃতপক্ষে যা নিজের ধর্মকেই ক্ষুন্ন করার সামিল। ধর্মচর্চার নামে বিবাদ, হিংসা ও সংঘর্ষ প্রবল হয়ে ওঠে, আর প্রকৃত ধর্মচর্চা অর্থাৎ সহায়তা, প্রীতি ও আলিঙ্গন মুখ থুবড়ে দাঁড়ায় তার ভগ্ন পদবিক্ষেপে। শান্তির পথ হয়ে ওঠে দুর্গম, সম্প্রীতির স্থান গ্রহণ করে প্রতিহিংসা। কিন্তু এর ঠিক উল্টোপিঠেই ধর্ম অবস্থান করে, আর ধর্মদেবতা বা বিধাতা তার বিধিসমূহ নিয়ে অপেক্ষা করেন সেই সব মানুষের জন্য যারা এসবের মধ্যেও শান্ত হয়ে শান্তির চর্চা করবে। তার বিধির সঠিক পরিপালনে পুনরায় শাতনের হাত থেকে স্বর্গীয় শান্তির সুধা নিয়ে তৃপ্ত হবে এবং জগৎকে তৃপ্ত করবে। হিংসা ভুলে গিয়ে সবার মুখে তখন একটাই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে। কবি শেখ ফজলুল করিমের ভাষায়:

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পূণ্যবাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়েঘরে।[৯]

বন্দে পুরুষোত্তমম্

** ** ** ** ** **

---

[৯] www.kobita.banglakosh.com/archives/4335.html

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহ, *আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

২. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭।

৩. আহমদ রফিক (সম্পাদনা), *সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬।

৪. কাজল বন্দোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ: ধর্মভাবনা*(২য় সংস্করণ), মূর্ধণ্য, ঢাকা, ২০১২।

৫. কাজী ম্যাক, *বাহাইজম-এক ইরানী নবীর উত্থান(১ম সংস্করণ)*, বইপিয়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০।

৬. কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *সর্বহারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

৮. *কিতাবুল মোকাদ্দেস,* বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬।

৯. খিলখিল কাজী, *কাজী নজরুল ইসলামের বাছাইকৃত প্রবন্ধ,* মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭।

১০. গোলাম মোস্তফা, *ইসলাম ও বিশ্বনবী,* ২য় খন্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৩।

১১. ড. অলোক কুমার সেন, *বেদ সমগ্র অখণ্ড,* নারায়ণ পুস্তকালয়, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ২০০৫।

১২. ডঃ ফজলুল আলম, *সংস্কৃতিতত্ত্ব ও বাঙালি,* কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫।

১৩. ড. দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী সাহিত্য,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪০৫বাং (২য় সংস্করণ)।

১৪. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম,* মেরিট ফেয়ার পাবলিশেন্স, ঢাকা, ২০১৫।

১৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৮৬।

১৬. দেবেশ চন্দ্র পাত্র, *শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে ধর্মান্তরিতকরণ,* ভারতীয়-আর্য্য গবেষণা কেন্দ্র, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৬।

১৭. নূহ-উল-আলম লেনিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল, সময় প্রকাশন, ২০১৫।

১৮. *পবিত্র আল-কোরাণ(পিডিএফ),* ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯।

১৯. পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনুবাদ), *ধম্মপদ,* বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৫৪।

২০. পন্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার, *পবিত্র বেদসমগ্র,* কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০০।

২১. পরেশ ভোরা, *মহাজীবন (অখণ্ড),* তপোবন প্রকাশন, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা, ভারত, ২০১২।

২২. *প্রেমের বাণী: পবিত্র নতুন নিয়ম,* ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ২০৬, মাহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর, ভারত, ২০১৩।

২৩. *বাংলাপিডিয়া-বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ২০১২,* http://bn.banglapedia.org/index.php?title=মানসিক_হাসপাতাল

২৪. মন্টু চক্রবর্তী, *মহাযোগী শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবনী ও বাণী,* অর্পিতা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।

২৫. মহাত্মা গান্ধী, *আমার ধর্ম,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

২৬. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত,* কাকলী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।

২৭. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা,* বুক চয়েস, ঢাকা, ২০০৪।

২৮. মো. আবু তাহের, *বাংলাদেশে শিখ ধর্ম,* শিখ রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১০।

২৯. মো. দিদারুল আলম, *স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী দার্শনিক,* ভারত বিচিত্রা, বাড়ি-২, রোড-১৪২, গুলশান-১, ঢাকা, ২০১৪ (জানুয়ারি সংখ্যা)।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী (৯ম খণ্ড),* ঐতিহ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পরিশেষ,* বিশ্বভারতী, ভারত, ১৯২৬।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা,* বসুন্ধরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫।

৩৩.রশিদুন নবী (সম্পাদনা), *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ,* নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৮।

৩৪.লালন সাঁইজি, *লালন সাঁইজির নির্বাচিত ভাবসঙ্গীত,* সাহিত্যকোষ, ঢাকা, ২০১২।

৩৫.শারমিন খান, *লালন গীতি সমগ্র(২য় সংস্করণ),* বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা, ২০১৩।

৩৬.শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, *অখণ্ড জীবন দর্শন,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খন্ড, ভারত, ১৪১৬ বাং (পঞ্চম সংস্করণ)।

৩৭.শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত,* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়, কলকাতা, ২০১২।

৩৮.*শ্রীমতি ছবি রাণী গোস্বামী, বিন্দুতে সিন্ধু (অনুবাদ),* মূলঃ রে আর্চার হাউজারম্যান (জুনিয়র), *ওশান ইন এটি কাপ,* সৎসঙ্গ চার্চ, কলকাতা, ২০০৯ (প্রথম সংস্করণ)।

৩৯.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *চর্য্যা-সূক্ত,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর, ২০১২।

৪০.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

৪১.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(২য় খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১২বাং (চতুর্থ সংস্করণ)।

৪২.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(৭ম খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৩৯৯বাং (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৪৩.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (নবম সংস্করণ)।

৪৪.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড), অনুকূল আলোচনা,* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৫ (১ম সংস্করণ)।

৪৫.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (পঞ্চম সংস্করণ)।

৪৬.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (পঞ্চম সংস্করণ)।

৪৭.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৫ম খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯বাং (পঞ্চম সংস্করণ)।

৪৮.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ খণ্ড),* সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর,

ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (চতুর্থ সংস্করণ)।

৪৯.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৭ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (চতুর্থ সংস্করণ)।

৫০.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৮ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯বাং (চতুর্থ সংস্করণ)।

৫১.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (৯ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯বাং (চতুর্থ সংস্করণ)।

৫২.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১০ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (চতুর্থ সংস্করণ)।

৫৩.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪২১বাং (চতুর্থ সংস্করণ)।

৫৪.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১২শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৫৫.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৩শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

৫৬.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৪শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯বাং (তৃতীয় সংস্করণ)।

৫৭.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৫শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (তৃতীয় সংস্করণ)।

৫৮.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৬শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯বাং (তৃতীয় সংস্করণ)।

৫৯.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৭শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬০.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৮শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬১.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (১৯শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর,

ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬২.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২০শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬৩.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২১শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬৪.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আলোচনা প্রসঙ্গে (২২শ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

৬৫.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *আদর্শ বিনায়ক*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪০১ (৩য় সংস্করণ)।

৬৬.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৪ (তৃতীয় সংস্করণ)।

৬৭.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬৮.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬৯.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৯৯৩ (প্রথম সংস্করণ)।

৭০.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৫ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৯৯৫ (প্রথম সংস্করণ)।

৭১.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

৭২.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১৫ (৪৫তম সংস্করণ)।

৭৩.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *জীবন দীপ্তি (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭।

৭৪.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি(১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০০৭।

৭৫.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ইসলাম প্রসঙ্গে*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ভারত, ২০১৩।

৭৬.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *নানা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫ (৭ম সংস্করণ)।

৭৭.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *নানা প্রসঙ্গে (৪র্থ খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০০৩ (৫ম সংস্করণ)।

৭৮.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *কথা প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১০ বাং (৫ম সংস্করণ)।

৭৯.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *কথা প্রসঙ্গে (২য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৯ বাং (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

৮০.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *কথা প্রসঙ্গে (৩য় খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ১৪১৫ বাং (৭ম সংস্করণ)।

৮১.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *ধৃতি বিধায়না (১ম খণ্ড)*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (৩য় সংস্করণ)।

৮২.শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *চলার সাথী*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, ভারত, ২০১২ (১১শ সংস্করণ)।

৮৩.শ্রীসুখেন্দু কুমার বিশ্বাস, *প্রেরিতপুরুষদের অভিন্ন বার্তা*, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, হিমাইতপুর, পাবনা, ২০১৭ (২য় সংস্করণ)।

৮৪.সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৪।

৮৫.*সহীহ-বুখারী (পিডিএফ ভার্সন)*, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৮।

৮৬.সুধীর চক্রবর্তী, *লালন(৩য় সংস্করণ)*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৫।

৮৭.সুবোধ চন্দ্র দাস, *শ্রী গুরু গ্রন্থসাহিব পরিক্রমা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২।

৮৮.সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *তত্ত্বকণা*, আলফা পাবলিশার্স, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ভারত, ১৯৮৪।

৮৯. সুরিন্দার কাউর ও তপন সান্যাল, *দ্য সেকুলার এম্পারার বাবর*, লোকগীত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১।

৯০. সৈয়দ শাহ্ আলম, *শান্তি দর্শন*, পালোমা, রায়েরবাগ, ঢাকা, ২০০৮।

৯১. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ (অনুবাদ), *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, বেলুড়, কলিকাতা, ১৯৮৫।

৯২. স্বামী তত্ত্বানন্দ, *বৈষ্ণব বিভক্তি, শৈব বিভক্তি ও মাতৃ সাধনা*, ফিরমা কেএলএম প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৯৮৪ ।

৯৩. স্বামী স্বরূপানন্দ, *অখণ্ড সংহিতা*, ৪র্থ খণ্ড, অযাচক আশ্রম, মুরাদনগর, কুমিল্লা, ২০০০।

৯৪. হাসান মোরশেদ, *বঙ্গবন্ধুর নীতিনৈতিকতা*, চৈতন্য, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৯।

৯৫. হাসান মোঃ হাফিজুর রহমান ও আব্দুল ওয়াদুদ, *বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)*, মোরশেদ ল বুক হাউজ, ঢাকা, ২০১৮।

৯৬. ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।

৯৭. Abu-Nimer, M., *Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding.* In *Journal of Peace Research*, 38(6), 2001, pp. 685-704.

৯৮. Ahmad, Barakat, *Muhammad and the Jews*, Vikas Publishing House. Dhaka, 1979.

৯৯. Albert R. Eucken, *A new philosophy of life*, Create Space Independent Publishing Platform, 1912.

১০০. Baer, Hans A. (1998). William H. Swatos Jr (ed.). *"Symbols", in Encyclopedia of Religion and Society* (http://hirr.hartsem.edu/ency/Symbols.htm). Walnut Creek, CA, USA: Hartford Seminary, AltaMira Press. p. 504. ISBN 0761989560. Retrieved 31 October 2008.

১০১. Berger, R.. *Now I see it, now I don't: researcher's position and reflexivity in qualitative research.* Qualitative Research, 15(2), 2015, pp. 219-234.

১০২. Brewer, J., Higgins, G., and Teeney, F., *Religion and Peacemaking: A Conceptualization* In *Sociology*, 44(6), 2010, pp. 1019-1037.

১০৩. Bryman, A., *Social Research Methods.* Oxford: Oxford University Press, 2001. pp. 98-315.

১০৪. Carter, J. and Smith, G., *Religious Peacebuilding: From Potential to Action.* In: Coward, H. and Smith, G., ed., *Religion and Peacebuilding*, 1st ed. Albany: State University of New York Press, 2004, pp. 279-301.

১০৫. Creswell, J., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.* Thousand Oaks: Sage Publications, 1994, pp. 143-172.

১০৬. Bin Jamil Zeno, Muhammad, *The pillar of Islam and Iman*, Darussalam, 1996, p-19

১০৭. Carl W Ernst, *Tasawwuf (Sufism),* Encyclopedia of Islam and the Muslim World

১০৮. Douglas Johnston, *"Faith-Based Organizations: The Religious Dimension of Peacebuilding."* in People Building Peace II: Successful Stories of Civil Society, ed Paul van Tongeren, et al (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2005).

১০৯. Einstein, *Ideas and Opinions* from *Science, Philosophy and Religion, A Symposium,* Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., NY, 1941, pp.41

১১০. Fox, J., Religion as an Overlooked Element of International Relations. *International Studies Association*, 2001, pp. 53-73.

১১১. Friedrich, P. *"Theories of peace and their relationship to language"*. In: "*Language, Negotiation and Peace: The Use of English in Conflict,"* Continuum, London, 2007.

১১২. Johnston, D., *Conflict Prevention and Peacebuilding: The Religious Dimension,* International Center for Religion and Diplomacy, 2004.

১১৩. Gurdev Singh, *Toynbee on Indian Civilization,* in *Indian History Congress, Vol-46,* 1985.

১১৪. Huston Smith, *The World's Religion,* Harper Collince Publishers, India, 1997.

১১৫. J. McDaniel, *Hiduism,* in John Crrigan, *The OxfordHandbook of Religion andEmotion,* Oxford University Press, 2007, pp52-53.

১১৬. Johan Galtung, *Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking*, International Peace Research Institute, Oslo, 1967.

১১৭. John Siebert, *"Religion and Violent Conflict: A Practitioner's Functional Approach,"* The Ploughshares Monitor, Vol 28, No.2 (Summer 2007).

১১৮. Kazi Nurul Islam, *Historical Overview of Religious Pluralism in Bengal*, Bangladesh e-Journal of Sociology, Volume 8, Number 1, 2011.

১১৯. Klostermaier, K. K., *A concise encyclopedia of Hinduism*, 1998.

১২০. Laderman, Gary, *Religion and American cultures: An Encyclopedia of Traditions, Diversity and Popular Expressions*, Santa Barbara, Calif, 2003.

১২১. Lederach, J., Civil Society and Reconciliation. In: Hampson, O. and Aall, P., eds., *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*, 1st ed. Washington: United States Institute of Peace, 2001, pp. 841-854.

১২২. McDaniel, J., *Hiduism*, in John Crrigan, *The Oxford Handbook of Religion and Emotion*, Oxford University Press, 2007, pp52-53

১২৩. Maxwell, J. A., *Research Questions: What do you want to understand?* Qualitative Research Design: An Interactive Approach, 2nd ed. London: Sage, 2005. pp. 65-78.

১২৪. Naim, Abd Allah Ahmad, *Islam and Secularism state: negotiating the future of Sharia*, Cambridge: Havard University Press, 2008

১২৫. Nathan C. Funk and Christina J. Woolner, *"Religion and Peace and COnflict Studies,"* in Critical Issues in Peace and Conflict Studies, ed. Thomas Matyok, Jessica Senehi, and Sean Byrne, Lexington Books, Toronto, 2011

১২৬. Philpott, D., *Introduction: Searching for Strategy in an Age of Peacebuilding.* In: Philpott, D. and Powers, G., ed., *Strategies of Peace*, 1st ed. New York: Oxford University Press, 2010, pp. 3-15.

১২৭. Powers, G., *Religion and Peacebuilding. In: Philpott, D. and Powers,* G., ed., *Strategies of Peace*, 1st ed. New York: Oxford University Press, 2010.

১২৮. Prabhakar Machwe, *Kabir*, Sahitya Akademi, Delhi, 1968.

১২৯. Sandal, N., Religious Actors as Epistemic Communities in Conflict Transformation: The Cases of South Africa and Northern Ireland. *Review of International Studies*, 37(1), 2010. pp. 929-949.

Dhaka University Institutional Repository

১৩০. Shaykh Tariq Knecht, *Journal of a Sufi Odyssey*, Tauba Press, 2018.

১৩১. Sri Sri Thakur Anukul Chandra, *The Messege (Vol I)*, (1st Edition) Satsang Publishing House, Satsang, Deoghar, 1935.

১৩২. Subramunyaswami, *Merging with Siva: Hinduism's Contemporary Metaphysics*, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 2000, p1211.

১৩৩. Susanna P. Campbell, Michael G. Findley & Kyosuke Kikuta, *An Ontology of Peace: Landscapes of Conflict and Cooperation with Application to Colombia*, International Studies Review, 2017.

১৩৪. Swami Devarupananda (Compiler), *Mantra Pushpam*, Ramakrishna Math, Khar, Mumbai, India, 2008.

১৩৫. *Tanakh: the Jewes Bible*, Varda Books, Skokie, Illinois, USA, 2009.

১৩৬. *The Encyclopaedia Britannica*, 15th Edition, 1984.

১৩৭. https://adherents.com

১৩৮. http://bani.com.bd

১৩৯. http://birdindia.org

১৪০. http://brainyqoute.com/topics/world-peace-qoutes

১৪১. http://factsanddetails.com

১৪২. http://hfopk.org

১৪৩. http://icpindia.org

১৪৪. http://interfaithfoundationindia.com

১৪৫. http://ircc.sg

১৪৬. http://irenees.net

১৪৭. http://kalerkontho.com/print-edition/islamic-life/2016/07/29/386809

১৪৮. http://kobita.banglakosh.com/archives/4335.html

১৪৯. http://libertyholidays.com

১৫০. http://rfp.org

১৫১. http://sunnah.com

১৫২. http://ufp.org

১৫৩. http://un.org

১৫৪. http://uri.org